وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

A Verse in A Day

প্রতিদিন একটি আয়াত

ড. মো: মাসুম বিল্লাহ আল-আযহারী

الدرب اليسير إلى معرفة التفسير

(عشرة في واحدة: عنوان الآيات، المفردات، وترجمة الآيات، والتفسير الإجمالي، ومناسبة الآية لما قبلها وما بعدها، وشرح المفردات الغريبة، وأسباب النزول، وفوائد الآية، وممارسات الآية، وأطلس الآية).

(جُزء عَمَّ)

د. محمد معصوم بالله الأزهري
جامعة الملك العبد العزيز بجدة، المملكة العربية السعودية.

আল-দারুব আল-ইয়াসীর

(একের ভিতর দশ : আলোচ্যবিষয়, সরল অনুবাদ, শব্দার্থ, ভাবার্থ, অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা, আয়াতের সম্পর্ক, অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট, আয়াতের শিক্ষা, আয়াতের আমল এবং আয়াতের মানচিত্র)

আম্মা পারার

শিক্ষা ও আমল

ড. মো: মাসুম বিল্লাহ আল-আযহারী।
কিং আব্দুল আজীজ বিশ্ববিদ্যালয়, জেদ্দা, সৌদিআরব।

بسم الله الرحمن الرحيم

গ্রন্থকারের কথা

الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلَّم تسليما كثيرا. أما بعد:

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দুইটি মুজিযা দিয়েছেন। একটির কার্যকারিতা তার মৃত্যুর সাথে শেষ হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয়টি জীবন্ত মুজিযা মহাগ্রন্থ আল-কোরআন, যা কিয়ামত পর্যন্ত সদর্পে তার অলৌকিকতা ছড়াবে। কেউ তাকে স্তব্দ করে দিতে চাইলে সে নিজেই ধ্বংস হয়ে স্তব্দ হয়ে যাবে। এক সময় যখন আরব বিশ্ব সহ সারা পৃথিবী কবি-সাহিত্যিকদের দখলে ছিল, সাহিত্যের আসরে মেতে উঠতো সে সময়ের সকাল-সন্ধা এবং সাহিত্যকে পান্ডিত্যের মানদন্ড ধরে তা দিয়ে জাতি-গোষ্ঠি ও সভ্যতার মান নির্নয় করা হতো। তখন কোরআন এসে সকল কবি-সাহিত্যিকদেরকে অপারগ করে দিয়ে অপরাজিত শক্তি হিসেবে সবার শীর্ষে আসন করে নিয়েছিলো। আজ বিজ্ঞানের যুগেও সর্বত্র যখন নুতন-নুতন আবিষ্কারে ছয়লাব, আবিষ্কারের দাঁড়িপাল্লা দিয়ে সভ্যতাকে পরিমাপ করা হয়। ঠিক তখন কোরআন সকল আবিষ্কারকের জন্য উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করে আছে। এ রকম হওয়াটাইতো বলাবহুল্য, তা না হলে কিভাবে সৃষ্টি জগতের জন্য পথ প্রদর্শক হবে! আল্লাহ ঘোষণা করেছেন: ﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [سورة البقرة: ٢]. অর্থাৎ: "এই সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, মোত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক" (সূরা বাক্বারা, ২) । এ সংবিধানকে বুঝে যেন মানবজাতি তদানুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও দেশ গড়তে পারে সেজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) এ মহাগ্রন্থের তাফসীর করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েছেন: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [سورة النحل: ٤٤]. অর্থাৎ: "আমি তোমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে" (সূরা নাহল, ৪৪) । রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের সামনে কোরআনের তাফসীর করতেন। সাহাবীদের কাছে কোন আয়াতের উদ্দেশ্য অস্পষ্ট থাকলে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করে বুঝে নিতেন। তার ইন্তেকালের পর সাহাবীদের থেকে তাবেয়ীগণ, তাবেয়ীদের থেকে তাবা-তাবেয়ীগণ, তাবা-তাবেয়ীদের থেকে তাদের অনুসারীগণ এবং তাদের থেকে পরবর্তী স্তরের আলেমগণ। এভাবে তাফসীরের ধারাবাহিকতা পর্যায়ক্রমে বর্তমান সময় পর্যন্ত পৌঁছেছে। কোরানকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে জীবন গড়া প্রত্যেক মানুষের উপর কর্তব্য এবং সাধারণ মানুষকে কোরানের সঠিক ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেওয়া আলেমদের উপর দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের জন্যই যুগেযুগে আলেমগণ কোরানের সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টার মাধ্যমে তাফসীরের বিভিন্ন পদ্ধতি আবিস্কার করেছেন।

তাফসীরের অন্যতম একটি পদ্ধতি হলো 'তাফসীর মাওজুয়ী' বা 'বিষয়ভিত্তিক তাফসীর'। এ প্রকার তাফসীরের ধারা তাবেয়ীদের সময় থেকে চলে আসছে, যদিও যুগের পরিবর্তনে এর ধরণ কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। আরব বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পদ্ধতিতে কোরআনের তাফসীরের উপর যথেষ্ট গবেষণা হচ্ছে। তাফসীরের এ পদ্ধতিটি এতই সহজবোধ্য যে, সকল শ্রেণীর মানুষ তা পড়ে বুঝতে পারে। আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় কোরানের তরজমা এবং প্রাচীণ তাফসীরের অনুবাদ যথেষ্ঠ পরিমানে পাওয়া গেলেও উল্লেখিত পদ্ধতিতে লেখা কোন তাফসীর আমার নজরে পড়ে নি। আর এ অনুবাদ ও তাফসীরগুলো দেশের মোট জনসংখ্যার ক্ষুদ্র একটি অংশ যারা মাদ্রাসায় পড়ুয়া কেবল তারাই ভালভাবে বুঝতে পারে এবং বাকীরা এ তাফসীরগুলো পড়া শুরু করে কোরআন নামক জ্ঞানের সাগরে পতিত হয়ে দিক হারিয়ে ফেলে। 'বিষয়ভিত্তিক তাফসীর' এমন একটি ম্যাথোড বা পদ্ধতির নাম যা অনুসরণ করে তাফসীর লেখা হলে মাদ্রাসা শিক্ষিত, সাধারন শিক্ষিত, কম শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সকলেই তা বুঝতে পারবে (ইনশাআল্লাহ) ।

অত্র তাফসীরের কিতাবটি 'বিষয়ভিত্তিক তাফসীর' পদ্ধতি অনুসরণ করে লেখা হয়েছে। সকল স্তরের বাংলা ভাষাভাষি মানুষ তাফসীর পড়ে এবং শুনে যেন সহজে অনুধাবণ করতে পারে সেজন্যই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। বিভিন্ন পেশাজীবির মানুষ তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে এবং বিভিন্ন সংগঠণ ও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলগণ তাদের অধিনস্ত সদস্যদেরকে নিয়ে প্রতিদিন একটি আয়াতের ব্যাখ্যা পড়া এবং শোনার মাধ্যমে এ তাফসীর থেকে উপকার নিতে পারবেন। বিশেষ করে যারা সদ্য কোরানের হাফেজ হয়েছে তাদের জন্য এ তাফসীরটি বেশী উপকারী হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে তাফসীর পঠন পদ্ধতি এবং তাফসীর ম্যাথডোলজী অত্র বইয়ের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে। আমার জানা মতে, এ তাফসিরে শব্দ চয়ন এবং বানানের কিছু ভুল আছে। পাঠকগণ দয়া করে একটু শোধরিয়ে পড়বেন। আল্লাহ তায়ালার কাছে নত শিরে প্রার্থণা করছি তিনি যেন এ মহৎ কিন্তু কষ্টসাধ্য কাজটি কেবল তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন। (আমীন)

কোরআনের খাদেম:

05/02/2022

ড. মো: মাসুম বিল্লাহ আল-আযহারী

كلمة المؤلف:

الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلَّم تسليما كثيرا. أما بعد:

فإنّ الله تعالى أعطى النبي -صلى الله عليه وسلم- المعجزتين، الأولى منهما انتهت بموته -صلى الله عليه وسلم-، والثانية: المعجزة الحية الباقية إلى يوم القيامة، وهي كتاب الله القرآن العظيم، الذي ينشر خصوصياته وميزاته حتى يرث الله الأرض. فإذا حاول أحد أن يسقطه، فقد أسقط نفسه وهدم. في الأيام الجاهلية كان شعراء العرب وكتابها يشتغلون بالآداب والأشعار والقصائد، وكان ينعقد مجالس الشعراء في الصباح والمساء. واعتبر الأدب معيار العلوم، والثقافات، والحضارات. ثم جاء القرآن وأعجز كل الشعراء والكتاب حتى جلس في القمة كقوة غير مهزومة. اليوم، في العهد الحديث، عندما تكثر الاختراعات الجديدة، والاكتشافات العجيبة حتى تقاس الحضارة بمقاييس الاكتشافات والاختراعات، فقد اتخذ القرآن مقعد الناصح لجميع المكتشفين والمخترعين. ينبغي أن يكون هكذا، وإلا فكيف يكون هدًى للعالم كله؟ قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [سورة البقرة: ٢]. قد أمر الله رسوله -صلى الله عليه وسلم- بتبيين الكتاب العظيم للأمة؛ ليبني البشر أفراداً وأسرا ومجتمعات ودولاً في ضوء أحكام هذا الدستور: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [سورة النحل: ٤٤]. فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يبين القرآن أمام أصحابه. إذا حصل الصحابة -رضي الله عنهم- على أي إشكال في آيات قرآنية، استفسروا مباشرة من النبي -صلى الله عليه وسلم-. وبعد وفاته، فسر الصحابة القرآن الكريم أمام التابعين، والتابعون أمام تابعي التابعين، وتابعو التابعين أمام من جاء بعدهم. وهكذا استمرت سلسلة التفسير إلى الوقت الحاضر. فمن واجب على كل إنسان أن يدرس القرآن بشكل صحيح، ومن واجب على العلماء أن يشرحوا القرآن شرحا صحيحا لعامة الناس. من أجل وفاء هذه المسؤولية، حاول العلماء الزاهدون أن يقدموا التفسير الصحيح للقرآن على مر العصور بطرق شتى.

ومن هذه الطرق "التفسير الموضوعي". وهذا النوع من التفسير كان مستمرا منذ زمن التابعين، وإن تغير صورته مع تغير العصر. هناك بحوث كثيرة حول تفسير القرآن بهذه الطريقة في جامعات مختلفة من الدول العربية. وهذه الطريقة موصلة القارئ إلى الغاية بالسهل، من حيث يمكن لجميع فئات الناس قراءتها وفهمها. نرى في بلدنا، تتوفر ترجمات القرآن باللغة البنغالية وترجمات التفاسير القديمة والحديثة بكميات كافية، ولكن لم يخطر ببالي أي تفسير مكتوب بالطريقة المذكورة. وهذه الترجمات والتفاسير المتوفرة عندنا لا يفهمها إلا من تعلقوا أنفسهم بالمدارس الدينية طالبا أو مدرسا، والباقون يعني الجزء الكبير من سكان بلدنا لا يقرئونها ولا يفهمونها لصعوبتها. ومن الجدير بالذكر، إنْ كُتِبَ التفسير على المنهج الموضوعي، يتيسر للجميع أن يفهموا القرآن بشكل صحيح؛ لأن المنهج الموضوعي للتفسير سهل لفهم القرآن الكريم.

ومن ثم، اختار المصنف هذا المنهج لكتابة هذا التفسير. ونحن بذلنا جهودنا الصغيرة خالصا لوجه الله الكريم؛ ليمكن للمتحدثين باللغة البنغالية من جميع مستويات سكان بلدنا أن يفهموا القرآن الكريم بسهولة، وليمكن للأشخاص من مختلف المهن أن يشاركوا هذا التفسير مع أفراد عائلاتهم صباحا ومساءً، وللمسؤولين في مختلف المنظمات والمؤسسات والشركات أن يستفيدوا منه بمشاركتهم هذا التفسير مع أعضائها يوميا أو أسبوعيا. وكذلك هذا التفسير يكون أكثر فائدة لحفاظ القرآن الكريم الذين أرادوا أن يتعلموا التفسير (إن شاء الله تعالى).

نظرا إلى جميع مستويات القارئين، ذُكِرت كيفية قراءة التفسير، ومنهجيتها في بداية هذا الكتاب. أدعو الله بكل تواضع أن يمنحني التوفيق والسداد؛ لإكمال هذه المهمة العظيمة لمجرد رضوانه تعالى. (آمين)

الفقير إلى الله:

د. محمد معصوم بالله الأزهري.

তাফসীর পঠন পদ্ধতি

তাফসীরটি যে ধারাবাহিকতায় সাজানো হয়েছে, পাঠক ঠিক সে ধারাবাহিকতায় তাফসীরটি পড়বে।

- প্রথমে পৃষ্ঠার উপরাংশে উল্লেখিত পূর্ণাঙ্গ আয়াতটি শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করবে।
- আয়াতের জন্য নির্ধারিত আলোচ্যবিষয়টি বুঝার চেষ্টা করবে।
- উল্লেখিত আয়াতের সরল অনুবাদটি টেবিলের প্রথম লাইনে দেওয়া আছে, এ অনুবাদটিকে খেয়াল করে পড়বে।
- যারা কোরআনিক ভাষা শিখতে আগ্রহী, তারা টেবিলের দ্বিতীয় লাইনে প্রদত্ত আরবী শব্দগুলো দেখে অনুবাদ পড়লে খুব সহজেই আরবী শব্দগুলো শিখে ফেলতে পারবে (ইনশাআল্লাহ)।
- টেবিলের নিছে প্রদত্ত ভাবার্থ খেয়াল করে পড়বে। ভাবার্থ পড়ার মাধ্যমে আল্লাহ অত্র আয়াতে কি ম্যাসেজ দিতে চাচ্ছেন তা অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে যাবে।
- ভাবার্থের পরে রয়েছে আয়াতে বর্ণিত অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা, এটা মনযোগ সহকারে পড়ার পর আয়াতের অস্পষ্টতা অনেকটাই কেটে যাবে।
- অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট বুঝে পড়লে আয়াতে আল্লাহর ম্যাসেজটি স্পষ্ট হয়ে যাবে।
- সর্বশেষে 'আয়াতের শিক্ষা ও আমল' মনযোগ দিয়ে পড়লে আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর বার্তা বুঝে আসবে (ইনশাআল্লাহ) ।

طرق قراءة التفسير:

على القارئ أن يقرأ هذا التفسير حسب ترتيب رتبته معتمدا على التفاسير الموضوعية الحديثة.

- فأولا يقرأ الآية الكاملة المذكورة في أعلى الصفحة بشكل صحيح.
- ثم حاول أن يفهم العنوان المحدد للآية.
- ثم يقرأ بالانتباه الترجمة الميسرة الموجودة في السطر الأول من الجدول.
- الذين يهتمون بتعلم اللغة القرآنية، يمكنهم أن يتعلموها بسهولة من خلال النظر إلى الكلمات العربية الموجودة في السطر الثاني من الجدول.
- ثم يقرأ التفسير الإجمالي الموجود تحت الجدول بالتنبه.
- ثم يقرأ شرح المفردات الغريبة الواردة في الآية، وبالقراءة بالعناية يزول الغموض عن الآية إلى حد كبير.
- ثم يقرأ مناسبات الآية لما قبلها وما بعدها بالانتباه.
- ثم يقرأ سبب النزول بعناية، وبها تتضح رسالة الله في الآية.
- وأخيرًا، إذا قرأ القارئ فوائد الآيات وممارساتها، فهم الآيات تماما بإذن الله تعالى.

তাফসীর ম্যাথোডলজী

“বিষয়ভিত্তিক তাফসীর” পদ্ধতির আলোকে অত্র তাফসীরটি লেখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যে ধাপগুলো অনুসরণ করা হয়েছে, তা হলো:

১। প্রথমে পূর্ণাঙ্গ আয়াতটি পৃষ্ঠার উপরাংশে আনা হয়েছে।

২। আয়াতে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার ভিত্তিতে একটি আলোচ্যবিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩। পৃষ্টার উপরাংশে উল্লেখিত আয়াতের সরল অনুবাদ টেবিলে নিয়ে আসা হয়েছে। যারা আয়াতের অর্থ জানার পাশাপাশি কোরআনিক ভাষা শিখতে চায় তাদের দিকে তাকিয়ে টেবিলে লিখিত অনুবাদ অনুসারে পুনরায় তার নিচে আরবী নিয়ে আসা হয়েছে।

৪। সরল এবং শাব্দিক বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে কোরআনিক পরিভাষাগুলো আরবী অনুসারে লেখা হয়েছে। যেমন: সালাত, সাওম, যাকাত, ইসলাম, ঈমান, দ্বীন, রাসূল, ওয়াহী, রব ইত্যাদি।

৫। আয়াতের ভাবার্থের ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক তাফসীর গ্রন্থ, যেমন: আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় মুফসসির পরিষদ কর্তৃক অনূদিত ‘আল-মোন্তাখাব’, সৌদি মুফাসসির পরিষদ কর্তৃক অনূদিত ‘আল-তাফসীর আল-মুয়াস্সার’এবং আবু বকর আল-জাজ্বায়িরী (র.) এর লিখিত ‘আইসার আল-তাফাসীর’ কে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৬। আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইমাম বাক্বায়ী (র.) এর লেখা ‘নাযম আল-দুরার ফি তানাসুব আল-আয়াত ওয়া আল-সুয়ার’ কে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৭। আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ইবনু কুতাইবাহ (র.) এর লেখা ‘গরীব আল-কোরআন’ এবং কামিলা আল-কাওয়ারী এর লেখা ‘তাফসীর গরীব আল-কোরআন’ কে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৮। আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট এর ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস ছাড়া কোনো হাদীসকে উল্লেখ করা হয়নি। ইমাম সুয়ূতী (র.) এর ‘লুবাব আল-নুকুল ফী আসবাব আল-নুযূল’ এবং ওয়াহেদী (র.) এর ‘আসবাব আল-নুযুল’ কে বিশেষভাবে সামনে রাখা হয়েছে।

৯। আয়াতের শিক্ষা বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রাচীন এবং আধুনিক তাফসীরের মধ্যে সমন্বয় করা হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষা উল্লেখ করার পর তথ্যসূত্র বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণত তাফসীরকারকগণ অধিক স্পষ্ট আয়াত বা আয়াতাংশের তাফসীর করেন না। কিন্তু অত্র তাফসীরে সাধারণ মানুষের সুবিধার দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট আয়াত বা আয়াতাংশ থেকেও শিক্ষা বের করে তাকে তথ্যসূত্র উল্লেখ করা ছাড়াই বর্ণনা করা হয়েছে।

১০। যে সমস্ত মাসয়ালায় একাধিক মত পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে সালাফ ও অধিকাংশ ওলামাদের মত এবং যে মতের স্বপক্ষে মজবুত দলীল রয়েছে এমন মতকে প্রাধান্য দিয়ে কেবল সেটাকেই উল্লেখ করা হয়েছে, কিতাব দীর্ঘ হওয়ার আশংকায় অন্যান্য মতগুলো উল্লেখ করা হয়নি।

১১। আয়াতের ব্যাখ্যা দীর্ঘ না করে বিভিন্ন তাফসীরগ্রন্থ থেকে আল্লাহ তায়ালার মূল ম্যাসেজটি অতি সংক্ষেপে আয়াতের শিক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে।

منهجية التفسير:

اتبع المصنف في كتابة هذا التفسير "المنهج الموضوعي" و"التحليلي"، وذلك باتباع الخطوات التالية:

١. وضع الآية الكاملة في أعلى الصفحة.

٢. تحديد العنوان بناءً على الموضوع الذي تمت مناقشته في الآية.

٣. الترجمة الميسرة للآية المذكورة في أعلى السطر من الجدول. وبالنظر إلى أولئك الذين يريدون أن يتعلموا اللغة القرآنية، وضعتُ الكلمات العربية في السطر الثاني من الجدول.

٤. وضع المصطلحات القرآنية في الترجمة البنجالية بلا تغيير. مثل: صلاة، وصوم، وزكاة، وإسلام، وإيمان، ودين، ورسول، ووحي، ورب، وغيرها.

٥. استخدام التفاسير الحديثة للترجمة الميسرة، مثل: "المنتخب لتفسير القرآن الكريم" للجنة من علماء الأزهر الشريف، و"التفسير الميسر" لنخبة من أساتذة التفسير في المملكة العربية السعودية، و"أيسر التفاسير" للجزائري، وغيرها.

٦. استخدام التفاسير القديمة والحديثة لبيان مناسبات الآيات والسور، مثل: "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور" للإمام البقاعي، و"التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج" لوهبة الزحيلي، وغيرها.

٧. وفي شرح المفردات الغريبة الواردة في الآية استخدمت التفاسير القديمة والحديثة، مثل: "غريب القرآن" لابن قطيبة، و"تفسير غريب القرآن" للكاملة الكواري، و"الهادي إلى تفسير غريب القرآن" لمحمد محيسن، وغيرها.

٨. وفي بيان أسباب النزول للآيات، لم يذكر الحديث إلا صحيحا. وأكثر ما يستخدم لأسباب نزول الآيات "لباب النقول" للسيوطي، و"أسباب النزول" للواحدي.

٩. وفي بيان فوائد الآيات وممارساتها اعتمدت على التفاسير القديمة والحديثة على حد سواء. وحاولت أن أجمع بينهما للتوازن في الفوائد. عادةً المفسرون لا يشرحون الآيات قطعية ثبوتها وقطعية دلالتها، ولكن في هذا التفسير، بالنظر إلى عامة الناس استخرجت الدروس والعبر من تلك الآيات دون إحالة إلى المصادر والمراجع.

١٠. وفي حالة وجود أكثر من رأي في المسألة، اكتفيت بذكر الرأي الراجح، مثل: رأي علماء السلف، ورأي الجمهوريين، والرأي الذي قرائنه أقوى من الآراء الأخرى، خوفا من تطول الكتاب.

١١. ذكرت في دروس الآيات رسالة الله الرئيسية للآية باختصار شديد باستخراج من مختلف التفاسير.

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	سُوْرَةُ النّبأ (৩০তম পারা)	১৬-২৯
১	সূরা আন-নাবা এর পরিচয়	১৬
২	পুনরুত্থান দিবস ও তা সংগঠিত হওয়ার প্রমাণ	১৮
৩	কিয়ামতের অবস্থা ও সেখানকার শাস্তির ধরণ	২১
৪	কিয়ামতের দিন সৌভাগ্যবান মুমিনদের প্রতিদান	২৫
৫	আল্লাহর ক্ষমতা, কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার নিশ্চয়তা এবং কাফিরদের...	২৭
	سُوْرَةُ النّٰزِعَات	৩০-৪৭
৬	সূরা নাযিয়াত এর পরিচয়	৩০
৭	কিয়ামত দিনের ভয়াবহতা	৩২
৮	ফেরআউনের সাথে মূসা (আ.) এর ঘটনা ও শিক্ষা	৩৭
৯	পুনরুত্থান দিবস সংগঠিত হওয়ার প্রমাণ	৪১
১০	কিয়ামতের দিনে মানুষের অবস্থা	৪৪
	سُوْرَةُ عَبَسَ	৪৮-৬০
১১	সূরা আবাসা এর পরিচয়	৪৮
১২	ইসলামে সমতা বিধান	৪৯
১৩	কোরআন মানুষের জন্য উপদেশ এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ	৫৩
১৪	আল্লাহর কুদরাত ও অনুগ্রহ সম্পর্কে গবেষণার প্রতি মানুষকে উৎসাহিতকরণ	৫৭
১৫	কিয়ামত দিনের ভয়াবহ অবস্থা	৫৯
	سُوْرَةُ التَّكْوِير	৬১-৭১
১৬	সূরা আল-তাকভীর এর পরিচয়	৬১
১৭	কিয়ামতের দিন প্রত্যেকে তার কৃতকর্ম নিয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে	৬৩
১৮	কোরআন আল্লাহর অহী ও সৎপথ প্রদর্শনকারী হওয়ার প্রমাণ	৬৭
	سُوْرَةُ الانْفِطَار	৭২-৮২
১৯	সূরা আল-ইনফিতার এর পরিচয়	৭২
২০	কিয়ামতের দিনে মানুষের পূর্বপ্রেরিত কৃতকর্মের পুরস্কার...	৭৪
২১	কিয়ামতকে অস্বীকার করার কারণ এবং সেদিনের ভয়াবহতা	৭৮
	سُوْرَةُ المُطَفِّفِين	৮৩-১০৩

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
২২	সূরা আল-মুতাফফিফীন এর পরিচয়	৮৩
২৩	ওজনে বেশী গ্রহণকারী এবং কম প্রদানকারীদেরকে সতর্কীকরণ	৮৪
২৪	মন্দ কাজের সংরক্ষণ এবং মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীদের কাহিনী	৮৯
২৫	পুণ্যকাজের সংরক্ষণ এবং পুণ্যবানদের পুরস্কার	৯৫
২৬	কাফিররা এ পৃথিবীতে মুমিনদেরকে নিয়ে উপহাস করে, আর...	১০০
	سُورَةُ الاِنْشِقَاق	১০৪-১১৬
২৭	সূরা আল-ইনশিক্বাক এর পরিচয়	১০৪
২৮	কিয়ামতের ভয়াবহতা এবং মানুষ দুই দলে বিভক্ত হওয়ার দৃশ্য	১০৬
২৯	কিয়ামত দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে উৎসাহ প্রদান	১১২
	سُورَةُ البُرُوج	১১৭-১৩১
৩০	সূরা আল-বুরূজ এর পরিচয়	১১৭
৩১	আসহাবুল উখদুদ এর ধ্বংস চিত্র	১১৮
৩২	আখিরাতে মুমিনের পুরস্কার এবং কাফিরের তিরস্কার	১২৪
৩৩	আল্লাহর ক্ষমতা এবং পূর্বযুগের কাফির ধ্বংসের ইতিহাস ও শিক্ষা	১২৮
	سُورَةُ الطَّارِق	১৩২-১৪০
৩৪	সূরা আল-তারিক্ব এর পরিচয়	১৩২
৩৫	কিয়ামতে পেশ করার জন্য মানুষের আমল ফেরেশতা দ্বারা সংরক্ষণ	১৩৩
৩৬	কোরআন মাজীদ হাক্ব-বাতিলের চূড়ান্ত পার্থক্যকারী	১৩৭
	سُورَةُ الأَعْلَى	১৪১-১৬০
৩৭	সূরা আল-আ’লা এর পরিচয়	১৪১
৩৮	আল্লাহর সার্বভৌমিত্ব এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) কে কোরআন মুখস্তকরণ	১৪৩
৩৯	উপদেশ প্রদান, আত্মশুদ্ধি এবং দুনিয়ার উপর আখেরাতের প্রাধান্য	১৫২
	سُورَةُ الْغَاشِيَة	১৬১-১৭৫
৪০	সূরা আল-গাশিয়াহ এর পরিচয়	১৬১
৪১	কিয়ামতের ভয়াবহতা এবং জাহান্নামীদের অবস্থা	১৬৩
৪২	কিয়ামতের দিন জান্নাতবাসীদের অবস্থা	১৬৯
৪৩	পুনরুত্থান দিবস সত্য হওয়ার প্রমাণ	১৭৩
	سُورَةُ الْفَجْر	১৭৬-১৮৮
৪৪	সূরা আল-ফাজর এর পরিচয়	১৭৬

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৪৫	সীমালঙ্ঘনকারীর পরিণতির অনিবার্যতা এবং তাদের শাস্তি এ...	১৭৮
৪৬	আখেরাতের উপর দুনিয়াকে গুরুত্বারোপকারীর প্রতি আল্লাহর তিরস্কার	১৮৪
৪৭	কিয়ামতে সুখী মানুষ এবং দুঃখী মানুষ	১৮৬
	سُوْرَةُ الْبَلَد	১৮৯-১৯৫
৪৮	সূরা আল-বালাদ এর পরিচিতি	১৮৯
৪৯	মানুষ ক্লান্তি দ্বারা পীড়িত এবং ক্ষমতা ও অর্থ দ্বারা প্রতারিত	১৯০
৫০	পছন্দের নীতি এবং পরকালে মুক্তির উপায়	১৯৩
	سُورَةُ الشَّمْس	১৯৬-২০৩
৫১	সূরা শাম্‌স এর পরিচয়	১৯৬
৫২	পবিত্র আত্মার সফলতা এবং কদর্য আত্মার ব্যর্থতা	১৯৮
	سُورَةُ اللَّيْل	২০৪-২১৩
৫৩	সূরা লাইল এর পরিচয়	২০৪
৫৪	মানুষের প্রচেষ্টার ভিন্নতা	২০৬
৫৫	অজুহাতের দরজা বন্ধ রেখে খারাপ কাজ থেকে সতর্কীকরণ	২১০
	سُورَةُ الضُّحَى	২১৪-২১৯
৫৬	সূরা দুহা এর পরিচয়	২১৪
৫৭	রাসূলুল্লাহর (সা.) প্রতি আল্লাহর নেয়ামত এবং কিছু দিকনির্দেশনা	২১৫
	سُورَةُ الشَّرْح	২২০-২২৪
৫৮	সূরা শারহ এর পরিচয়	২২০
৫৯	রাসূলুল্লাহর (সা.) প্রতি আল্লাহর নেয়ামত এবং কিছু দিকনির্দেশনা	২২১
	سُورَةُ التِّين	২২৫-২২৯
৬০	সূরা তীন এর পরিচয়	২২৫
৬১	মানুষের মূল্যায়ন হয় ধর্মের মানদন্ডে	২২৬
	سُورَةُ العَلَق	২৩০-২৪৩
৬২	সূরা আলাক্ব এর পরিচয়	২৩০
৬৩	মানুষ সৃষ্টি করে তাদেরকে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া	২৩১
৬৪	কোরআন না পড়ার পরিণতি	২৩৬
৬৫	সীমালঙ্ঘনকারীকে অনুসরণ না করার নির্দেশ	২৩৮

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	سُورَةُ القَدْر	২৪৪-২৪৯
৬৬	সূরা ক্বাদর এর পরিচয়	২৪৪
৬৭	লাইলাতুল ক্বাদর এর ফযিলত এবং কোরআন অবতীর্ণের সূচনা	২৪৫
	سُورَةُ البَيِّنَة	২৫০-২৫৪
৬৮	সূরা বাইয়্যেনাহ এর পরিচয়	২৫০
৬৯	আখেরাতে কাফেরের পরিণাম ও মুমিনের পুরস্কার	২৫১
	سُورَةُ الزَلْزَلَة	২৫৫-২৬১
৭০	সূরা যিলযাল এর পরিচয়	২৫৫
৭১	কিয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মানুষের ভালোমন্দ কৃতকর্মের উন্মোচন	২৫৭
	سُورَةُ العَادِيَات	২৬২-২৬৫
৭২	সূরা আদিয়াত এর পরিচয়	২৬২
৭৩	প্রাচুর্যের সময় আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া থেকে সতর্কীকরণ	২৬৩
	سُورَةُ القَارِعَة	২৬৬-২৬৮
৭৪	সূরা ক্বারিয়াহ এর পরিচয়	২৬৬
৭৫	কিয়ামতের ভয়াবহত এবং মানুষের বিভক্তি	২৬৭
	سُورَةُ التَّكَاثُر	২৬৯-২৭২
৭৬	সূরা তাকসুর এর পরিচয়	২৬৯
৭৭	সম্পদের মোহে বেপরোয়া হওয়ার শাস্তি এবং কিয়ামতে জিজ্ঞাসাবাদ	২৭০
	سُورَةُ العَصْر	২৭৩-২৭৫
৭৮	সূরা আস্‌র এর পরিচয়	২৭৩
৭৯	মানব জীবনের চার দফা কর্মসূচী	২৭৪
	سُورَةُ الهُمَزَة	২৭৬-২৭৯
৮০	সূরা হুমাযাহ এর পরিচয়	২৭৬
৮১	নিন্দাকারী ও গীবতকারীর শাস্তি	২৭৭
	سُورَةُ الفِيل	২৮০-২৮৩
৮২	সূরা ফীল এর পরিচয়	২৮০
৮৩	হস্তী বাহিনীর ঘটনা	২৮১

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	سُورَةُ قريش	২৮৪-২৮৬
৮৪	সূরা কুরাইশ এর পরিচয়	২৮৪
৮৫	নেয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ	২৮৫
	سُورَةُ الْمَاعُون	২৮৭-২৮৯
৮৬	সূরা মাউন এর পরিচয়	২৮৭
৮৭	কাফের ও মোনাফেকের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের পরিণতি	২৮৮
	سُورَةُ الْكَوْثَر	২৯০-২৯২
৮৮	সূরা কাওসার এর পরিচয়	২৯০
৮৯	রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যানের সুসংবাদ প্রদান	২৯১
	سُورَةُ الكَافرون	২৯৩-২৯৬
৯০	সূরা কাফিরুন এর পরিচয়	২৯৩
৯১	দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে কারো সাথে আপোষ হয় না	২৯৫
	سُورَةُ النَّصر	২৯৭-৩০১
৯২	সূরা নাস্‌র এর পরিচয়	২৯৭
৯৩	বিজয় অর্জনের পর করণীয়	২৯৯
	سُورَةُ المسد	৩০২-৩০৫
৯৪	সূরা মাসাদ এর পরিচয়	৩০২
৯৫	দুনিয়ার দাপট পাপীকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারে না	৩০৩
	سُورَةُ الإخلاص	৩০৬-৩০৮
৯৬	সূরা ইখলাস এর পরিচয়	৩০৬
৯৭	আল্লাহর একত্ববাদ	৩০৮
	سُورَةُ الفلَق	৩০৯-৩১৩
৯৮	সূরা ফালাক এর পরিচয়	৩০৯
৯৯	সকল ধরণের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থণা	৩১১
	سُورَةُ النَّاس	৩১৩-৩১৮
১০০	সূরা নাস এর পরিচয়	৩১৪
১০১	জীন ও মানুষ সয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থণা...	৩১৬
১০২	লেখক পরিচিতি	৩১৯

(سُورة النّبأ)

সূরা আন নাবা এর পরিচয়:

সূরার নাম: আরবী ভাষায় প্রচলিত একটি নিয়ম হলো: একটি বড় বিষয় বা জিনিসের নাম রাখা হয় তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত একটি ছোট অংশ দিয়ে। পবিত্র কোরআনের সূরার নামকরণের ক্ষেত্রেও তার বিপরীত হয়নি। এজন্য বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ থেকে অত্র সূরার এমন পাঁচটি নাম পাওয়া যায়, যা সূরার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। নামগুলো হলো:
(ক) 'সূরা আম্মা' সূরাটি অত্র শব্দ দিয়ে শুরু হওয়ার কারণে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।
(খ) 'সূরা আন নাবা', শব্দটি সূরার দ্বিতীয় নাম্বার আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।
(গ) 'সূরা আম্মা ইয়াতাসাআলূন', বাক্যটি সূরার প্রথম আয়াত।
(ঘ) 'সূরা আল-মু'সিরাত', শব্দটি সূরার ১৪ নাম্বার আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।
(ঙ) 'সূরা তাসাউল', শব্দটি সূরার প্রথম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। (*রুহুল মায়ানী*, আলূসী: ১৫/২০১, *তাফসীর মাওজুয়ী*, মোস্তফা মুসলিম: ১০/১)।

আলোচ্যবিষয়: পুনরুত্থান দিবস ও তা সংগঠিত হওয়ার প্রমাণ।

সূরার ফযিলত:
(ক) কিয়ামুল লাইলে 'সূরা আন নাবা' তেলাওয়াত করা, রাসূলুল্লাহ (সা.) কিয়ামুল লাইলে এ সূরা পাঠ করতেন (*মাওসূয়াত ফাযায়িল সুয়ার*, তারহুনী: ২./১১০)। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন:

"أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلم - كان يقرأ النَّظائرَ السُورتين في رَكْعةٍ، (الرحمن، والنجم) في ركعة، و (اقتربت، والحاقة) في ركعة، و (الطور، والذاريات) في ركعة، و (إذا وقَعَت، ونون) في ركعة، و (سأل سائل، والنازعات) في ركعة، و (وَيْلٌ للمطففين، وعبس) في ركعة، و (المدَّثر، والمزمِّل) في ركعة، و (هل أتى، ولا أقسمُ بيوم القيامة) في ركعة، و (عمَ يتساءلون، والمرسلات) في ركعة، و (الدخان، وإذا الشمسُ كورت) في ركعة" (سنن أبو داود: ١٣٩٦).

অর্থাৎ: "রাসূলুল্লাহ (সা.) এক রাকয়াতে সাদৃশ্যপূর্ণ দুইটি সূরা তেলাওয়াত করতেন। প্রথম রাকয়াতে সূরা রহমান ও নাযম, পরের রাকয়াতে সূরা ক্বমার ও হাক্কাহ, পরের রাকয়াতে সূরা তূর ও যারিয়াাত, পরের রাকয়াতে সূরা ওয়াক্বিয়া ও নূন, পরের রাকয়াতে সূরা মায়ারিজ ও ন্যাযিয়াাত, পরের রাকয়াতে সূরা মুতাফফিফীন ও আবাসা, পরের রাকায়াতে সূরা মুদ্দাস্সির ও মুয্যাম্মিল, পরের রাকয়াতে দাহ্র ও কিয়ামাহ, পরের রাকায়াতে সূরা নাবা ও মুরসালাত এবং শেষের রাকাতে সূরা দুখান ও তাকভীর" (*সুনান আবি দাউদ:* ১৩৯৬, হাদীসটি সহীহ)।
(খ) অত্র সূরাটি মুফাস্সালাত এর অন্তভুক্ত, আর মুফাস্সালাত সূরাগুলোকে কোরআনের অন্তর বলা হয়। যেমন: ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন:

(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].

অর্থাৎ: “প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, আর কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্সাল সূরাগুলো”।

(*সুনানে দারিমী*, ৩৪২০)।

আরো একটি হাদীসে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে মুফাস্সালাত সূরাগুলো ইতিপূর্বে কোন নবী-রাসূলকে প্রদান করা হয়নি। যেমন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةِ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].

অর্থাৎ: “আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিষিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিষিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি”। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪)।

হাদীসে মুফাস্সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ৭৮তম সূরা।

অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ৭৯তম সূরা, যা ‘সূরা মায়ারেয’ এর পরে এবং ‘সূরা নাযিয়াত’ এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

অবতীর্ণের স্থান: সকল তাফসীরকারক একমত যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, সতরাং তা সূরা মাক্কিয়্যাহ। (*বিতাকাত আল-তারীফ*, ২৭৪)।

আয়াত সংখ্যা: ৪০টি।

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: এ সূরাটির একটি অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট পাওয়া যায়।

﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (١) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (٢) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (٣) كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (٤) ثُمَّ
كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (٥) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (٦) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (٧) وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (٨)
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (٩) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (١٠) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (١١) وَبَنَيْنَا
فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (١٢) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (١٣) وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا
(١٤) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (١٥) وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا (١٦)﴾ [سورة النبأ: ١-١٦].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়: পুনরুত্থান দিবস এবং তা সংগঠিত হওয়ার প্রমাণ।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১	কোন বিষয় সম্পর্কে	তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করছে?	২	মহাসংবাদটি সম্পর্কে,			
	عَمَّ	يَتَسَاءَلُونَ		عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ			
৩	যে বিষয়ে তারা	মতভেদ করছে।	৪	কখনও নয়,	তারা অচিরেই জানতে পারবে।		
	الَّذِي هُمْ فِيهِ	مُخْتَلِفُونَ		كَلَّا	سَيَعْلَمُونَ		
৫	আবারও বলি,	কখনও নয়,	তারা অচিরেই জানতে পারবে।	৬	আমি কি বানাইনি		
	ثُمَّ	كَلَّا	سَيَعْلَمُونَ		أَلَمْ نَجْعَلِ		
যমীনকে	শয্যা	৭	এবং পর্বতসমূহকে	পেরেক?	৮	আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি	
الْأَرْضَ	مِهَادًا		وَالْجِبَالَ	أَوْتَادًا		وَخَلَقْنَاكُمْ	
জোড়ায় জোড়ায়।	৯	আর আমি বানিয়েছি	তোমাদের নিদ্রাকে	বিশ্রাম।	১০	আর বানিয়েছি	
أَزْوَاجًا		وَجَعَلْنَا	نَوْمَكُمْ	سُبَاتًا		وَجَعَلْنَا	
রাত্রকে	আবরণ।	১১	আর বানিয়েছি	দিনকে	জীবিকার্জনের সময়।	১২	বানিয়েছি
اللَّيْلَ	لِبَاسًا		وَجَعَلْنَا	النَّهَارَ	مَعَاشًا		وَبَنَيْنَا
তোমাদের উপর	সাতটি সুদৃঢ় আকাশ।	১৩	আর সৃষ্টি করেছি	একটি উজ্জ্বল প্রদীপ।			
فَوْقَكُمْ	سَبْعًا شِدَادًا		وَجَعَلْنَا	سِرَاجًا وَهَّاجًا			
১৪	আর আমি বর্ষণ করেছি	মেঘমালা থেকে	প্রচুর পানি।	১৫	যেন বের করতে পারি		
	وَأَنْزَلْنَا	مِنَ الْمُعْصِرَاتِ	مَاءً ثَجَّاجًا		لِنُخْرِجَ		
তা দিয়ে	শস্য ও উদ্ভিদ	১৬	এবং ঘন উদ্যানসমূহ।				
بِهِ	حَبًّا وَنَبَاتًا		وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا				

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

কোন বিষয় সম্পর্কে কোরাইশ গোত্রের কাফের-মোশরেকরা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? অবশ্যই তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক নিয়ে আসা কোরআনকে সম্পর্কে মতভেদ করছে, কারণ এ কোরআন পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন: এ ধরণের মতভেদ করা কখনও ঠিক নয়, তারা অচিরেই পুনরুত্থান দিবসকে স্বচক্ষে দেখতে পাবে। আল্লাহ তায়ালা আবারও তাকীদ দিয়ে বলেছেন, এ ধরণের আচরণ কখনও ঠিক নয়, তারা অচিরেই এর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে জানতে পারবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর কুদরাত বর্ণনার মাধ্যমে পুনরুত্থান দিবস সংগঠিত হওয়ার যৌক্তিক দলীল পেশ পূর্বক বলেন: তোমরা কি দেখছোনা আমি যমীনকে সমতল আকারে তৈরি করে তোমাদের জন্য শয্যা হিসেবে নির্ধারণ করেছি এবং পর্বতসমূহকে যমীনের সাথে পেরেক মেরে দিয়েছি যাতে তা স্থির থাকে। আর আমি প্রজননের জন্য তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। আর আমি নিদ্রাকে তোমাদের জন্য বিশ্রাম বানিয়েছি। আর রাত্রকে বানিয়েছি আবরণ, যাতে আরামে বিশ্রাম নিতে পারো। আর দিনকে বানিয়েছি জীবিকার্জনের সময়, যাতে তোমরা জীবিকার্জন করে আরাম আয়েশে জীবনযাপন করতে পারো। এছাড়াও আমি তোমাদের উপর সাতটি সুদৃঢ় আকাশকে যমীনের জন্য ছাদ করেছি, যা তারকারাশি দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। তোমাদেরকে বাচিয়ে রাখার জন্য সূর্য নামক একটি উজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি। অনুরূপভাবে আমি মেঘমালা থেকে প্রচুর পানি বর্ষণ করেছি, যাতে আমি তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য শস্য, উদ্ভিদ এবং ঘন উদ্যানসমূহ উৎপাদন করতে পারি। উল্লেখিত ক্ষমতা দেখেও তোমরা বিশ্বাস করছো না যে, যিনি এত কিছু করতে পেরেছেন, তিনি অবশ্যই পুনরুত্থান দিবসে মানবজাতিকে পুনর্জীবিত করে বিচারের কাঠগড়ায় দাড় করাতে পারবেন। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫০১-৫০২, *আল-তাফসীর আল-মোয়াস্সার*: ১/৫৮২, *আল-মোন্তাখাব*: ৮৭৭-৮৭৮) ।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿النَّبَإِ الْعَظِيمِ﴾ 'মহাসংবাদ', অত্র আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ বিষয়ে তাফসীরকারকদের থেকে দুইটি মত পাওয়া যায়: (ক) আল-কোরআন আল-কারীম এবং (খ) কিয়ামতের দিন। (*গরীব আল-কোরআন*, ইবনু কুতাইবা: ৪৩৪) ।

তবে ইমাম ইবনু কাছীর (র.) দ্বিতীয় মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কারণ তৃতীয় নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে: যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করে। (*তাফসীর ইবনু কাছীর*: ৮/৩০২) ।

﴿سِرَاجًا وَهَّاجًا﴾ 'একটি উজ্জ্বল প্রদীপ', অত্র আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূর্য। (*গরীব আল-কোরআন*, ইবনু কুতাইবা: ৪৩৪) ।

﴿سَبْعًا﴾ 'সাতটি', অত্র আয়াতাংশে সাত সংখ্যা দ্বারা সাত আকাশকে বুঝানো হয়েছে। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/১১) ।

অত্র সূরার সাথে পূর্ববতী সূরার সম্পর্ক:

পূর্ববতী সূরা তথা সূরা মুরসালাত এ পুনরুত্থান দিবস সংগঠিত করা আল্লাহ তায়ালার জন্য খুবই সহজ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর অত্র সূরা তথা সূরা আন-নাবা তেও একই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। (*তাফসীর মাওজুয়ী*, মোস্তফা মুসলিম: ১০/৩) ।

সূরা আন-নাবা এর (১-২) আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

ইবনু জারীর আততবারী (র.) হাসান (র.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) রিসালাতের দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত হলে মক্কার কাফের-মোশরেকরা নিজেদের মধ্যে কানাকানি শুরু করে দেয়। তখন আল্লাহ তায়ালা অত্র সূরার প্রথম দুইটি আয়াত অবতীর্ণ করেন। (*লুবাব আল-নুকূল*, সুয়ূতী: ৩৫১) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। অত্র সূরার (১-৩) নাম্বার আয়াতে কোরআন এবং পুনরুত্থান দিবসকে মহান বিষয় আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অনুরুপভাবে পুনরুত্থান দিবস সংগঠিত হবে মর্মে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।
২। অত্র সূরার (৪-৫) আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা কোরআন ও পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করে, তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) যে বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন তার সত্যতা অচিরেই জানতে পারবে।
৩। অত্র সূরার (৬-১৬) নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নয়টি বিষয়ে তাঁর অপরিসীম ক্ষমতা বর্ণনার মাধ্যমে পুনরুত্থান দিবস সংগঠিত করতে তিনি যে সক্ষম তার স্বপক্ষে যৌক্তিক দলীল পেশ করেছেন:
(ক) যমীনকে সমতল আকারে বিছানা স্বরুপ তৈরি করা।
(খ) পর্বতসমূহকে যমীনের সাথে পেরেক মেরে পৃথিবীকে স্থির রাখা।
(গ) প্রজননের জন্য মানবজাতিকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা।
(ঘ) নিদ্রাকে প্রাণীকুলের জন্য বিশ্রাম হিসেবে নির্ধারণ করা।
(ঙ) বিশ্রামকে আরামদায়ক বনানোর জন্য রাত্রকে আবরণ বানানো।
(চ) দিনকে জীবিকার্জনের সময় হিসেবে নির্ধারণ করা।
(ছ) সাতটি সুদৃঢ় আকাশকে যমীনের জন্য ছাদ বানিয়ে তা তারকারাশি দিয়ে সজ্জিত করা।
(জ) সৃষ্টিকুলকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সূর্য নামক একটি উজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করা।
(ঝ) সৃষ্টিকুলের জীবিকার জন্য শস্য, উদ্ভিদ এবং ঘন উদ্যানসমূহ উৎপাদন করার লক্ষ্যে মেঘমালা থেকে পরিমিত পানি বর্ষণ করা।

আয়াতাবলীর আমল:

(ক) তাহাজ্জুদ সালাতে সূরা আন-নাবা তেলাওয়াত করা।
(খ) পুনরুত্থান দিবসের প্রতি ঈমান এনে আখেরাত ভিত্তিক জীবনযাপন করা।
(গ) কোন বিষয়ে নিজেদের ভিতর অতি কানাকানি না করে বিশেষজ্ঞদের স্মরনাপন্ন হওয়া।

﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا (١٧) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (١٨) وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ
فَكَانَتْ أَبْوَابًا (١٩) وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا (٢٠) إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (٢١) لِلطَّاغِينَ
مَآبًا (٢٢) لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (٢٣) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا (٢٤) إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا
(٢٥) جَزَاءً وِفَاقًا (٢٦) إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا (٢٧) وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا (٢٨) وَكُلَّ شَيْءٍ
أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا (٢٩) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا (٣٠)﴾ [سورة النبأ: ١٧–٣٠].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়: কিয়ামতের অবস্থা এবং সেখানকার শাস্তির ধরণ।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১৭	নিশ্চয়	ফয়সালার দিন	নির্ধারিত রয়েছে।	১৮	সেদিন	ফুঁক দেওয়া হবে	সিঙ্গায়,
	إِنَّ	يَوْمَ الْفَصْلِ	كَانَ مِيقَاتًا		يَوْمَ	يُنْفَخُ	فِي الصُّورِ

তখন তোমরা আসবে	দলে দলে।	১৯	আর খুলে দেওয়া হবে	আকাশ,	ফলে তা হবে
فَتَأْتُونَ	أَفْوَاجًا		وَفُتِحَتِ	السَّمَاءُ	فَكَانَتْ

বহু দ্বার বিশিষ্ট।	২০	আর চালানো হবে	পাহাড়সমূহকে,	ফলে তা হয়ে যাবে	মরীচিকা।
أَبْوَابًا		وَسُيِّرَتِ	الْجِبَالُ	فَكَانَتْ	سَرَابًا

২১	নিশ্চয়	জাহান্নাম	গোপন ফাঁদ।	২২	সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য	প্রত্যাবর্তনস্থল।	২৩
	إِنَّ	جَهَنَّمَ	كَانَتْ مِرْصَادًا		لِلطَّاغِينَ	مَآبًا	

তারা অবস্থান করবে	সেখানে	যুগ যুগ ধরে।	২৪	তারা আস্বাদন করবে না	সেখানে
لَابِثِينَ	فِيهَا	أَحْقَابًا		لَا يَذُوقُونَ	فِيهَا

কোন শীতলতা	না কোন পানি।	২৫	ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ছাড়া।	২৬	উপযুক্ত প্রতিফল স্বরূপ।
بَرْدًا	وَلَا شَرَابًا		إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا		جَزَاءً وِفَاقًا

২৭	নিশ্চয় তারা	আশা করতো না	হিসাবের।	২৮	আর তারা মিথ্যারোপ করেছিলো
	إِنَّهُمْ	كَانُوا لَا يَرْجُونَ	حِسَابًا		وَكَذَّبُوا

আমার আয়াতাবলীকে	সম্পূর্ণরূপে।	২৯	আর সব কিছুই	সংরক্ষণ করেছি	লিখিতভাবে।
بِآيَاتِنَا	كِذَّابًا		وَكُلَّ شَيْءٍ	أَحْصَيْنَاهُ	كِتَابًا

৩০	সুতরাং তোমরা স্বাদ গ্রহণ করো,	আমি বাড়িয়ে দিবো	কেবল আযাব।
	فَذُوقُوا	فَلَنْ نَزِيدَكُمْ	إِلَّا عَذَابًا

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

নিশ্চয় পূর্বে যারা এসেছিলো এবং পরে যারা আসবে সকলের জন্য কিয়ামতের দিন নির্ধারিত রয়েছে, যেদিন সকল প্রাণীকে বিচারের কাঠগড়ায় দাড়াতে হবে। সেদিন সিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁক দেওয়া মাত্র মানুষ তাদের নেতার সাথে দলে দলে হাশরের ময়দানে জড়ো হবে। আর আকাশ খুলে দেওয়া হবে, ফলে তা বহু দ্বার বিশিষ্ট হবে এবং সেখান থেকে ফেরেশতারা হাশরের ময়দানে অবতরণ করবে। আর পাহাড়সমূহকে চলমান করা হবে, ফলে সেগুলো মরীচিকার রূপ ধারণ করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। নিশ্চয় জাহান্নাম পাপীদের জন্য গোপন ফাঁদ এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য প্রত্যাবর্তন স্থল। সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে। কৃত অপকর্মের উপযুক্ত প্রতিফল স্বরূপ সেখানে তারা ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ছাড়া কোন শীতলতা এবং কোন পানীয় আস্বাদন করবে না। নিশ্চয় তারা দুনিয়ায় হিসাবের আশা করতো না। আর তারা আমার আয়াতসমূহকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতো। আর আমি তাদের সকল অপকর্মকে লিখিতভাবে সংরক্ষণ করেছি। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫০৩-৫০৪, *আল-তাফসীর আল-মোয়াস্সার*: ১/৫৮২, *আল-মোন্তাখাব*: ৮৭৮-৮৭৯) ।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿بَرْدًا﴾ 'ঠান্ডা', অধিকাংশ তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অত্র আয়াতাংশ দ্বারা দুইটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে:

(ক) জাহান্নামের আযাব শিথিল করা, সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে: "তাদের জন্য সেখানে জাহান্নামের আযাব শিথিল করা হবে না"।

(খ) তন্দ্রা বা ঘুম, সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে: "তারা সেখানে ঘুমানোর সুযোগ পাবে না"। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/১৯, *আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫০৩) ।

উল্লেখিত আয়াতাবলীর সাথে পূর্ববর্তী আয়াতাবলীর সম্পর্ক:

পূর্ববর্তী আয়াত তথা (১-১৬) নাম্বার আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা এ ইউনিভার্সকে পুরোপুরি ধ্বংস করে নুতন এক জগৎ সৃষ্টি করে সেখানে সকল প্রাণীকে জড়ো করে বিচারের কাঠগড়ায় দাড় করাতে সক্ষম। আর অত্র আয়াতাবলী তথা (১৭-৩০) নাম্বার আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে যে, কিয়ামত কখন সংগঠিত হবে তা পূর্ব নির্ধারিত, যা সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। অনুরূপভাবে কিয়ামতের অবস্থা ও জাহান্নামের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতাবলীর সম্পর্ক সুস্পষ্ট। (তাফসীর আল-মুনীর: ৩০/১৬) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। অত্র সূরার সতের নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকলের জন্য নির্ধারিত, যার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে রয়েছে। অতঃপর (১৮-২০) নাম্বার আয়াতে কিয়ামতের তিনটি ভয়াবহ অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে।

(ক) ইসরাফীল (আ.) এর সিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁকের পরে সকল প্রাণী কবর থেকে উঠে হাশরের ময়দানে জড়ো হবে। আর মানুষ তাদের নেতার সাথে দলে দলে ময়দানে মাহশারে একত্র হবে। এ সম্পর্কে কোরআন মাজীদের সূরা ইসরা এর একাত্তর নাম্বার আয়াতে এসেছে:

﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ [الإسراء:٧١] .

অর্থাৎ: “যেদিন আমি প্রত্যেক জাতিকে তাদের নেতাদের সাথে ডাকবো, সেদিন যাদের আমলনামা ডানহাতে দেওয়া হবে, তারা পড়া শুরু করবে, তাদের উপর সেদিন বিন্দুমাত্র যুলম করা হবে না” (সূরা ইসরা: ৭১) ।

(খ) সেদিন আকাশ ফেটে বহু দরজা বিশিষ্ট হবে এবং ফেরেশতাগণ আকাশ থেকে অবতরণ করবে। এর মাধ্যমে বিশ্ব রূপরেখা এবং রীতিনীতি সবকিছু পরিবর্তন হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তায়ালা অস্থায়ী রাজাবাদশাহদের কাছ থেকে সকল ক্ষমতা গ্রহণ করে তিনি একক ক্ষমতার অধিকারী হবেন। এ সম্পর্কে সূরা ইনফিতার এবং সূরা ইনশিক্বাক এর প্রথম আয়াতাবলীতে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও সূরা ফুরকান এর পচিশ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে:

﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا (٢٥) الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا (٢٦)﴾ [سورة الفرقان: ٢٥-٢٦].

অর্থাৎ: “এবং যেদিন আকাশ তার মেঘমালা নিয়ে ফেটে পড়বে, আর দলে দলে ফেরেশতারা যমীনে নেমে আসবে। সেদিন চূড়ান্ত বাদশাহী হবে একমাত্র দয়াময় আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যারা তাকে অস্বীকার করেছে তাদের উপর সেদিনটি হবে খুবই কঠিন” (সূরা ফুরকান: ২৫) ।

(গ) পাহাড়গুলোকে তাদের জায়গা থেকে সরিয়ে ফেলে সমতল করা হবে, ফলে তা মরীচিকার মতো হয়ে যাবে (আন-নাবা: ২০), তা সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধুলাবালিতে রূপান্তরিত হবে (ওয়াক্বিয়া: ৫-৬) এবং তা এক পর্যায়ে বাতাশে ধুনা তুলার মতো উড়তে থাকবে (আল-ক্বারিয়াহ: ৫/ ত্বহা: ১০৫/ আন-নমল: ৮৮) ।

২। অত্র সূরার (২১-২৬) আয়াতে কিয়ামতের দিন হতভাগা কাফের-মোশরেকদের ও সীমালঙ্ঘনকারীদের পাঁচটি ভয়াবহ অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে:

(ক) জাহান্নাম তাদের জন্য গোপন ফাঁদ হবে।

(খ) জাহান্নাম হবে তাদের একমাত্র আবাসস্থল।

(গ) তারা সেখানে যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে।

(ঘ) তাদের জন্য সেখানে ঘুমানোর কোন সুযোগ থাকবে না, অথবা তাদের জন্য শাস্তিকে বিন্দুমাত্র শিথিল করা হবে না।

(ঙ) জাহান্নামে তাদের পানীয় হবে ফুটন্ত পানি ও পুজ।

৩। অত্র সূরার (২৭-২৮) নাম্বার আয়াতে কাফিররা উল্লেখিত শাস্তির উপযোগী হওয়ার দুইটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে:

(ক) দুনিয়ায় থাকা কালে তারা মনে করতো কিয়ামতের দিন কোন হিসাবনিকাশ হবে না।

(খ) তারা আল্লাহর আয়াতবলীকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করতো।

৪। উনত্রিশ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে: আল্লাহ তায়ালা সকলের কৃতকর্ম কিতাবে লিখিত আকারে সংরক্ষণ করেন, যার আলোকে কিয়ামতের দিন বিচার হবে।

৫। ত্রিশ নাম্বার আয়াতে কাফিররা জাহান্নামে প্রবেশের পর তাদেরকে লাঞ্চিত করার জন্য একটি ঘোষণা দেওয়া হবে: তোমরা দুনিয়াতে আল্লাহর অবাধ্য ছিলে, এখন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করো, আজ তোমাদের জন্য শাস্তি কেবল বাড়ানো হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) বলেন: জাহান্নামীদের জন্য অত্র আয়াতের চেয়ে অধিক কষ্টের আয়াত আর দ্বিতীয়টি নেই। (*তাফসীর আল-মুনীর:* ৩০/১৯) ।

আয়াতাবলীর আমল:

(ক) পুনরুত্থান দিবসের প্রতি ঈমান এনে আখেরাত ভিত্তিক জীবনযাপন করা।

(খ) আল্লাহর আয়াতাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (٣١) حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (٣٢) وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا (٣٣) وَكَأْسًا دِهَاقًا (٣٤) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا (٣٥) جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا (٣٦)﴾ [النبأ: ٣١-٣٦].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়: কিয়ামতের দিন সৌভাগ্যবান মুমিনদের প্রতিদান।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

৩১	নিশ্চয়	মোত্তাকীদের জন্য রয়েছে	সফলতা।	৩২	উদ্যানসমূহ	এবং আঙ্গুরসমূহ।
	إِنَّ	لِلْمُتَّقِينَ	مَفَازًا		حَدَائِقَ	وَأَعْنَابًا
৩৩	এবং সমবয়স্কা উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণী।		৩৪	আর পরিপূর্ণ পানপাত্র।	৩৫	তারা শুনবেনা
	وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا			وَكَأْسًا دِهَاقًا		لَا يَسْمَعُونَ
সেখানে	কোন অসার	এবং মিথ্যা কথাবার্তা।	৩৬	তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রতিফল		
فِيهَا	لَغْوًا	وَلَا كِذَّابًا		جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ		
এবং যথোচিত দানস্বরূপ।						
عَطَاءً حِسَابًا						

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

নিশ্চয় যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং আখেরাত ভিত্তিক জীবনযাপন করে তারা জাহান্নাম থেকে নাজাত পেয়ে স্থায়ী জান্নাত লাভের মাধ্যমে মহাসফলতা লাভ করবেন। সেখানে তাদের আরাম-আয়েসের জন্য ফুলে-ফলে সুশোভিত উদ্যানসমূহ রয়েছে এবং খাবার হিসেবে রয়েছে সুঘ্রানযুক্ত আঙ্গুরসমূহ। এবং উপভোগের জন্য রয়েছে সমবয়স্কা উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণী। এছাড়াও পানীয় হিসেবে রয়েছে পরিপূর্ণ স্বচ্ছ পানপাত্র, যা অনবরত থাকবে। সেখানে তারা কোন অসার ও মিথ্যা কথা শুনবে না। উল্লেখিত পুরস্কারগুলো তাদের রবের পক্ষ থেকে প্রতিফল এবং যথোচিত দানস্বরূপ। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫০৫-৫০৬, *আল-তাফসীর আল-মোয়াস্সার*: ১/৫৮৩, *আল-মোন্তাখাব*: ৮৭৯)।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿مَفَازًا﴾ 'সফলতা', শব্দটি 'ক্রিয়ামূল' অথবা 'স্থান বাচক শব্দ' হতে পারে। অত্র আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইমাম ফখরুদ্দীন আল-রাযী (র.) কয়েকটি মত বর্ণনা করেছেন:

(ক) এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি বা জান্নাত লাভকে বুঝানো হয়েছে।

(খ) আরেকদল তাফসীরকারক বলেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: জাহান্নাম থেকে নাজাত পাওয়া। ইমাম রাযী (র.) প্রথম মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (*আল-তাফসীর আল-কাবীর*: ৩১/২১)। তবে এখানে দুইটি মতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এ ধরণের মতবিরোধকে 'ইখতেলাফ তানাওয়ী' বলে।

﴿دِهَاقًا﴾ 'পরিপূর্ণ', তাফসীরকারকগণ শব্দটির কয়েকটি অর্থ করেছেন:

(ক) ইবনু আব্বাস (রা.) শব্দটিকে বিভিন্ন সময়ে 'পরিপূর্ণ' অর্থে ব্যবহার করেছেন।
(খ) আবু হুরায়রা (রা.) বলেন: শব্দটির অর্থ হলো 'অনবরত' বা 'বিরামহীন'।
(গ) দাহ্হাক (র.) বলেন: এর অর্থ হলো: 'স্বচ্ছ'। (*আল-তাফসীর আল-কাবীর*: ৩১/২২)।
তবে এখানে তিনটি মতকেই একই সাথে উদ্দেশ্য করা যায়, কারণ কোরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে বুঝা যায়, জান্নাতের পানীয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে: তা অধিক স্বচ্ছ, পানপাত্র ভর্তি থাকবে এবং অনবরত চলবে। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

উল্লেখিত আয়াতাবলীর সাথে পূর্ববর্তী আয়াতাবলীর সম্পর্ক:

পূর্ববর্তী আয়াতাবলী তথা (১৭-৩০) নাম্বার আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে যে, কিয়ামত কখন সংগঠিত হবে তা পূর্ব নির্ধারিত, যা সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। অনুরূপভাবে কিয়ামতের অবস্থা এবং জাহান্নাম ও জাহান্নামীদের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আর অত্র আয়াতসমূহ তথা (৩১-৩৬) নাম্বার আয়াতে কিয়ামতের দিন মোত্তাকীদের পুরস্কারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতাবলীর সম্পর্ক সুস্পষ্ট। (তাফসীর আল-মুনীর: ৩০/২২)।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। অত্র সূরার (৩১-৩৫) নাম্বার আয়াতে যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং আখেরাত ভিত্তিক জীবনযাপন করে তাদের জন্য পাঁচটি পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে:
(ক) তারা জাহান্নাম থেকে নাজাত পেয়ে স্থায়ী জান্নাত লাভের মাধ্যমে মহাসফলতা লাভ করবেন।
(খ) সেখানে তাদের আরামআয়েসের জন্য ফুলে-ফলে সুশোভিত উদ্যানসমূহ রয়েছে এবং খাবার হিসেবে রয়েছে সুঘ্রানযুক্ত আঙুরসমূহ।
(গ) উপভোগের জন্য রয়েছে সমবয়স্কা উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণী।
(ঘ) পানীয় হিসেবে রয়েছে পরিপূর্ণ স্বচ্ছ পানপাত্র, যা অনবরত থাকবে।
(ঙ) সেখানে তারা কোন অসার ও মিথ্যা কথা শুনবে না। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/২৪)।
২। ছত্রিশ নাম্বার আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কারো পক্ষে শুধু তার নেকআমলের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়, বরং জান্নাতে প্রবেশ করতে হলে নেকআমলের পাশাপাশি আল্লাহর রহমত প্রত্যাশী হতে হবে। এক কথায় বলা যায় জান্নাতে প্রবেশের জন্য দুইটি জিনিস প্রয়োজন হবে: (ক) নেকআমল এবং (খ) আল্লাহর দয়া। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

আয়াতাবলীর আমল:

(ক) পুনরুত্থান দিবসের প্রতি ঈমান এনে আখেরাত ভিত্তিক জীবনযাপন করা।
(খ) আল্লাহ তায়ালার মহা পুরস্কারের আশায় বেশী বেশী নেকআমল করা এবং তাঁর রহমত পাওয়ার জন্য দোয়া করা।

﴿رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (٣٧) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ
وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (٣٨) ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ
شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا (٣٩) إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ
الْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا (٤٠)﴾ [سورة النبأ: ٣٧-٤٠].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়:

আল্লাহর ক্ষমতা, কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার নিশ্চয়তা এবং কাফিরদের প্রতি সতর্কতা।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

৩৭	(তিনি) আকাশসমূহের রব,	যমীনের	এবং এতদোভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর,	পরম করুনাময়।
	رَبِّ السَّمَاوَاتِ	وَالْأَرْضِ	وَمَا بَيْنَهُمَا	الرَّحْمَنِ

তারা সামর্থ্য রাখবে না	তাঁর সামনে	কথা বলার।	৩৮	সেদিন	রূহ এবং ফেরেশতাগণ দাড়াবে
لَا يَمْلِكُونَ	مِنْهُ	خِطَابًا		يَوْمَ	يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ

সারিবদ্ধভাবে,	কেউ কথা বলতে পারবে না,	তবে (তার কথা আলাদা)	যাকে অনুমতি দিবেন
صَفًّا	لَا يَتَكَلَّمُونَ	إِلَّا	مَنْ أَذِنَ لَهُ

পরম করুনাময়,	আর সে বলবে	সঠিক কথা।	৩৯	ঐটি	সত্য দিন,	সুতরাং যে চায়
الرَّحْمَنُ	وَقَالَ	صَوَابًا		ذَلِكَ	الْيَوْمُ الْحَقُّ	فَمَنْ شَاءَ

গ্রহণ করুন	তার রবের কাছে	আশ্রয়।	৪০	নিশ্চয় আমি	তোমাদেরকে সতর্ক করলাম
اتَّخَذَ	إِلَى رَبِّهِ	مَآبًا		إِنَّا	أَنْذَرْنَاكُمْ

একটি নিকটবর্তী আযাব সম্পর্কে,	যেদিন	মানুষ দেখতে পাবে	যা অগ্রে প্রেরণ করেছে
عَذَابًا قَرِيبًا	يَوْمَ	يَنْظُرُ الْمَرْءُ	مَا قَدَّمَتْ

তার দুই হাত,	আর কাফের বলবে:	হায় আফসোস!	আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।
يَدَاهُ	وَيَقُولُ الْكَافِرُ	يَالَيْتَنِي	كُنْتُ تُرَابًا

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা এমন যে, তিনি হলেন আকাশসমূহ, যমীন এবং এতদোভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর রব, আর দুনিয়া ও আখেরাতে পরম করুনাময়। তারা তাঁর সামনে কথা বলার সামর্থ্য রাখবে না। সেদিন জিবরীল (আ.) এবং অন্যান্য ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, যাকে পরম করুণাময় অনুমতি দিবেন সে ছাড়া অন্য কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। আর সে সঠিক কথাই বলতে পারবে, কোন ধরণের ছলছাতরীর আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ পাবে না। ঐ দিনটি সত্য, যে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। অতএব যে ব্যক্তি হাশরের

ময়দানের ভয়াবহতা থেকে নাজাত চায় সে যেন নেকআমলের মাধ্যমে তার রবের নিকট আশ্রয় প্রার্থণা করে। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে একটি নিকটবর্তী আযাব সম্পর্কে সতর্ক করলাম। যেদিন মানুষ তাদের ভালোমন্দ কৃতকর্ম –যা অগ্রে প্রেরণ করেছে– স্বচক্ষে দেখতে পাবে। পশু-পাখীর হিসাব গ্রহণ শেষে তাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হবে, কাফেররা পশু-পাখীর এ দৃশ্য দেখে নিজেদের হিসাব গ্রহণের ভয়াবহতার কারণে বলতে থাকবে: “হায় আফসোস! আমরাও যদি তাদের মতো মাটি হয়ে যেতাম”। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫০৬, *আল-তাফসীর আল-মোয়াস্সার*: ১/৫৮৩, *আল-মোন্তাখাব*: ৮৮০) ।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الرُّوحُ﴾ ‘রুহ’, শব্দটি আরবী, যার অর্থ হলো: ‘আত্মা’। অত্র শব্দটি কোরআন মাজীদে মোট নয় বার এসেছে, যা দ্বারা দুইটি বিষয়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে:

(ক) মানুষের অন্তর বা আত্মা, সূরা ইসরা এর (৮৫) নাম্বার আয়াতে (২) বার এসেছে এবং দুই বারেই এর দ্বারা মানুষের ভিতরে নিহিত আত্মাকে বোঝানো হয়েছে।

(খ) জিবরীল (আ.), কোরআন মাজীদে সাত বার ‘রুহ’ শব্দটি দিয়ে জিবরীলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যেমন: সূরা শুয়ারা এর (১৯৩) নাম্বার আয়াত, সূরা গাফির এর (১৫) নাম্বার আয়াত, সূরা আন-নাবা এর (৩৮) নাম্বার আয়াত, সূরা নাহল এর (২) নাম্বার ও (১০২) নাম্বার আয়াত, সূরা মায়রিজ এর (৪) নাম্বার আয়াত এবং সূরা ক্বাদ্‌র এর (৪) নাম্বার আয়াত। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

﴿لَا يَمْلِكُونَ﴾ ‘তারা সক্ষম হবে না’ এবং ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ﴾ ‘তারা কথা বলতে পারবে না’ ক্রিয়া দুইটির সর্বনামদ্বয় দ্বারা ‘মানবজাতি’কে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং আয়াতের হবে: “মানবাজতি কিয়ামতের দিন আল্লাহর ভয়ে তাঁকে সম্বোধন করতে সক্ষম হবে না/ কিয়ামতের দিন মানবজাতি তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন কথা বলতে পারবে না”। (তাফসীর আল-মুনীর: ৩০/২৬) ।

উল্লেখিত আয়াতাবলীর সাথে পূর্ববর্তী আয়াতাবলীর সম্পর্ক:

পূর্ববর্তী আয়াতাবলী তথা (৩১-৩৬) নাম্বার আয়াতে কিয়ামতের দিন মোত্তাকীদের পুরস্কারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর অত্র আয়াতাবলী তথা (৩৭-৪০) নাম্বার আয়াতে কিয়ামতের দিনের আল্লাহর ক্ষমতা, কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার নিশ্চয়তা এবং কাফিরদের প্রতি সতর্কতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতাবলীর সম্পর্ক সুস্পষ্ট। (তাফসীর আল-মুনীর: ৩০/২৬) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। অত্র সূরার (৩৭-৩৮) নাম্বার আয়াত থেকে বুঝা যায় কিয়ামতের দ্বিন আল্লাহ তায়ালার সামনে তার ভয়ে কেউ কথা বলতে সাহস করবে না। তবে দুইটি শর্তে মানুষ আল্লাহর সামনে কথা বলতে পারবে:

(ক) আল্লাহ কথা বলার অনুমতি প্রদান করলে।

(খ) অনুমতি পাওয়ার পর কেবল সত্য কথা বলতে পারবে। এ সম্পর্কে কোরআন মাজীদের সূরা হুদ এবং সূরা ত্বহা এ দুইটি আয়াত পাওয়া যায়। সূরা হুদ এ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [سورة هود: ١٠٥].

অর্থাৎ: "এমন একটি দিন আসছে, যে দিন তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কোন কথা বলতে পারবে না" (সূরা হুদ: ১০৫) । অনুরুপভাবে সূরা ত্বহা এ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ [سورة طه: ١٠٩].

অর্থাৎ: "সেদিন কারো কোন সুপারিশই কাজে আসবে না, অবশ্য যাকে করুণাময় আল্লাহ তায়ালা অনুমতি দিবেন এবংয ার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন, তার ব্যাপার আলাদা" (সূরা ত্বহা: ১০৯) । (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/২৭) ।

২। উনচল্লিশ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিয়েছেন যে, কিয়ামত সত্য, তা অবশ্যই সংগঠিত হবে, এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সুতরাং যারা সেদিন নাজাত পেতে চায়, তারা যেন ঈমান গ্রহণ পূর্বক সৎআমল করে।

৩। চল্লিশ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তিনটি পন্থা অবলম্বন করে কাফির-মুশরিকদেরকে কিয়ামতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন যে:

(ক) কিয়ামতের আযাব খুবই কাছে, আমি তোমাদেরকে নিকটবর্তী আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেছি। এছাড়াও কোরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে কিয়ামতকে নিকটবর্তী বলা হয়েছে। যেমন: সূরা নাযিয়াত এর (৪৬) নাম্বার আয়াত, সূরা হাশর এর (১৮) নাম্বার আয়াতে কিয়ামতের দিনকে আগামী কাল বলা হয়েছে।

(খ) কিয়ামতের দিন সকলে নিজের ভালোমন্দ কৃতকর্ম স্বচক্ষে দেখতে পাবে, যেদিন মানুষ নিজের পূর্ব প্রেরিত আমলের দিকে তাকিয়ে থাকবে। এছাড়াও সূরা আলে ইরমান এর (৩০) নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে: প্রত্যেকে সেদিন নিজের ভালোকর্ম কাছে উপস্থিত পাবে, আর যারা খারাপ কাজ করেছে, তারা তাদের আমল থেকে দুরে সরে যেতে চাইবে।

(গ) কাফিররা সেদিন নিজেদের ভয়াবহ পরিণতি দেখে মাটি হওয়ার বাসনা পেশ করবে, এছাড়াও কোরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে বলা হয়েছে সেদিন কাফিররা দুনিয়ায় পুণরায় ফিরে আসতে চাইবে, কেউ কেউ নিজেদের উপর অভিশাপ দিবে, আবার কেউ কেউ নিজের নেতৃবৃন্দের প্রতি অভিশাপ দিবে। কিন্তু কোন কিছুতেই তারা আর রক্ষা পাবে না।

৪। অত্র সূরার শেষের দুই আয়াত তথা (৩৯-৪০) নাম্বার আয়াত থেকে বুঝা যায় কিয়ামতের দিন মানবজাতি দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে: (ক) একদল মুমিন, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে ধন্য হবে, (খ) আরেক দল কাফের, তারা আল্লাহর ক্রোধে পতিত হয়ে ধ্বংস হবে। (আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন) ।

আয়াতাবলীর আমল:

(ক) পুনরুত্থান দিবসের প্রতি ঈমান এনে আখেরাত ভিত্তিক জীবনযাপন করা।

(খ) আল্লাহ তায়ালার মহা পুরস্কারের আশায় বেশী বেশী নেকআমল করা।

(سُورة النّازِعَات)

সূরা নাযিয়াত এর পরিচয়:

সূরার নাম: অত্র সূরার তিনটি নাম পাওয়া যায়:
(ক) নাাযিয়াাত, সূরাটি অত্র শব্দ দিয়ে শুরু হওয়ার কারণে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।
(খ) ত্বাাম্মাতু, শব্দটি সূরার ৩৪ নাম্বার আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।
(গ) সাাহিরাহ, শব্দটি সূরার ১৪ নাম্বার আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। (*নায্‌ম আল-দুরার*, বাক্বাভী: ২১/২১৭, *মাহাসিন আল-তা'ভীল*, কাসিমী: ৯/৩৯৫) ।

আলোচ্যবিষয়: পুনরুত্থান দিবস সংগঠিত হওয়ার প্রমাণ।

সূরার ফযিলত:
(ক) কিয়ামুল লাইলে সূরা নাাযিয়াত তেলাওয়াত করা, রাসূলুল্লাহ (সা.) কিয়ামুল লাইলে সূরা নাাযিয়াত পাঠ করতেন (*মাওসুয়াাত ফাযায়িল সুয়ার*, তারহুনী: ২./১১০) । আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন:

"أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلم - كان يقرأ النَّظائرَ السُورتين في رَكْعةٍ، (الرحمن، والنجم) في ركعة، و (اقتربت، والحاقة) في ركعة، و (الطور، والذاريات) في ركعة، و (إذا وقَعَت، ونون) في ركعة، و (سأل سائل، والنازعات) في ركعة، و (وَيْلٌ للمطففين، وعبس) في ركعة، و (المدَّثر، والمزمِّل) في ركعة، و (هل أتى، ولا أقسمُ بيوم القيامة) في ركعة، و (عمَ يتساءلون، والمرسلات) في ركعة، و (الدخان، وإذا الشمسُ كورت) في ركعة" (سنن أبو داود: ١٣٩٦).

অর্থাৎ: "রাসূলুল্লাহ (সা.) এক রাকয়াতে সাদৃশ্যপূর্ণ দুইটি সূরা তেলাওয়াত করতেন। প্রথম রাকয়াতে সূরা রহমান ও নায্‌ম, পরের রাকয়াতে সূরা ক্বমার ও হাক্কাহ, পরের রাকয়াতে সূরা তূর ও যারিয়াাত, পরের রাকয়াতে সূরা ওয়াক্বিয়া ও নূন, পরের রাকয়াতে সূরা মায়ারিজ ও নাাযিয়াাত, পরের রাকয়াতে সূরা মুতাফফিফীন ও আবাসা, পরের রাকায়াতে সূরা মুদ্দাস্‌সির ও মুয্‌যাম্মিল, পরের রাকয়াতে দাহ্‌র ও কিয়ামাহ, পরের রাকায়াতে সূরা নাবা ও মুরসালাত এবং শেষের রাকাতে সূরা দুখান ও তকভীর" (*সুনান আবি দাউদ:* ১৩৯৬, হাদীসটি সহীহ) ।
(খ) অত্র সূরাটি মুফাস্‌সালাত এর অন্তভুক্ত, আর মুফাস্‌সালাত সূরাগুলোকে কোরআনের অন্তর বলা হয়। যেমন: ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন:

(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].

অর্থাৎ: "প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, আর কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্‌সাল সূরাগুলো"।
(*সুনানে দারিমী*, ٣٤٢٠) ।
আরো একটি হাদীসে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে মুফাস্‌সালাত সূরাগুলো ইতিপূর্বে কোন নবী-রাসূলকে প্রদান করা হয়নি। যেমন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةَ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].
অর্থাৎ: “আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিষিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিষিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি”। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪)।
হাদীসে মুফাস্সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ৭৯তম সূরা।

অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ৮০তম সূরা, যা ‘সূরা নাবা’ এর পরে এবং ‘সূরা ইনফেতার’ এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

অবতীর্ণের স্থান: সকল তাফসীরকারক একমত যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, সতরাং তা সূরা মাক্কিয়্যাহ। (*বিতাকাত আল-তারীফ*, ২৭৭)।

আয়াত সংখ্যা: ৪৬টি।

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: এ সূরাটির একটি অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট পাওয়া যায়।

﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (١) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (٢) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا (٣) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (٤)
فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (٥) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (٦) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (٧) قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ (٨)
أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (٩) يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (١٠) أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً (١١)
قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (١٢) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (١٣) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (١٤)﴾
[سورة النازعات: ١-١٤].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়: কিয়ামত দিনের ভয়াবহতা।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১	শপথ	নির্দয়ে আত্মা উৎপাটনকারীদের।	২	শপথ	মৃদুভাবে বের করা আত্মার বহণকারীদের।	
	وَ	النَّازِعَاتِ غَرْقًا		وَ	النَّاشِطَاتِ نَشْطًا	
৩	শপথ	দ্রুতগতিতে সন্তরণকারীদের।	৪	অতঃপর (শপথ)	দ্রুতবেগে অগ্রসরমানদের।	
	وَ	السَّابِحَاتِ سَبْحًا		فَ	السَّابِقَاتِ سَبْقًا	
৫	অতঃপর (শপথ)	সকল কার্যনির্বাহকারীদের।	৬	সেদিন	প্রকম্পিত করবে	কম্পনকারী।
	فَ	الْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا		يَوْمَ	تَرْجُفُ	الرَّاجِفَةُ
৭	তাকে অনুরসণ করবে	পরবর্তী প্রকম্পনকারী।	৮	বহু আত্মা	সেদিন	ভীত-সন্ত্রস্ত হবে।
	تَتْبَعُهَا	الرَّادِفَةُ		قُلُوبٌ	يَوْمَئِذٍ	وَاجِفَةٌ
৯	তাদের দৃষ্টিসমূহ	অবনমিত হবে।	১০	তারা বলে:	আমরা কি	প্রত্যাবর্তিত হবই
	أَبْصَارُهَا	خَاشِعَةٌ		يَقُولُونَ	أَإِنَّا	لَمَرْدُودُونَ
পূর্বাবস্থায়?	১১	(এমনটা কি ঘটবে)	জীর্ণ অস্তিত্বে পরিণত হওয়ার পরও?	১২	তারা বলে:	
فِي الْحَافِرَةِ		أَ	إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً		قَالُوا	
তাই যদি হয়,	তাহলে তো এটা ক্ষতিকর প্রত্যাবর্তন।	১৩	আর এটা তো	এক মহাগর্জন মাত্র।		
تِلْكَ	إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ		فَإِنَّمَا هِيَ	زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ		
১৪	তৎক্ষনাৎ	তারা	(কবর থেকে) ভূ-পৃষ্ঠে উপস্থিত হবে।			
	فَإِذَا	هُمْ	بِالسَّاهِرَةِ			

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত পাঁচ প্রকার ফেরেশতার শপথ করে ঘোষণা দিয়েছেন যে পুনরুত্থান দিবস সত্য, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। পাঁচ প্রকার ফেরেশতা হলো: (ক) যারা কাফেরদের জান কবজের কাজে নিয়োজিত, (খ) যারা মুমিনদের জান কবজের কাজে নিয়োজিত, (গ)

যারা আল্লাহর নির্দেশকে দ্রুতবেগে অবতরণ করানোর কাজে নিয়োজিত, (ঘ) যারা মুমিনদের আত্মা জান্নাতে পৌছানোর কাজে নিয়োজিত এবং (ঙ) যারা আল্লাহর বিভিন্ন কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত আছেন। উল্লেখিত ফেরেশতাদের শপথ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন: নিশ্চয় সকল প্রাণী মৃত্যুর পরে পুনরুত্থিত হবেই। সেদিন প্রথম ফুঁৎকারে এক মহা প্রকম্পনে সবকিছু ধ্বংসের মাধ্যমে এক মহাপ্রলয় ঘটে যাবে। এভাবে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হবে, এরপর দ্বিতীয় ফুঁৎকারের পরে সকল প্রাণী হাশরের ময়দানে আল্লাহর সামনে জড়ো হওয়ার জন্য কবর থেকে উত্থিত হবে। সেদিন বহু আত্মা ভীত-সন্ত্রস্ত হবে এবং তাদের দৃষ্টিশক্তি লজ্জায় অবনমিত হবে।
পুনরুত্থান দিবস অস্বীকারকারীরা দুনিয়াতে বলে বেড়ায়: আমরা কি মৃত্যুর পরে পুনরায় আবার প্রথম বারের মতো জীবিত হবো? আমরা মৃত্যুর পরে পচেগলে মাটির সাথে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো, এরপর আমাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে, এটা কি করে সম্ভব!?। তারা উপহাসপূর্বক আরো বলে: যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে তো এটা আমাদের জন্য মারত্মক ক্ষতির কারণ হবে। তাদের জবাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন: এটাকে এতোটা কঠিন মনে করার কিছুই নেই, এটাতো ইসরাফিলের সিংগার দ্বিতীয় ফুঁকের প্রচন্ড গর্জন মাত্র, এ ফুঁকের পরে তৎক্ষনাৎ মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীরা সহ সকল প্রাণী নিমিশেই উত্থিত হয়ে হাশরের ময়দানে বিচারের সম্মুখীন হওয়ার জন্য জড়ো হবে। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫০৮-৫০৯, *আল-মোন্তাখাব*: *৮৮১-৮৮২*, *আল-মোয়াস্সার*: ১/৫৮৩) ।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿النَّازِعَاتِ﴾, ﴿النَّاشِطَاتِ﴾, ﴿السَّابِحَاتِ﴾, ﴿السَّابِقَاتِ﴾, ﴿الْمُدَبِّرَاتِ﴾ 'উৎপাটনকারীগণ', 'বহণকারীগণ', 'সন্তরনকারীগণ', 'অগ্রসরমানগণ' এবং 'কার্যনির্বাহকারীগণ', প্রথম পাঁচ আয়াতের পাঁচটি শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে দুইটি মত পাওয়া যায়:
(ক) বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত পাঁচ প্রকার ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে।
(খ) নক্ষত্ররাজীর পাঁচটি গুনের শপথ করা হয়েছে। (*তাফসীর* আল-মুনীর: ৩০/৩৩) ।
﴿الرَّاجِفَةُ﴾ 'প্রকম্পনকারী', আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে দুইটি মত পাওয়া যায়:
(ক) ইসরাফিলের সিংগার প্রথম ফুঁক। (*রুহুল মায়ানী*, আলুসী: ১৫/২২৭, *আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫০৮)।
(খ) পৃথিবী সহ সারা বিশ্বকে বোঝানো হয়েছে। (*গরীব আল-কোরআন*: ৪৩৭) ।
﴿الرَّادِفَةُ﴾ 'প্রকম্পনকারী', অধিকাংশ তাফসীর গ্রন্থে দেখা যায় অত্র আয়াতাংশ দ্বারা ইসরাফিলের সিংগার দ্বিতীয় ফুঁককে বুঝানো হয়েছে। (*রুহুল মায়ানী*, আলুসী: ১৫/২২৭) ।

অত্র সূরার সাথে পরবতী সূরার সম্পর্ক:

নিম্নবর্ণিত দৃষ্টিকোন থেকে অত্র সূরা তথা 'সূরা আল-নাযিয়াত এর সাথে পরবর্তী সূরা তথা 'সূরা আবাসা' এর সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ:
(ক) দুইটি সূরাতেই মানবজাতির উপর আল্লাহর অনুগ্রহের বর্ণনা এসেছে।
(খ) দুইটি সূরাতেই কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

(গ) দুইটি সূরাতেই আল্লাহ তায়ালার দিকে দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলা হয়েছে। 'সূরা আল-নাযিয়াত' এ ফেরআউন গোত্রের সাথে মুসা (আ.) এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। কাওমে ফেরআউনকে একত্ববাদের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা মুসা (আ.) কে তাদের নিকট পাঠিয়েছেন। কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করে তার উপর যুলম করেছিল। আর পরবর্তী সূরা তথা 'সূরা আবাসা' এ রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে মক্কার নের্তৃবৃন্দ ঈমান গ্রহণ না করলে তাতে তার দাওয়াতি কাজে কোন প্রভাব পড়বে না। দুর্বল ঈমানদারদেরকে গুরুত্বারোপ না করে শীর্ষস্থানীয় নের্তৃবৃন্দের ঈমান গ্রহণের আশায় তাদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা গুরুত্বপূর্ণ নয়। (*আল-তাফসীর আল-মাওজুয়ী*: ১০/৩৯-৪০) ।

সূরা নাযিয়াত এর ১২ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

মোহাম্মদ ইবনু কা'ব (রা.) বলেন: "আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবই?" (সূরা নাযিয়াত:১০) আয়াতটি অবতীর্ণ হলে কোরাইশ বংশের কাফিররা উপহাস পূর্বক বলতে লাগলো: আমরা মৃত্যুর পরে পুনর্জীবিত হলে তো ক্ষতিগ্রস্তই হতে হবে!। তাদের এহেন উপহাসের জবাবে আল্লাহ তায়ালা অত্র সূরার ১২ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করেন। (*লুবাব আল-নুকুল*: ৩৫৩) ।

সূরায় বর্ণিত কসমের ব্যাখ্যা:

মানুষের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা জায়েজ নেই। আর আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে ধরাবাধা কোন নিয়ম নেই। তিনি সাধারণত যে বিষয়ে কথা বলতে চান তার সাথে সম্পর্কিত কোন বস্তুর কসম করেন। অত্র সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত পাঁচ প্রকার ফেরেশতা, যেমন: (ক) কাফেরদের জান কবজকারী ফেরেশতা, (খ) মুমিনদের জান কবজকারী ফেরেশতা, (গ) আল্লাহর নির্দেশ বহণকারী ফেরেশতা, (ঘ) মুমিনদের আত্মা জান্নাতের দিকে বহণকারী ফেরেশতা এবং (ঙ) আল্লাহ তায়ালার বিভিন্ন কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতার শপথ করে বলেন: নিশ্চয় সকল প্রাণী মৃত্যুর পরে পুনরুত্থিত হবেই। উল্লেখ্য যে, একটি কসম বাক্যের তিনটি অংশ থাকতে হয়: (ক) হরফে কসম, (খ) কসম বা যে জিনিসের কসম করা হয় এবং (গ) জাওয়াবে কসম বা কসমের পর যে বিষয় কথা বলা হয়। অত্র আয়াতের কসমের ব্যাখ্যা নিম্নরুপ:

- হরফে কসম: ওয়া (আরবী হরফ)।
- কসম: বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত পাঁচ প্রকার ফেরেশতা, যেমন: (ক) কাফেরদের জান কবজকারী ফেরেশতা, (খ) মুমিনদের জান কবজকারী ফেরেশতা, (গ) আল্লাহর নির্দেশ বহণকারী ফেরেশতা, (ঘ) মুমিনদের আত্মা জান্নাতের দিকে বহণকারী ফেরেশতা এবং (ঙ) আল্লাহর বিভিন্ন কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা।
- জাওয়াবে কসম: নিশ্চয় সকল প্রাণী মৃত্যুর পরে পুনরুত্থিত হবেই।

কসম এবং জাওয়াবে কসমের মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট; কারণ এখানে আল্লাহ তায়ালা পাঁচ প্রকার ফেরেশতার শপথ করেছেন, যা আল্লাহ তায়ালার রুবুবিয়্যাত, একত্বাবাদ, জ্ঞান-প্রজ্ঞা এবং

ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত বহণ করে। সুতরাং তাদের শপথ করা তাঁর রুবুবিয়্যাত ও জ্ঞানে-গুণে কামালিয়্যাত এর শপথ করার শামিল। কসমে উল্লেখিত ফেরেশতাগণ তাঁর ক্ষমতার ভয়ে প্রাপ্ত দায়িত্বের এক সুতা এদিক সেদিক করতে পারে না। যার ক্ষমতার কারণে ফেরেশতাগণ এক তিল এদিক সেদিক করে না, তার ইশারায় পুনরুত্থান দিবস সংগঠিত হতে পারবে এটাই স্বাভাবিক। (*তিবইয়ান ফি আকসাম আল-কোরআন*, ইবনু জাওজিয়্যাহ: ৮৩) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। সাধারণত কোন সত্য বিষয়কে কেউ অস্বীকার করলে তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শপথ করা হয়। অত্র সূরার (১-৫) নাম্বার আয়াতেও দেখতে পাই যখন মক্কার কাফের-মুশরিকরা চিরন্তন সত্য পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করলো, তখন আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন মহৎ দায়িত্বে নিয়োজিত বিশালাকৃতির সৃষ্টি পাঁচ প্রকার ফেরেশতার শপথ করে পুনরুত্থান দিবসকে সাব্যস্ত করেছেন। (*তাফসীর মওজুয়ী*: (১০/২৩) ।

২। প্রথম পাচটি আয়াতে পুনরুত্থান দিবসকে সাব্যস্ত করার পর (৬-৯) নাম্বার আয়াতে কিয়ামত দিনের চারটি ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনা করেছেন:

(ক) ইসরাফিলের প্রথম ফুঁৎকারের পর মহাপ্রলয় ঘটবে।
(খ) দ্বিতীয় ফুঁৎকারের পর সকল প্রাণী পুনর্জীবিত হবে।
(গ) সেদিন কাফের, মুশরিক, মুনাফিক এবং ফাসেকদের আত্মা ভীত-সন্ত্রস্ত হবে।
(ঘ) সেদিন তাদের দৃষ্টিশক্তি ভয় ও লজ্জায় অবনমিত হবে। (*আইসার*: ৫/৫০৮-৫০৯) ।

৩। অত্র সূরার (১০-১২) নাম্বার আয়াতে পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কে কাফের-মুশরিকদের ভ্রান্ত উক্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এ দুনিয়াতে যখন তাদেরকে পুনরুত্থান দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন তারা তিনটি কথা বলে:

(ক) আশ্চর্য! আমাদেরকে মৃত্যুর পরে কিভাবে পুনর্জীবিত করা হবে?
(খ) মৃত্যুর পরে পচেগলে মাটির সাথে মিশে যাবো, অথবা পাথর হয়ে যাবো, এর পরেও কি পুনরায় আবার আমাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে?
(গ) তারা উপহাস করে বলে: আমাদেরকে বুঝি পুনর্জীবিত করা হবে, তাহলে তো আমরা সেদিন ক্ষতিগ্রস্ত হবো তাই না? (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/৩৭) ।

৪। অত্র সূরার (১৩-১৪) নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কে কাফের-মুশরিকদের ভ্রান্ত উক্তির দাতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন: ওরা মনে করে সকল প্রাণীকে পুনর্জীবিত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ, আসলে এটা আমার জন্য খুবই সহজ, শুধু ইসরাফিলের সিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁৎকারের একটি প্রচন্ড আওয়াজ মাত্র। যখনই সিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁৎকার দেওয়া হবে সাথে সাথে সকল প্রাণী তাদের কবর থেকে গজিয়ে উঠবে। (তাফসীর আল-মুনীর: ৩০/৩৭) ।

এছাড়াও কোরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তায়ালা হাশরের ময়দান সম্পর্কে কাফেরদের ভ্রান্ত উক্তির জবাব দিয়েছেন। যেমন: সূরা আ'রাফ এর ২৪ নাম্বার আয়াত, সূরা হিয্‌র এর (৩৬-৩৮) নাম্বার আয়াত, সূরা বাক্বারা এর ২৮ নাম্বার আয়াত, সূরা রূম এর ২৭

নাম্বার আয়াত, সূরা আহক্বাফ এর ৩৩ নাম্বার আয়াত এবং সূরা ফুস্‌সিলাত এর ৩৯ নাম্বার আয়াত। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

আয়াত ও সূরার আমল:

(ক) তাহাজ্জুদ সালাতে সূরা নাযিয়াত তেলাওয়াত করা।

(খ) পুনরুত্থান দিবস সংগঠিত হবে সত্য, এ কথা বিশ্বাস করে আখেরাত ভিত্তিক জীবন-যাপন করা।

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (١٥) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (١٦) اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ
إِنَّهُ طَغَى (١٧) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى (١٨) وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى (١٩) فَأَرَاهُ
الْآيَةَ الْكُبْرَى (٢٠) فَكَذَّبَ وَعَصَى (٢١) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى (٢٢) فَحَشَرَ فَنَادَى (٢٣) فَقَالَ
أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (٢٤) فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى (٢٥) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى
(٢٦)﴾ [سورة النازعات: ١٥-٢٦].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়: ফেরআউনের সাথে মূসা (আ.) এর ঘটনা ও শিক্ষা।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১৫	(হে মোহাম্মদ!) তোমার কাছে কি পৌঁছেছে	মূসার বৃত্তান্ত?	১৬	যখন	তাকে ডেকেছিলেন
	هَلْ أَتَاكَ	حَدِيثُ مُوسَى		إِذْ	نَادَاهُ

তার রব	পবিত্র তুওয়া উপত্যকায়।	১৭	তুমি যাও	ফেরআউনের কাছে,	নিশ্চয় সে
رَبُّهُ	بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى		اذْهَبْ	إِلَى فِرْعَوْنَ	إِنَّهُ

সীমালঙ্ঘন করেছে।	১৮	অতঃপর বলো:	তোমার কি আগ্রহ আছে	পুতপবিত্র হওয়ার?
طَغَى		فَقُلْ	هَلْ لَكَ	إِلَى أَنْ تَزَكَّى

১৯	আমি তোমাকে পথ দেখাবো	তোমার রবের দিকে,	যাতে তুমি তাকে ভয় করো।
	وَأَهْدِيَكَ	إِلَى رَبِّكَ	فَتَخْشَى

২০	অতঃপর সে (মূসা) তাকে দেখালো	বিরাট নিদর্শন।	২১	কিন্তু সে মিথ্যাজ্ঞান করলো
	فَأَرَاهُ	الْآيَةَ الْكُبْرَى		فَكَذَّبَ

এবং অবাধ্য হলো।	২২	অতঃপর	সে প্রস্থান করলো	ফাসাদ করার চেষ্টায়।	২৩
وَعَصَى		ثُمَّ	أَدْبَرَ	يَسْعَى	

অতঃপর সে সকলকে সমবেত করে	ঘোষণা দিলো।	২৪	আর বললো:	আমি হলাম
فَحَشَرَ	فَنَادَى		فَقَالَ	أَنَا

তোমাদের সর্বোচ্চ রব।	২৫	অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাকে পাকড়াও করলেন
رَبُّكُمُ الْأَعْلَى		فَأَخَذَهُ اللَّهُ

দুনিয়া ও আখেরাতের আযাব দ্বারা।	২৬	নিশ্চয়	এতে রয়েছে	শিক্ষা	তার জন্য, যে ভয় করে।
نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى		إِنَّ	فِي ذَلِكَ	لَعِبْرَةً	لِمَنْ يَخْشَى

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

মক্কার কাফের-মুশরিকরা পুনরুত্থান দিবসকে বারবার অস্বীকার করলে এবং এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহর (সা.) সাথে উপহাস করলে তিনি দুশ্চিন্তায় পরে যান। তখন আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ.) ও ফেরআউনের মধ্যকার ঘটনা বর্ণনা করে তাকে শান্তনা প্রদান করে বললেন: হে আল্লাহর নবী! আপনার কাছে তো মূসার (আ.) বৃত্তান্ত পৌঁছেছে। তার রব তাকে তুরে সিনাই এর তুওয়া নামক পবিত্র উপত্যকায় ডেকে নিয়ে মুজিযা সহ রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে মিশরের সীমালঙ্ঘনকারী বাদশা ফেরআউনের কাছে পাঠালেন। অতঃপর মূসা (আ.) তাকে বিভিন্ন মুজেযা প্রদর্শনপূবক একত্ববাদের দিকে আহবান করলে সে তা দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তার মন্ত্রীবর্গ, সৈন্যবাহিনী ও যাদুকরদেরকে মূসা (আ.) এর বিরুদ্ধে একত্রে জড়ো করে তাদের সামনে নিজেকে সর্বোচ্চ রব বলে দাবি করেছিল। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাকে কঠিন হস্তে পাকড়াও করে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে মেরেছেন এবং আখেরাতে তার জন্য জাহান্নামের কঠিন শাস্তি জমা করে রেখেছেন। সুতরাং হে আল্লাহর নবী! মক্কার কাফের-মুশরিকরা কি বললো এবং আপনার সাথে কি আচরণ করলো ঐ দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে আপনি আপনার দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হন, যেমনিভাবে মূসা (আ.) ফেরআউনের শত নির্যাতন ও বাধা উপেক্ষা করে তার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। নিশ্চয় যুগে যুগে যারা দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ করে অত্যাচারীদের অত্যাচারের স্বীকার হবে, তাদের জন্য মূসা ও ফেরআউনের মধ্যকার এ ঘটনা থেকে বিরাট শিক্ষা রয়েছে। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫১০-৫১১, *আল-মোন্তাখাব*: ৮৮২, *আল-মোয়াস্সার*: ১/৫৮৩-৫৮৪, *তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/৪০-৪১)।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ﴾ 'আখেরাত ও উলার আযাব', আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে তাফসীরকারকদের থেকে দুইটি মত পাওয়া যায়:

(ক) আখেরাত দ্বারা পরকাল এবং উলা দ্বারা ইহকালকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ: দুনিয়া ও আখেরাতের আযাব দ্বারা আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন।

(খ) ফেরআউনের জীবনে দুইটি বিখ্যাত উক্তি রয়েছে:

(i) "আমি তোমাদের জন্য আমাকে ছাড়া অন্য কোন ইলাহ দেখছিনা" (সূরা ক্বসাস: ৩৮)।

(ii) এ উক্তির চল্লিশ বছর পর সে আরেকটি উক্তি করেছিলো: "আমি তোমাদের সর্বোচ্ছ রব" (সূরা নাযিয়াত: ২৪)। উল্লেখিত আয়াতাংশে 'আখিরাহ' দ্বারা দ্বিতীয় উক্তি এবং 'উলা' দ্বারা প্রথম উক্তিকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ: ফেরআউনের প্রথম ও দ্বিতীয় উক্তির কারণে আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন।

তবে ইবনু কাসীর (র.) প্রথম মতকে দ্বিতীয় মতের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। (*তাফসীর ইবনু কাসীর*: ৮/৩১৫)।

﴿طُوًى﴾ 'তুওয়া', অত্র আয়াতে 'তুওয়া' দ্বারা সিনাই পর্বতের ডান পাশে অবস্থিত পবিত্র উপত্যকাকে বুঝানো হয়েছে, যেখানে আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ.) কে 'মাদায়েন' থেকে ফেরার সময় নবুয়াতের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/৩৮)।

﴿الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ﴾ 'বড় নিদর্শন', আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: মূসা (আ.) এর হাতের লাঠি সাপে রূপান্তরিত হওয়া, বগলের নীচে হাত রাখলে তা উজ্জ্বল সাদা হওয়া এবং পঙ্গপাল, ব্যাঙ, উকুন, রক্ত ইত্যাদি নয়টি নিদর্শন। (আলূসী: ১৫/২৩০, *বায়দভী*: ৫/২৮৩, কুরতুবী: ১৯/২০২ ।

অত্র আয়াতাবলীর সাথে পূর্ববর্তী আয়াতাবলীর সম্পর্ক:

পূর্ববর্তী আয়াতাবলী তথা (১-১৪) নাম্বার আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে যে কাফিররা পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার এবং তা নিয়ে উপহাস করলে রাসূলুল্লাহ (সা.) দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। আর অত্র আয়াত তথা (১৫-২৬) নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ফেরআউনের সাথে মূসা (আ.) এর ঘটনা উল্লেখ পূর্বক মোহাম্মদ (সা.) কে শান্তনা প্রদান করেছেন যে, কেবল আপনি কাফেরদের দ্বারা কষ্ট পাচ্ছেন তা নয়, বরং আপনার পূর্বে মূসা (আ.) ফেরআউন দ্বারা নির্যাতিত হয়েও দাওয়াতি কাজ থেকে এক মুহূর্তের জন্য বিরত হননি। সুতরাং এ ঘটনা থেকে আপনি সহ পরবর্তীদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/৩৯) ।

আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনা:

মূসা (আ.) দীর্ঘদিন মাদায়েনে থাকার পর স্বপরিবারে মিশরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলেন। দীর্ঘ সফরে একপর্যায় রাতের অন্ধকারে সামনে আর পথ চলতে পারছিলেন না। অনেক কষ্টে ঘোর অন্ধকারের মধ্যেই পথ চলছিলেন। পথ চলতে চলতে তূর পাহাড়ের কাছাকাছি একটি জায়গায় পৌঁছলে দুরে আলো দেখতে পেয়ে আশ্বস্ত হলেন। পরিবারের সবাইকে বললেন: তোমরা এখানে একটু অপেক্ষা করো, আমি দুরের ঐ আলো থেকে একটু আলো আনার চেষ্টা করি, যাতে বাকী পথ সহজে অতিক্রম করতে পারি। আলোর কাছে পৌঁছলে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে যায়। গায়েব থেকে কে যেন ডাক দিয়ে বলছেন: হে মূসা! আমি তোমার রব বলছি: তুমি পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় অবস্থান করছো, জুতা খুলে হাতে নাও। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা সীমালঙ্ঘনকারী ফেরআউনকে একত্ববাদের দিকে আহবান এবং বনী ইসরাইলদেরকে সৎপথের দীশা দেওয়ার জন্য তাকে রাসূল হিসেবে নির্বাচন করলেন। এ বিষয়ে লম্বা ঘটনা 'সূরা ত্বহা' এর (৯-১৩) নাম্বার আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অত্র আয়াতাবলীতে আল্লাহ তায়ালা উল্লেখিত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। ইমাম বাক্বায়ী (র.) বলেন: মূসা (আ.) এবং ফেরআউনের মধ্যকার ঘটনার সাথে কয়েকটি বিষয়ে হাশরের ময়দানের মিল রয়েছে, যেমন:

(ক) বনী ইসরাঈল ও কিবতী গোত্র এক জায়গায় জমায়েত হয়েছে। অনুরূপভাবে হাশরের ময়দানেও সকল মানুষ আল্লাহর সামনে বিচারের জন্য জমায়েত হবে।

(খ) বনী ইসরাঈল লোহিত সাগরের মধ্যে মূসা (আ.) এর লাঠির আঘাতে গঠিত রাস্তা পাড় হয়ে মুক্তি পেয়েছে এবং ফেরআউনের অনুসারীরা লোহিত সাগরের মাঝে ডুবে মরেছে। অনুরূপভাবে হাশরের ময়দানেও মুমিনগণ সীরাত পাড় হয়ে জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যমে মুক্তি পাবে এবং কাফির-মুশরিকরা সীরাত পার হতে গিয়ে জাহান্নামে পতিত হয়ে ধ্বংস হবে। (*নাযমুদ দুরার*, আল-বাক্বায়ী: ২১/২২৬-২২৭) ।

২। অত্র সূরার (১৫-২৬) নাম্বার আয়াতে ফেরআউনের সাথে মূসা (আ.) এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

(ক) ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষণীয়, কারণ পনের নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে এ ঘটনা জানার প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

(খ) দাওয়াতের ময়দানে আসার পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণ করা, কারণ (১৬-১৭) নাম্বার আয়াতে দেখতে পাই আল্লাহ মূসা (আ.) কে নির্জনে ডেকে নিয়ে দাওয়াতী কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন।

(গ) স্থান, কাল এবং অবস্থা বুঝে দাওয়াত দেওয়া, কারণ আঠারো নাম্বার আয়াতে দেখতে পাই মূসা (আ.) ফেরআউনকে দাওয়াত দেওয়ার পূর্বে তার ইচ্ছা জানতে চেয়েছিলেন।

(ঘ) দাওয়াত হবে একাত্ববাদের দিকে, কারণ উনিশ নাম্বার আয়াতে দেখা যায় মূসা (আ.) ফেরআউনকে তার রবের দিকে আহবান করেছিলেন। অনুরূপভাবে সকল নবীগণ জনগণকে একাত্ববাদের দিকে আহবান করেছিলেন।

(ঙ) দাওয়াতের ময়দানে শ্রোতা বা দর্শক দলীল তলব করলে যৌক্তিক দলিল উপস্থাপন করা, কারণ বিশ নাম্বার আয়াতে দেখতে পাই ফেরআউন মূসা (আ.) এর কাছে দলীল চাইলে তিনি তা প্রদান করেছিলেন।

(চ) ফেরআউন অত্যন্ত একগুঁয়ে প্রকৃতির লোক ছিল, কারণ (২১-২৪) নাম্বার আয়াতে দেখা যায় মূসা (আ.) তাকে একাত্ববাদের দিকে দাওয়াত দিলে সে দলীল চেয়েছিল এবং মূসা (আ.) যথার্থ দলীল পেশ করার পরেও সে তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে ক্ষান্ত হয়নি, বরং নিজেকে সর্বোচ্চ রব দাবী করেছিল।

(ছ) তাওহীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীর জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে মারাত্মক শাস্তি রয়েছে, কারণ পচিশ নাম্বার আয়াতে দেখা যায় ফেরআউন মূসা (আ.) এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে ইহকালে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে মেরেছেন এবং পরকালের জন্য শাস্তি জমা করে রাখার হুমকি দিয়েছেন।

(ছ) মূসা (আ.) এবং ফেরআউনের মধ্যকার ঘটনা থেকে মোত্তাকীনদের জন্য শিক্ষা রয়েছে, যা ছাব্বিশ নাম্বার আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়।

৩। প্রাচীন এবং আধুনিক সময়ের প্রায় সকল তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অত্র ঘটনাটি বিশেষভাবে এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো: রাসূলুল্লাহ (সা.) কে শান্তনা প্রদান করা। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

আয়াতাবলীর আমল:

(ক) কোরআনে বর্ণিত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

(খ) ছোট কিংবা বড় যে কোন ধরণের ক্ষমতা পেয়ে অন্যের উপর যুলম না করা।

(গ) হক্কানী ওলামাদের দাওয়াতে সারা দিয়ে আখেরাত ভিত্তিক জীবন-যাপন করা।

(ঘ) দলীল সহ ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা।

﴿أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (٢٧) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (٢٨) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ
ضُحَاهَا (٢٩) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (٣٠) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (٣١) وَالْجِبَالَ
أَرْسَاهَا (٣٢) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (٣٣)﴾ [سورة النازعات: ٢٧-٣٣].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়: পুনরুত্থান দিবস সংগঠিত হওয়ার প্রমাণ।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

২৭	তোমাদেরকে সৃষ্টি করা অধিকতর কঠিন	না আকাশ সৃষ্টি?	তিনি তা বানিয়েছেন।	২৮	
	أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا	أَمِ السَّمَاءُ	بَنَاهَا		
তিনি সুউচ্চ করেছেন	এর ছাদকে	এবং তা সুবিন্যস্ত করেছেন।	২৯	এবং ঢেকে দিয়েছেন	
رَفَعَ	سَمْكَهَا	فَسَوَّاهَا		وَأَغْطَشَ	
তার রাতকে (অন্ধকার দিয়ে)	এবং প্রকাশ করেছেন	এর দিবালোক।	৩০	এরপর যমীনকে	
لَيْلَهَا	وَأَخْرَجَ	ضُحَاهَا		وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ	
তিনি বিস্তীর্ণ করেছেন।	৩১	তিনি বের করেছেন	তা থেকে	তার পানি	এবং তার তৃণভূমি।
دَحَاهَا		أَخْرَجَ	مِنْهَا	مَاءَهَا	وَمَرْعَاهَا
৩২	এবং পাহাড়সমূহকে	তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।	৩৩	এগুলো ভোগের সামগ্রী	
	وَالْجِبَالَ	أَرْسَاهَا		مَتَاعًا	
তোমাদের জন্য	এবং তোমাদের পশুদের জন্য।				
لَكُمْ	وَلِأَنْعَامِكُمْ				

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

যারা পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে যৌক্তিক দলীল পেশ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: মানুষের দেহ সৃষ্টি করা অধিকতর কঠিন নাকি আকাশ সৃষ্টি করা? অবশ্যই আকাশ সৃষ্টি করা বেশী কঠিন, কারণ তাতে নিম্নের বিষয়গুলো রয়েছে যা মানুষ সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না: (ক) আকাশকে যমীনের জন্য ছাদ নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে কোন ফাটল নেই এবং নেই কোন অসামঞ্জস্যতা। তা সম্পূর্ণভাবে নিখুত সৃষ্টি করা হয়েছে, (খ) তা যমীনের উপর পাঁচশত আলোকবর্ষ দুরে সমুন্নত করা হয়েছে, (গ) তাকে অন্ধকারের পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে এবং (ঘ) সেখান থেকে দিবালোক প্রকাশ করা হয়েছে। এরপর যমীনকে বিস্তির্ণ করে তা থেকে পানি ও তৃনভূমি বের করে নিয়ে এসেছেন এবং সেখানে পাহাড়সমূহকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এগুলোকে তোমাদের এবং তোমাদের পশুদের জন্য ভোগের সমগ্রী বানিয়েছেন। এর পরেও তোমরা কিভাবে বলতে পারো মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা অসম্ভব। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫১২-৫১৩) ।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿أَأَنْتُمْ﴾ 'তোমরা কি?', অত্র আয়াতাংশে 'তোমরা' দ্বারা কাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে? এ ব্যাপারে তাফসীরকারকদের থেকে তিনটি মত পাওয়া যায়:

(ক) মক্কাবাসীকে সম্বোধন করা হয়েছে। (*মায়ানী আল-কোরআন*, আল-ফারাভী: ৩/২৩৩) ।

(খ) পুনরুত্থান দিবস অস্বীকারকারী সকলকে সম্বোধন করা হয়েছে। (আল-তাফসীর আল-কাবীর: ৩১/৪২) ।

(গ) সকল মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। (তাফসীরে ইবনু কাসীর: ৮/৩১৬) ।

তবে এখানে তৃতীয় মতটি অধিকতর গ্রহনযোগ্য, কারণ এ মতটি প্রথম ও দ্বিতীয় মতকে অন্তর্ভুক্ত করে। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ 'এবং উহার পর পৃথিবীকে', অত্র আয়াতাংশে 'উহা' ইঙ্গিতবোধক শব্দ দ্বারা আকাশের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ: আকাশ সৃষ্টির পর তিনি যমীনকে বিস্তীর্ণ করেছেন। (*তাফসীর আল-বাগাভী: ৫/২০৮*) ।

﴿وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾ 'এবং তোমাদের পশুর জন্য', অত্র আয়াতাংশে 'পশু' শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে দুইটি মত পাওয়া যায়:

(ক) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: উট, গরু এবং ছাগল। (*তাফসীর আল-কুরতুবী: ১৯/২০৬*) ।

(খ) এর দ্বারা মানুষ ও জিন ছাড়া অন্য সকল প্রাণীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। (*মাহাসিন আল-তাভীল*, কাসিমী: ৯/৪০২) ।

এখানে দ্বিতীয় মতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য, কারণ একত্রিশ নাম্বার আয়াতে 'তৃনভূমি' বলা হয়েছে, যেখান থেকে সকল প্রাণী আহার গ্রহণ করে। (আল্লাহ ভালো জানেন) ।

অত্র আয়াতাবলীর সাথে পূর্ববর্তী আয়াতাবলীর সম্পর্ক:

(১-১৪) নাম্বার আয়াতে হাশরের ময়দানের ভয়াবহ চিত্র এবং (১৫-২৬) নাম্বার আয়াতে যারা হাশর অস্বীকার করে তাদের মধ্যে একজনকে উল্লেখপূর্বক উদাহরন পেশ করা হয়েছে। আর অত্র আয়াতসমূহ তথা (২৭-৩৩) নাম্বার আয়াতে হাশর বা পুনরুত্থান দিবস সত্য এর স্বপক্ষে যৌক্তিক এবং বাস্তবভিত্তিক দলীল পেশ করা হয়েছে। সুতরাং পূর্বের আয়াতাবলীর সাথে অত্র আয়াতাবলীর সম্পর্ক স্পষ্ট। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/৪৪) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। অত্র সূরার (২৭-৩৩) নাম্বার আয়াতে মানবজাতির প্রতি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মূল ম্যাসেজ হলো: তিনি বিচার ব্যবস্থার জন্য সকল প্রাণীকে পুনর্জীবিত করে হাশরের ময়দানে একত্রিত করতে সক্ষম। এর স্বপক্ষে তিনি যৌক্তিক এবং বাস্তবভিত্তিক দলীল পেশ করেছেন:

(ক) আল্লাহ তায়ালা আকাশ সৃষ্টি করেছেন, যা নিম্নের বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে:

- (i) আকাশকে যমীনের উপর ছাদ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ নিখুত।
- (ii) তা যমীনের উপর পাঁচশত আলোকবর্ষ দুরে সমুন্নত করা হয়েছে।
- (iii) তাকে অন্ধকারের পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে।
- (iv) সেখান থেকে দিবালোক প্রকাশ করা হয়েছে। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫১২) ।

(খ) আল্লাহ তায়ালা আকাশ সৃষ্টির পরে যমীনকে বিস্তীর্ণ করেছেন, যা নিম্নের বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে:

(i) পানি ও তৃনভূমি বের করে নিয়ে এসেছেন।

(ii) সেখানে পাহাড়সমূহকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

(iii) উল্লেখিত সবকিছুই মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর জন্য ভোগের সমগ্রী বানিয়েছেন।

(গ) সাধারণত কোন ধরণের নমুনা ছাড়া প্রথমবার কোন কিছু সৃষ্টি করা কঠিন কাজ। দ্বিতীয় বার তা সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সুনিপুণভাবে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং দ্বিতীয়বার তা সৃষ্টি করা তার জন্য মোটেই কঠিন নয়।

উল্লেখিত তিনটি বাস্তবভিত্তিক দলীলের আলোকে বলা যায়: যিনি নানা রহস্যঘেরা বিশাল আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করতে পেরেছেন, যা মানুষ সৃষ্টির চেয়ে অধিকতর কঠিন কাজ এবং যিনি প্রথমবার এত সুন্দর আকৃতির মানুষ সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তার জন্য এ মানবজাতিকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করে হাশরের ময়দানে বিচারের জন্য একত্র করা মোটেই কঠিন কাজ নয়। (*তাফসীর আল-মুনীর:* ৩০/৪৬) ।

২। অত্র সূরার (২৭-৩৩) পর্যন্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়ালা আকাশ, যমীন, মাটি, পানি এবং খাদ্যদ্রব্য নিয়ে গবেষণার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/৪৭) । বর্তমান গবেষণার যুগে উল্লেখিত বিষয়গুলো গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে এবং সারা বিশ্বে হাজার হাজার গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে এ বিষয়ে গবেষণা করা হচ্ছে।

৩। উনত্রিশ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রাত্র এবং দিনকে আকাশের সাথে উল্লেখ করেছেন, অথচ আমরা বাহ্য দৃষ্টিতে একে পৃথিবীর সাথে সম্পর্কিত দেখতে পাই। এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ওহাবা জুহাইলী (র.) বলেন: দিনরাতের আগমন সূর্য উদয় ও অস্ত যাওয়ার সাথে সম্পর্কিত, তাই তাকে আকাশের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। (তাফসীর আল-মুনীর: ৩০/৪৭) ।

৪। সাতাশ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে "তোমাদের দেহ সৃষ্টি করা অধিকতর কঠিন নাকি আকাশ সৃষ্টি করা?", অর্থাৎ: তোমাদের দেহ সৃষ্টি করার চেয়ে আকাশ সৃষ্টি করা অধিকতর কঠিন। একই অর্থে কোরআনের 'সূরা মুমিন' এর ৫৭ নং আয়াতে এসেছে:

﴿لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سورة المؤمن: ٥٧].

অর্থাৎ: "নিসন্দেহে আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করা মানুষকে সৃষ্টি করার চেয়ে অধিকতর কঠিন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না" (*সূরা মুমিন:* ৫৭) ।

অনুরূপভাবে 'সূরা ইয়াসিন' এর ৮১ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ [سورة يس: ٨١].

অর্থাৎ: "যিনি নিজের ক্ষমতাবলে আকাশমন্ডল ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি পুনরায় তাদেরই মতো কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? নিশ্চয় তিনি মহাস্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ"। (*ইয়াসীন:* ৮১) ।

আয়াতাবলীর আমল:

(ক) পুনরুত্থান দিবসকে বিশ্বাস করে আখেরাত ভিত্তিক জীবনযাপন করা।

(খ) আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি জগৎ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা।

﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى (٣٤) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى (٣٥) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى
(٣٦) فَأَمَّا مَنْ طَغَى (٣٧) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٣٨) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (٣٩) وَأَمَّا مَنْ
خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (٤٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (٤١) يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ
أَيَّانَ مُرْسَاهَا (٤٢) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (٤٣) إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا (٤٤) إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا
(٤٥) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (٤٦)﴾ [سورة النازعات: ٣٤-٤٦].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়: কিয়ামতের দিনে মানুষের অবস্থা।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

৩৪	অতঃপর যখন	আসবে	মহাপ্রলয়।	৩৫	সেদিন	মানুষ স্মরণ করবে,	যা সে করেছে।
	فَإِذَا	جَاءَتِ	الطَّامَّةُ الْكُبْرَى		يَوْمَ	يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ	مَا سَعَى

৩৬	এবং প্রকাশ করা হবে	জাহীমকে	দর্শকদের জন্য।	৩৭	সুতরাং	যে সীমালঙ্ঘন করে
	وَبُرِّزَتِ	الْجَحِيمُ	لِمَنْ يَرَى		فَأَمَّا	مَنْ طَغَى

৩৮	এবং প্রাধান্য দেয়	দুনিয়ার জীবনকে,	৩৯	নিশ্চয়	জাহীম হবে	তার আশ্রয়স্থল।
	وَآثَرَ	الْحَيَاةَ الدُّنْيَا		فَإِنَّ	الْجَحِيمَ	هِيَ الْمَأْوَى

৪০	পক্ষান্তরে	যে	ভয় পায়	স্বীয় রবের সামনে দাড়ানোকে	এবং বিরত রাখে	নিজেকে
	وَأَمَّا	مَنْ	خَافَ	مَقَامَ رَبِّهِ	وَنَهَى	النَّفْسَ

কুপ্রবৃত্তি থেকে,	৪১	নিশ্চয়	জান্নাত হবে	তার আবাসস্থল।	৪২	তারা জিজ্ঞাসা করে
عَنِ الْهَوَى		فَإِنَّ	الْجَنَّةَ	هِيَ الْمَأْوَى		يَسْأَلُونَ

তোমাকে	কিয়ামত সম্পর্কে,	কখন	তা সংগঠিত হবে?	৪৩	এ ব্যাপারে তোমার বলার কি আছে?
كَ	عَنِ السَّاعَةِ	أَيَّانَ	مُرْسَاهَا		فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا

৪৪	তোমার রবের কাছেই আছে	এর চূড়ান্ত জ্ঞান।	৪৫	তুমি কেবল	তারই সতর্ককারী
	إِلَى رَبِّكَ	مُنْتَهَاهَا		إِنَّمَا أَنْتَ	مُنْذِرُ

যে	(কিয়ামতকে) ভয় করে।	৪৬	সেদিন তাদের মনে হবে,	যেদিন তারা তা দেখবে,
مَنْ	يَخْشَاهَا		كَأَنَّهُمْ	يَوْمَ يَرَوْنَهَا

তারা (দুনিয়ায়) অবস্থান করে নাই	এক সন্ধ্যা	অথবা	এক সকালের বেশী।	
لَمْ يَلْبَثُوا	إِلَّا عَشِيَّةً	أَوْ	ضُحَاهَا	

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

অতঃপর ইসরাফিলের সিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁৎকারের পর যখন সকল প্রাণীকে হাশরের ময়দানে জড়ো করে তাদের সামনে ভালোমন্দ সকল আমলনামা পেশ করা হবে, তখন তারা তাদের আমলগুলো দেখে চেনতে পারবে। এ সময় তাদের সামনে জাহান্নামকে পেশ করা হবে, ফলে তারা তা স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

সুতরাং যারা আল্লাহর সীমারেখা অতিক্রম করে এবং দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিয়ে দুনিয়াভিত্তিক জীবনযাপন করে, তাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যারা হাশরের ময়দানে আল্লাহর সামনে বিচারের জন্য দাড়ানোর ভয়ে নিজেকে যাবতীয় কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে, তাদের আবাসস্থল হবে স্থায়ী জান্নাত।

হে আল্লাহর নবী! পুনরুত্থান দিবস অস্বীকারকারীরা উপহাসপূর্বক আপনাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন হবে? আপনি তাদেরকে বলে দিন এ ব্যাপারে তাদেরকে বলার মতো আপনার কাছে কোন তথ্য নেই। যারা কিয়ামত দিনকে ভয় ও বিশ্বাস করে, আপনি কেবল তাদেরকে সতর্ক করবেন। কিয়মত দিন প্রত্যক্ষ্য করার পর তাদের অবস্থা এমন হবে যে, তাদের কাছে মনে হবে দুনিয়াতে তারা এক সকাল কিংবা এক সন্ধ্যা অবস্থান করেছিলো। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫১৪-৫১৫, *আল-তাফসীর আল-মোয়াস্সার*: ১/৫৮৪, *আল-মোন্তাখাব*: ৮৮৩) ।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الطَّآمَّةُ الْكُبْرَى﴾ 'মহাপ্রলয়', অত্র আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ বিষয়ে তাফসীরকারকদের থেকে দুইটি মত পাওয়া যায়:

(ক) 'ইসরাফিলের সিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁৎকার' কে বুঝানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় ফুঁকের সাথে সাথে সকল প্রাণী পুনর্জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে জড়ো হবে। সেখানে কৃতকর্ম অনুযায়ী একদল রহমতপ্রাপ্ত হবে এবং একদল আল্লাহর ক্রোধে পতিত হবে। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫১৪, *মায়ানী আল-কোরআন*, জুযায: ৫/২৮১) ।

(খ) আরেক দল তাফসীরকারক বলেন: এটি কিয়ামতের নামসমুহের একটি নাম। (*তাফসীর গরীব আল-কোরআন*, কাওয়ারী: ৭৯/৩৪) ।

তবে এখানে দুইটি মতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এ ধরনের মতবিরোধকে তাফসীরের পরিভাষায় 'ইখতিলাফ তানাওয়া'য়ী' বলা হয়। (আল-মুকাদ্দামাতু ফি আল-তাফসীর) ।

﴿السَّاعَةِ﴾ 'মুহুর্ত', অত্র আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'কিয়ামতের দিন'। (*তাফসীর গরীব আল-কোরআন*, কাওয়ারী: ৭৯/৪২) ।

উল্লেখিত আয়াতাবলীর সাথে পূর্ববতী আয়াতাবলীর সম্পর্ক:

পূর্বের আয়াতসমূহ তথা (২৭-৩৩) নাম্বার আয়াতে হাশর বা পুনরুত্থান দিবস সত্য এর স্বপক্ষে যৌক্তিক এবং বাস্তবভিত্তিক দলীল পেশ করা হয়েছে। আর অত্র আয়াতসমূহ তথা (৩৪-৪৬) নাম্বার আয়াতে হাশরের ময়দানে মানুষ তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে

বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি কিয়ামত কখন সংগঠিত হবে তা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন বিষয়ে কথা বলা হয়েছে। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/৪৪) ।

(৪৩-৪৬) আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বার বার কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে আল্লাহ তায়ালা অত্র সূরার শেষের চার আয়াত অবতীর্ণ করে জানিয়ে দেন যে কিয়ামত কখন হবে সে সম্পর্কে কেবল আল্লাহ তায়ালাই জানেন।
ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহকে উপহাস পূর্বক জিজ্ঞাসা করতো তুমি শুধু কিয়ামত কিয়ামত করো, তাহলে বলো: কখন তোমার কিয়ামত সংগঠিত হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা অত্র সূরার (৪৩-৪৬) আয়াত অবতীর্ণ করেছেন।
ইবনু জারীর আল-তবারী (র.) তার তাফসীর গ্রন্থে তারিক ইবনু শিহাব (র.) এর সনদে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কিয়মতের কথা বেশী বেশী স্মরণ করার কারণে আল্লাহ তায়ালা (৪৩-৪৪) নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। (*লুবাব আল-নুকূল*, সুয়ূতী: ৩৫২-৩৫৩) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। অত্র সূরার (৩৪-৩৬) আয়াতে হাশরের ময়দানের দুইটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে:
(ক) মানুষের সামনে যখন তাদের দুনিয়ার কৃতকর্ম পেশ করা হবে, তখন তারা তাদের কৃতকর্মগুলোকে চিনতে ও বুঝতে পারবে।
(খ) কাফির ও ঈমানদার সকলের সামনে জাহান্নামকে উপস্থাপন করা হবে। কাফিররা জাহান্নামের মধ্যে যত ধরণের শাস্তি আছে দেখতে পাবে এবং মুমিনরা জাহান্নামকে দেখে তাদেরকে যে নেয়ামত প্রদান করা হয়েছে তার মূল্য বুঝতে পারবে। (তাফসীর আল মুনীর: ৩০/৫৪) ।
২। অত্র সূরার (৩৭-৩৯) আয়াতে হাশরের ময়দানে বিচারের পর জাহান্নামী হওয়ার দুইটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে:
(ক) আল্লাহর বিধানের সীমালঙ্ঘন করা।
(খ) দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিয়ে দুনিয়া ভিত্তিক জীবনযাপন করা।
৩। অত্র সূরার (৪০-৪২) আয়াতে হাশরের ময়দানে বিচারের পর জান্নাতী হওয়ার দুইটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে:
(ক) কিয়ামতের দিনে আল্লাহর সামনে দাড়ানোকে ভয় করা।
(খ) কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজের আত্মাকে পুতপবিত্র রাখা।
৪। অত্র সূরার (৪৩-৪৬) আয়াতে কিয়ামত সংশ্লিষ্ট চারটি বিষয়ে কথা বলা হয়েছে:
(ক) কিয়ামতের প্রস্তুতির জন্য তা কখন সংগঠিত হবে তা জানার দরকার হয় না।
(খ) কিয়ামত কখন সংগঠিত হবে, তা কেবল আল্লাহ তায়ালা জানেন।
(গ) যারা কিয়ামতের দিনকে ভয় পাবে কেবল তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া।

(ঘ) মানুষ যখন কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা প্রত্যক্ষ করবে, তখন তাদের কাছে মনে হবে দুনিয়াতে তারা এক সকাল কিংবা এক সন্ধ্যা অবস্থান করেছিল।

৫। অত্র সূরার ৪৬নং আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আখেরাতের জীবনের তুলনায় দুনিয়ার জীবন খুবই স্বল্প সময়ের। এ সম্পর্কে সূরা আহক্বাফ এর ৩৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে:

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (٣٥)﴾ [سورة الأحقاف: ٣٥].

অর্থাৎ: “অতঃপর (হে নবী!) তুমি ধৈর্য ধারণ করো যেমন করে ধৈর্য ধারণ করেছিলো আগের যুগের রাসূলগণ, তাদের ব্যাপারে তুমি তাড়াহুড়ো করো না; যেদিন সত্যিই তারা সেই আযাব নিজেদের সামনে দেখতে পাবে, যার ওয়াদা তাদের কাছে করা হয়েছিলো, তখন তাদের অবস্থা হবে এমন, যেন তারা দুনিয়ায় দিনের সামান্য কিছু মুহূর্ত অতিবাহিত করে এসেছে; মূলত এটা একটি ঘোষণামাত্র, এ ঘোষণা যারা প্রত্যাখ্যান করেছে, কেবল তারাই সেদিন ধ্বংস হবে” (সূরা আহক্বাফ: ৩৫) ।

৬। অত্র সূরার ৩৫নং আয়াতের অনুরূপ একটি আয়াত সূরা ফায্‌র এর ২৩নং আয়াত এবং সূরা মুযাদালাহ এর ৬নং আয়াতে এসেছে এবং (৪২-৪৪) নাম্বার আয়াতের অনুরূপ আয়াত সূরা আরাফ এর ১৮৭ এবং সূরা লোক্বমান এর ৩৪নং আয়াতে এসেছে।

আয়াতাবলীর আমল:

(ক) কিয়ামতের ভয়াবহতার কথা মনে করে আখেরাত ভিত্তিক জীবনযাপন করা।

(খ) ইসলামের সীমরেখা অতিক্রম না করা।

(سُورة عَبَسَ)

সূরা আবাসা এর পরিচয়:

সূরার নাম:
ইবনু আশুর (র.) বলেন: সকল তাফসীর গ্রন্থ, মুসহাফ এবং হাদীস গ্রন্থে অত্র সূরার একটি মাত্র নাম পাওয়া যায়, আর তা হলো: সূরাতু আবাসা। (*আল-তাহরীর ওয়া আল-তানভীর*, ইবনু আশুর: ৩০/১০৩) ।

আলোচ্যবিষয়: ইসলামে সমতা বিধান, মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা ।

সূরার ফযিলত:
অত্র সূরাটি মুফাস্সালাত এর অন্তভুক্ত, আর মুফাস্সালাত সূরাগুলোকে কোরআনের অন্তর বলা হয়। যেমন: ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন:
(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].
অর্থাৎ: “প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, আর কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্সাল সূরাগুলো”।
(*সুনানে দারিমী*, ৩৪২০) ।
আরো একটি হাদীসে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে মুফাস্সালাত সূরাগুলো ইতিপূর্বে কোন নবী-রাসূলকে প্রদান করা হয়নি। যেমন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةِ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].
অর্থাৎ: “আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিষিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিষিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি”। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪) ।
হাদীসে মুফাস্সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।
মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ৮০তম সূরা।

অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ২৩তম সূরা, যা ‘সূরা নায্ম’ এর পরে এবং ‘সূরা ক্বদর’ এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।
অবতীর্ণের স্থান: সকল তাফসীরকারক একমত যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, সতরাং তা সূরা মাক্কিয়্যাহ। (*বিতাকাত আল-তারীফ*, ২৮০) ।
আয়াত সংখ্যা: ৪২টি।

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: এ সূরাটির দুইটি অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট পাওয়া যায়, যা যথাস্থানে আসবে ইনশাআল্লাহ।

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (٤) أَمَّا
مَنِ اسْتَغْنَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (٧) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى
(٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (١٠)﴾ [سورة عبس: ١-١٠].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়: ইসলামে সমতা বিধান।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১	সে ভ্রুকুঞ্চিত করলো	এবং মুখ ফিরিয়ে নিলো।	২	কারণ, তার নিকট আগমণ করেছিল		
	عَبَسَ	وَتَوَلَّى		أَنْ جَاءَهُ		
অন্ধ ব্যক্তিটি।	৩	তুমি কি জানতে,	হয়তো বা সে	(নিজেকে) পরিশুদ্ধ করে নিতো।	৪	
الْأَعْمَى		وَمَا يُدْرِيكَ	لَعَلَّهُ	يَزَّكَّى		
অথবা	সে উপদেশ গ্রহণ করতো,	অতঃপর	তাকে উপকার করতো	ঐ উপদেশ।		
أَوْ	يَذَّكَّرُ	فَ	تَنْفَعَهُ	الذِّكْرَى		
৫	পক্ষান্তরে যে (ব্যক্তি)	বেপরোয়া হয়েছে।	৬	তুমি	তার প্রতি	মনোযোগ দিলে।
	أَمَّا مَنِ	اسْتَغْنَى		فَأَنْتَ	لَهُ	تَصَدَّى
৭	অথচ তোমার কোন দোষ নেই	সে (নিজেকে) পরিশুদ্ধ না করলে।	৮	পক্ষান্তরে যে (ব্যক্তি)		
	وَمَا عَلَيْكَ	أَلَّا يَزَّكَّى		وَأَمَّا مَنْ		
তোমার নিকট ছুটে আসলো।	৯	সে (আল্লাহকে) ভয় করে।	১০	আর তুমি তার থেকে		
جَاءَكَ يَسْعَى		وَهُوَ يَخْشَى		فَأَنْتَ عَنْهُ		
উদাসীন হলে।						
تَلَهَّى						

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

মক্কার নের্তৃবৃন্দের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা.) গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক চলাকালে আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতুম নামক অন্ধ ও দুর্বল সাহাবী তার সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হলে তিনি বিরক্ত হয়ে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: হে আল্লাহর নবী! আপনি কি তার বিষয়ে জানেন? সে আপনার কাছ থেকে দ্বীনী পথনির্দেশ পেয়ে সৎকর্ম করতো যার কারণে তার চরিত্র ও কর্ম সুন্দর হতো, তার অভ্যন্তরিন অবস্থাও সুন্দর হতো এবং আপনার নসিহত শুনে সে উপকৃত হতে পারতো। পক্ষান্তরে, যারা হেদায়েত থেকে বিমুখ হয়েছে, আপনি তাদের প্রতি মনোযোগী হলেন। অথচ তারা নিজেদেরকে শিরক-কুফর থেকে পবিত্র না করতে পারলে আপনার কোন দায়দায়িত্ব নেই। আর যে ব্যক্তি অধির আগ্রহে আপনার সাক্ষাতের অপেক্ষায় ছিলো এবং সে

আল্লাহকে ভয় করে, আপনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এ কাজ আপনার জন্য মোটেই সমীচীন হয় নি। (*আল-মোন্তাখাব: ৮৮৪, আল-তাফসীর আল-মোয়াস্সার: ১/৫৮৫*)।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ﴾ 'সে ব্রুকুঞ্চিত করে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে', অত্র আয়াতে 'সে' সর্বনাম দ্বারা মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বুঝানো হয়েছে।

﴿الْأَعْمَىٰ﴾ 'অন্ধ ব্যক্তিটি', আয়াতাংশ দ্বারা 'আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মু মাকতুম' নামক অন্ধ সাহাবীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫১৬)।

অত্র সূরার সাথে পূর্ববর্তী সূরার সম্পর্ক:

নিম্নবর্ণিত দৃষ্টিকোন থেকে পূর্ববর্তী সূরা তথা 'সূরা আল-নাযিয়াত এর সাথে অত্র সূরা তথা 'সূরা আবাসা' এর সম্পর্ক খুবই স্পষ্ট:

(ক) দুইটি সূরাতেই মানবজাতির উপর আল্লাহর অনুগ্রহের বর্ণনা এসেছে।

(খ) দুইটি সূরাতেই কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

(গ) দুইটি সূরাতেই আল্লাহ তায়ালার দিকে দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলা হয়েছে। 'সূরা আল-নাযিয়াত' এ ফেরআউন গোত্রের সাথে মূসা (আ.) এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। কাওমে ফেরআউনকে একত্ববাদের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ.) কে তাদের নিকট পাঠিয়েছেন। কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করে তার উপর যুলম করেছিল। আর অত্র সূরা তথা 'সূরা আবাসা' এ রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে মক্কার নের্তৃবৃন্দ ঈমান গ্রহণ না করলে তাতে তার দাওয়াতি কাজে কোন প্রভাব পড়বে না। দুর্বল ঈমানদারদেরকে গুরুত্বারোপ না করে শীর্ষস্থানীয় নের্তৃবৃন্দের ঈমান গ্রহণের আশায় তাদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা গুরুত্বপূর্ণ নয়। (*আল-তাফসীর আল-মাওজূয়ী*: ১০/৩৯-৪০)।

আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন: অত্র সূরার প্রথমাংশ আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতুম (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কোন একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কার শীর্ষস্থানীয় নের্তৃবৃন্দের সাথে দাওয়াতি প্রোগ্রাম করছিলেন। এমন সময় আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মু মাকতুম এসে ডাকতে লাগলো: হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাকে সঠিক পথের দীশা দেন। সে যখন বারবার তাকে ডাকতেছিলো, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নের্তৃবৃন্দের সাথে প্রোগ্রমে মনোযোগ দিলেন। এবার সে বললো: হে আল্লাহর রাসূল আপনি কি আমার কথায় কোন অনিষ্টতা দেখছেন। তিনি উত্তরে বললেন: না, কোন অনিষ্টতা দেখছি না। রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘরে ফেরার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা অত্র সূরার প্রথমাংশ অবতীর্ণ করে তাকে সতর্ক করানোর পাশাপাশি কিছু দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। (*লুবাব আল-নুকূল*, সুয়ূতী: ৩৫৩)।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। অত্র সূরার (১-৪) আয়াতে কয়েকটি বিষয় ফুঠে উঠে:

(ক) **কেউ ভুল করে থাকলে সংশোধনের জন্য তার পদমর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ ভাষা ব্যবহার করতে হবে:** রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি মর্যাদাপুর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকার কারণে আল্লাহ তায়ালা তার ভুলের জন্য তিরস্কার করেছেন বিনম্র ভাষায়। তিনি তাকে সরাসরি সম্বোধন না করে, প্রথমে নামপুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করে সম্বোধন করে তৃতীয় আয়াত থেকে পরবর্তী আয়াতসমুহে উত্তমপুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করে দরদের সাথে তার ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫১৮) । এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, কেউ কোন ভুল করে থাকলে তাকে সোধরানোর জন্য তার পদমর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ ভাষা ব্যবহার করতে হবে। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

(খ) ধনী কাফিরের চেয়ে গরীব মুমিন আল্লাহ তায়ালার কাছে অনেক বেশী সম্মানিত, (৩-৪) নাম্বার আয়াত থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.) হেদায়েতের আশায় অতি আবেগে কম সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে বেশী সম্মানিত ব্যক্তির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। এটা বড় ধরণের কোন অপরাধ বা গুনাহ ছিলো না, যা একজন নবী থেকে সংগঠিত হওয়া অসম্ভব, বরং কারো প্রতি অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন, অথবা কারো প্রতি একটু বেশী ঝুকে পড়া, অথবা কাউকে বেশী ভালো বাসা ইত্যাদি মানবীয় গুণ, এটার জন্য আল্লাহ তায়ালা কাউকে পাকড়াও করবেন না। (তাফসীর আল-মুনীর: ৩০/৬১) । এতদসত্তেও আল্লাহ তায়ালা একজন কাফিরের মোকাবেলায় একজন মুমিন অসম্মানিত হবে এটাকে মেনে নিতে না পেরে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বিনম্র ভাষায় তিরস্কারপূর্বক সতর্ক করেছেন। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

২। অত্র সুরার (৫-১০) নাম্বার আয়াতে রাসূলুল্লাহর প্রতি আল্লাহ তায়ালার তিরস্কারের ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমত: (৫-৭) নাম্বার আয়াতে বলেছেন: "যারা নিজেদের ধনসম্পদ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি এবং বংশমর্যাদায় পরিতুষ্ট হয়ে ইলাহী হেদায়েত, কোরআনের জ্ঞান এবং ঈমানকে মোটেই মূল্য দিচ্ছে না আপনি তাদের ভিতর এমন কি দেখলেন যে কারণে দুর্বল হয়ে তাদের প্রতি মনোযোগী হয়ে গেলেন, অথচ কাউকে পরিশুদ্ধ করার ক্ষমতা আপনাকে দেওয়া হয় নাই"। দ্বিতীয়ত: (৮-১০) নাম্বার আয়াতে বলেছেন: "আর আপনার কাছে একজন অন্ধ ব্যক্তি আসলো যে আমাকে ভয় করে, আপনি তাকে মোটেই গুরুত্ব দিলেন না, এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে!"। আপনার উচিৎ হবে ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, ধণী-গরীব এবং রাজা-প্রজা নির্বিশেষে সকলের সাথে সমতার ভিত্তিতে ব্যবহার করা। আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা হেদায়েত প্রদান করবেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়েত থেকে বঞ্চিত রাখবেন, এটা একন্তই তার ইচ্ছা। (তাফসীর আল-মুনীর: ৩০/৬১-৬২) ।

৩। আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দুইটি কারণে তিরস্কার করেছেন:

(ক) দুর্বল শ্রেণী যেন হেদায়েত থেকে দুরে সরে না পড়ে।

(খ) গরীব মুমিন ধনী কাফিরের চেয়ে উত্তম, এ কথা জানিয়ে দেওয়ার জন্য। (তাফসীর আল-মুনীর: ৩০/৬২) ।

৪। দাওয়াতী কাজ, লেনদেন, বিচার বিভাগ সহ সর্বক্ষেত্রে সমতা বিধান ইসলামে ওয়াজিব, উল্লেখিত আয়াতাবলী এর স্বপক্ষে দলীল।

৫। সাত নাম্বার আয়াত থেকে বুঝা যায় আল্লাহ তায়ালা নবী-রাসূল এবং আলেম-ওলামাদেরকে শুধু রেসালাতের দাওয়াত অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন। কারা দাওয়াত গ্রহণ করলো আর কারা গ্রহণ করলো না সেটা আল্লাহ দেখবেন। আল্লাহ তায়ালা কোরআনের অসংখ্য আয়াতে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

৬। অত্র সূরার (১-১২) নাম্বার আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন। (*আইসার আল-তাফাসীর: ৫/৫১৮*) ।

আয়াতাবলীর আমল:

১। আত্মীয়তার সম্পর্ক, বন্ধুত্বের সম্পর্ক, সামাজিক শ্রেনীভেদ ইত্যাদি বাধা উপেক্ষা করে লেনদেন, বিচার ব্যবস্থা এবং দাওয়াতী কাজে সকলের সাথে সমতার ভিত্তিতে আচরণ করা।

২। কারো ভুল শোধরানোর জন্য তার পদমর্যাদা অনুযায়ী তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করা।

﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (١٢) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (١٣) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ
(١٤) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ (١٦) قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (١٧) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ
خَلَقَهُ (١٨) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (١٩) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (٢٠) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (٢١)
ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (٢٢) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ (٢٣)﴾ [سورة عبس: ١١-٢٣].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়:

কোরআন মানুষের জন্য উপদেশ এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১১	কখনও (এরূপ করবে) না,	নিশ্চয় এটা	উপদেশ বাণী।	১২	সুতরাং যে	চাইবে,
	كَلَّا	إِنَّهَا	تَذْكِرَةٌ		فَمَنْ	شَاءَ
তা স্মরণ করবে।	১৩	এটা (সংরক্ষিত) আছে সম্মানিত সহীফাসমূহে।	১৪	সমুন্নত,	পবিত্র,	
ذَكَرَهُ		فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ		مَرْفُوعَةٍ	مُطَهَّرَةٍ	
১৫	লেখকদের হাত দ্বারা লিখিত,	১৬	(যারা) সম্মানিত,	পুণ্যবান।	১৭	ধ্বংস হোক
	بِأَيْدِي سَفَرَةٍ		كِرَامٍ	بَرَرَةٍ		قُتِلَ
মানুষ!	সে কতইনা অকৃতজ্ঞ।	১৮	কোন বস্তু থেকে	তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন?	১৯	
الْإِنْسَانُ	مَا أَكْفَرَهُ		مِنْ أَيِّ شَيْءٍ	خَلَقَهُ		
শুক্র বিন্দু থেকে	তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন,	অতঃপর তাকে সুগঠিত করেছেন।	২০	তারপর		
مِنْ نُطْفَةٍ	خَلَقَهُ	فَقَدَّرَهُ		ثُمَّ		
(দুনিয়ায়) চলার পথ	তার জন্য সহজ করে দিয়েছেন।	২১	অতঃপর	তিনি তাকে মৃত্যু দেন		
السَّبِيلَ	يَسَّرَهُ		ثُمَّ	أَمَاتَهُ		
এবং কবরস্থ করেন।	২২	অতঃপর	যখন তিনি চাইবেন	তাকে পুনর্জীবিত করবেন।		
فَأَقْبَرَهُ		ثُمَّ	إِذَا شَاءَ	أَنْشَرَهُ		
২৩	না, কখনও নয়,	সে পালন করেনি,	তিনি যা তাকে আদেশ করেছিলেন।			
	كَلَّا	لَمَّا يَقْضِ	مَا أَمَرَهُ			

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

গরীব-মিসকীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ধনবান ব্যক্তিবর্গের দিকে একান্ত মনোযোগ দেওয়া কখনও ঠিক নয়। হে আল্লাহর নবী! আগামীতে যেন এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। নিশ্চয় এ

সূরাটি সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য একটি মূল্যবান উপদেশ। সুতরাং যার ইচ্ছা এ কোরআনকে উপদেশ হিসেবে গ্রহণ করুক এবং যার ইচ্ছা তা থেকে বিরত থাকুক। যে ব্যক্তি কোরআনের উপদেশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে তার ব্যাপারে আপনার দুশ্চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। কোরআন মানুষের একমাত্র জীবনবিধান এ কথা বর্ণনার পরে আল্লাহ তায়ালা তার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, যা তাকে জীবনবিধান হওয়ার মর্যাদায় সমুন্নত করেছে:

(ক) অত্যন্ত স্পষ্ট বাণী ।

(খ) কোরআন লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত।

(গ) আল্লাহর কাছে অতি মূল্যবান।

(ঘ) সপ্তম আকাশের উপর সমুন্নত।

(ঙ) শয়তানের ছোয়া পাওয়া থেকে সম্পূর্ণ পুতপবিত্র।

(চ) আল্লাহর অনুগত সম্মানিত লেখক ফেরেশতাগণ কর্তৃক লাওহে মাহফুজ থেকে কপি করা।

কাফেরদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অতি মনোযোগের কারণে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মু মাকতুম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। সুতরাং উম্মু মকতুম থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অমনোযোগী হওয়া এবং তার প্রতি আল্লাহ তায়ালার তিরস্কার আসা এ দুইটাই কাফেরদের কারণে হয়েছে। যে কারণে তারা আল্লাহর লা'নতের উপযুক্ত হয়েছে। তারা ধ্বংস হোক, বড্ড অকৃতজ্ঞ তারা। অতঃপর এ অকৃতজ্ঞ কাফেরদেরকে নিজেদের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ব নেয়ামত সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করার আহবান জানানো হয়েছে, যাতে তারা কুফরী থেকে ফিরে আসে। তারা একটু ভেবে দেখুক তারা যেই আল্লাহকে অস্বীকার করে, তিনি তাদেরকে কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? তিনি তাদেরকে এক বিন্দু নাপাক পানি থেকে সৃষ্টি করে প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন: দুইটি হাত, দুইটি পা, দুইটি চোখ ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে সুগঠিত করেছেন। এরপরেও তাদের জন্য কি অহংকার করা শোভা পায়?

অতঃপর তাদের ভালো-মন্দের পথ স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন, যাতে তারা মুক্তির পথে চলতে পারে। অতঃপর তিনি তাদেরকে মৃত্যুর পরে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, যাতে তাদের সম্মান ও কদর বজায় থাকে। সবশেষে তিনি যখন চাইবেন তাদেরকে বিচারের জন্য পুনর্জীবিত করবেন। সাবধান! তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার উল্লেখিত নেয়ামতসমূহকে অস্বীকার করা কখনও ঠিক নয়, বরং তাদের উচিৎ ঈমান গ্রহণ করে তাঁর প্রতি অনুগত পোষণ করা। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫২০, *আল-মোন্তাখাব*: ৮৮৫, *আল-মোয়াস্সার*: ১/৫৮৫) ।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾ 'নিশ্চয় এটা উপদেশ', অত্র আয়াতাংশে 'এটা' সর্বনাম দ্বারা 'সূরা আবাসা' কে বুঝানো হয়েছে। (*গরীব আল-কোরআন*, ৪৩৯) ।

﴿ذَكَرَهُ﴾ 'সে তা স্মরণ করবে', আয়াতাংশে 'তা' দ্বারা 'কোরআন' কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। (*গরীব আল-কোরআন*, ৪৩৯) ।

﴿سَفَرَةٍ﴾ 'লেখকগণ বা দূতগণ', এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'ফেরেশতা লেখকগণ'।

﴿قُتِلَ﴾ 'হত্যা করা হয়েছে', এখানে 'লা'নত করা হয়েছে' অর্থে এসেছে। (*গরীব আল-কোরআন*, ৪৩৯) ।

অত্র আয়াতাবলীর সাথে পূর্ববর্তী আয়াতাবলীর সম্পর্ক:

পূর্ববর্তী আয়াতাবলী তথা (১-১০) নাম্বার আয়াতে মক্কার প্রভাবশালী কাফের-মুশরিকদের প্রতি অতি মনোযোগের কারণে আব্দুল্লাহ ইবনু মাকতুম এর প্রতি ভ্রূকুঞ্চিত করে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে তিরস্কার করেছেন। আর অত্র আয়াতাবলীতে তাকে সতর্ক করা হয়েছে যে, উল্লেখিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন ভবিষ্যতে আর কখনও না হয়। এছাড়াও যে সকল কাফেরদের কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) তিরস্কৃত হলেন, তাদের প্রতি অভিসম্পাত করে সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহর নেয়ামতের স্বীকৃতি স্বরূপ হেদায়েতের দিকে ফিরে আসে। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/৬৫) ।

সূরা আবাসা এর সতের নাম্বার আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

ইকরামাহ (রা.) বলেন: সতের নাম্বার আয়াতটি ওতবা ইবনু আবু লাহাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। বিস্তারিত ঘটনা হলো: ওতবা ইবনু আবু লাহাব ঈমান গ্রহণ করেছিলো, অতঃপর যখন সূরা নায্ম অবতীর্ণ হয়, তখন সে বলে 'সূরা নায্ম' এর প্রভুকে অস্বীকার করলাম। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা অত্র সূরার সতের নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করে তার প্রতি অভিসম্পাত প্রদান পূর্বক সতর্ক করলেন। (*আসাবাব আল-নুযূল*, সুয়ূতী: ৩৫৩) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। অত্র সূরার (১১-১৬) নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা দুইটি বিষয় আলোচন করেছেন:

(ক) দাওয়াতি কাজ, বিচারব্যবস্থা, আচার-আচরণ ইত্যাদিতে মানুষের মধ্যে বৈষম্য না করা, রাসূলুল্লাহ (সা.) আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মু মাকতুম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মক্কার প্রভাবশালীদেরকে গুরুত্বারোপ করার কারণে প্রথমে তাকে তিরস্কার করা হয়েছে এবং পরে তাকে সতর্ক করা হয়েছে যে এ ধরণের ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন ভবিষ্যতে কখনও না ঘটে। অবশেষে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এটা সকলের জন্য উপদেশ। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/৬৬)।

(খ) কোরআন মানুষের জন্য একমাত্র জীবনবিধান, কোরআনের মধ্যে ছয়টি বৈশিষ্ট্য বিধ্যমান থাকার কারণে তা মানবজাতির একমাত্র জীবনবিধান হিসেবে পরিগণিত হয়েছে: (ক) অত্যন্ত স্পষ্ট বাণী, (খ) কোরআন লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত, (গ) আল্লাহর কাছে অতি মূল্যবান, (ঘ) সপ্তম আকাশের উপর সমুন্নত, (ঙ) শয়তানের ছোঁয়া পাওয়া থেকে সম্পূর্ণ পুতপবিত্র এবং (চ) আল্লাহর অনুগত সম্মানিত লেখক ফেরেশতাগণ কর্তৃক লাওহে মাহফুজ থেকে কপি করা। (*আল-কুরতুবী*: ১৯/২১৬-২১৭) । আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ، وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ، وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ" (صحيح البخاري: ٤٩٣٧).

অর্থাৎ: “কোরআনের হাফিজ পাঠক লিপিকর সম্মানিত ফেরেশতার মতো। খবু কষ্টদায়ক হওয়া সত্ত্বেও যে বারবার কোরআন মাজীদ পাঠ করে, সে দিগুণ পুরস্কার পাবে” (*সহীহ আল-বুখারী*: ৪৯৩৭) ।

২। মানুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালার দুই প্রকার নেয়ামত রয়েছে: (ক) আত্মিক নেয়ামত এবং (খ) বাহ্যিক নেয়ামত। কোরআন হলো তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আত্মিক নেয়ামত। পরবর্তী আয়াতাবলীতে আল্লাহ তায়ালা বাহ্যিক নেয়ামত নিয়ে আলোচনার পর এ সকল নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মানবজাতিকে হেদায়েতের দিকে ফিরে আসার আহবান করেছেন। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

৩। বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ অধ্যায়ন করে বুঝা যায় অত্র সূরার (১৭-২৩) নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তিনটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন:

(ক) মানব দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট আল্লাহর বাহ্যিক নেয়ামত প্রতিনিয়ত দেখার পরেও কাফেররা কিভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করছে! আল্লাহ তায়ালা তিনটি নেয়ামত উল্লেখপূর্বক আশ্চর্য হয়ে তাদেরকে অভিসম্পাত প্রদান পূর্বক সতর্ক করেছেন যে এত নেয়ামত ভোগের পরেও কিভাবে তারা হেদায়েতকে অস্বীকার করতে পারে! নেয়ামত তিনটি হলো:

(i) তাদেরকে এক ফোটা নাপাক পানি থেকে সৃষ্টি করে সুগঠিত করা।
(ii) তাদের জন্য জীবন চলার পথকে সহজ করা।
(iii) মৃত্যুর পর তাদের লাশকে কুকর-শুকরের খাদ্য না বানিয়ে দাপনের ব্যবস্থা করা।

(খ) প্রতিনিয়ত আল্লাহর কুদরাত অবলোকন করার পরেও কিভাবে তারা তাঁকে অস্বীকার করছে! (১৭-২৩) নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তার তিনটি কুদরত বর্ণনা করেছেন। উল্লেখিত কুদরতকে তারা প্রতিনিয়ত স্বচক্ষে দেখার পরেও কিভাবে তাঁকে অস্বীকার করতে পারে!। কুদরত তিনটি হলো:

(i) তাদেরকে এক ফোটা নাপাক পানি থেকে সৃষ্টি করে সুগঠিত করা।
(ii) তাদের জন্য জীবন চলার পথকে সহজ করা।
(iii) মৃত্যুর পর তাদেরকে আবার পুনর্জীবিত করা।

(গ) পুনরুত্থান দিবস সংগঠিত হওয়ার প্রমাণ দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তার তিনটি কুদরত, অথবা নেয়ামত বর্ণনার পর পুনরুত্থান দিবস অস্বীকারকারীদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি যখন চাইবেন সকল প্রানীকে পুনর্জীবিত করে বিচারের কাঠগড়ায় দাড় করিয়ে বিচার করবেন। (তাফসীর আল-মুনীর: ৩০/৬৯ , আইসার আল-তাফাসীর: ৫/৫২০) ।

আয়াতাবলীর আমল:

(ক) কোরআন কারীমকে একমাত্র জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করা।
(খ) আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করা।
(গ) সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার পক্ষে পুনরুত্থান দিবস সংগঠিত করে সকলের বিচার করা সম্ভব এ কথা বিশ্বাস করা।

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (٢٤) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (٢٦)
فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (٢٨) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (٢٩) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (٣٠) وَفَاكِهَةً
وَأَبًّا (٣١) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (٣٢)﴾ [سورة عبس: ٢٤-٣٢].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়:

আল্লাহর কুদরত এবং অনুগ্রহ সম্পর্কে গবেষণার প্রতি মানুষকে উৎসাহিতকরণ।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

২৪	সুতরাং মানুষ লক্ষ্য করুক	তার খাদ্যের প্রতি।	২৫	নিশ্চয় আমি	বর্ষণ করি
	فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ	إِلَى طَعَامِهِ		أَنَّا	صَبَبْنَا

প্রচুর বৃষ্টি।	২৬	অতঃপর	আমি বিদীর্ণ করি	যমীনকে	যথাযথভাবে।	২৭	অতঃপর
الْمَاءَ صَبًّا		ثُمَّ	شَقَقْنَا	الْأَرْضَ	شَقًّا		فَ

উৎপাদন করি	সেখানে	শস্য,	২৮	আঙ্গুর, শাক-শবজী,	২৯	যয়তুন,	খেজুর,
أَنْبَتْنَا	فِيهَا	حَبًّا		وَعِنَبًا وَقَضْبًا		وَزَيْتُونًا	وَنَخْلًا

৩০	শ্যামল ঘন বাগান,	৩১	ফলমূল এবং ঘাষ।	৩২	(এগুলো) তোমাদের এবং তোমাদের পশুর উপভোগের জন্য।
	وَحَدَائِقَ غُلْبًا		وَفَاكِهَةً وَأَبًّا		مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

সুতরাং মানুষের উচিৎ সে এবং অন্যান্য প্রাণী যে খাবার খেয়ে বেঁচে আছে তা নিয়ে একটু চিন্তা করা, আল্লাহ তায়ালা কিভাবে তা সৃষ্টি করেছেন এবং কিভাবে তার জন্য জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করেছেন? যাতে সে এগুলোকে পরকালের সুখলাভের মাধ্যম বানাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা নিজেই খাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেন: প্রথমে আমি প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করে বিভিন্ন গাছগাছালী বের করার মাধ্যমে যমীনকে বিদীর্ণ করি। অতঃপর সেখানে ধান, গম, যব, ভুট্টা ইত্যাদি শস্য, আঙ্গুর, শাক-শবজী, যয়তুন, খেজুর, শ্যামল ঘন বাগান, ফলমূল এবং ঘাষ উৎপাদন করি। উল্লেখিত উৎপাদন সমগ্রীর কিছু তোমাদের খাবার উপযোগী করা হয়েছে এবং কিছু অন্যান্য প্রাণী জগতের জন্য খাবার উপযোগী করা হয়েছে। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫২০, *আল-মোন্তাখাব: ৮৮৫*, *আল-মোয়াস্সার: ১/৫৮৫*) ।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا﴾ 'অতঃপর আমি যমীনকে যথাযথভাবে বিদীর্ণ করি', অত্র আয়াতের অর্থ হলো: "অতঃপর আমি গাছগাছালী গজানোর মাধ্যমে যমীনকে বিদীর্ণ করি"। (*তাফসীর গরীব আল-কোরআন*, আল-কাওয়ারী: ৮০/২৬, *তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/৭০) ।

অত্র আয়াতাবলীর সাথে পূর্ববর্তী আয়াতাবলীর সম্পর্ক:

পূর্ববর্তী আয়াতাবলী তথা (১১-২৩) নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কুদরতের প্রমাণ এবং মানুষের সাথে সম্পৃক্ত তাঁর কয়েকটি নেয়ামতের বর্ণনা দিয়েছেন। আর অত্র আয়াতাবলী তথা (২৪-৩২) নাম্বার আয়াতে সৃষ্টি জগতে আল্লাহর কুদরতের প্রমাণ এবং মানুষের প্রয়োজনীয় কয়েকটি নেয়ামতের বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে অত্র আয়াতাবলীর সম্পর্ক স্পষ্ট। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/৭০) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। অত্র সূরার চব্বিশ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতি এবং অন্যান্য প্রাণীকে যে বিভিন্ন প্রকারের খাবারের ব্যবস্থা করেছেন, তা সম্পর্কে মানবজাতিকে গবেষণা করার নির্দেশ প্রদানের পর (২৫-২৭) নাম্বার আয়াতে খাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন:

প্রথমত:

আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টির মাধ্যমে যমীনে সেচ প্রদান করেন।

দ্বিতীয়ত:

মানুষ লাঙ্গল অথবা মেশিন দিয়ে যমীন চাষ করে।

তৃতীয়ত:

বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা ও ফলমূল উৎপাদন হয়।

২। আল্লাহ তায়ালা (২৭-৩১) নাম্বার আয়াতে আট প্রজাতির গাছগাছালী এবং ফসলের বর্ণনা দিয়েছেন: (ক) শস্য, যেমন: চাল, গম, যব, ভুট্টা ইত্যাদি, (খ) আঙ্গুর, (গ) ভিজা খেজুর অথবা শাক-শবজী, (ঘ) যায়তুন বা জলপাই, (ঙ) খেজুর, (চ) শ্যামল ঘন বাগান, (ছ) ফলমূল এবং (জ) ঘাষ। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/৭২) ।

৩। বত্রিশ নাম্বার আয়াতের মাধ্যমে জানা যায় যে, আট প্রকার গাছগাছালী এবং ফসল উৎপাদনের উদ্দেশ্য হলো: তা থেকে মানুষ এবং পশু-পাখী খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে উপকৃত হয়।

৪। উল্লেখিত আয়াতে হাশরের ময়দান সংগঠিত হওয়ার স্বপক্ষে শক্তিশালী দলীল রয়েছে, যিনি বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে মৃত যমীনকে জীবিত করে তাতে শস্য শ্যামল গাছপালা উৎপাদন করতে পারেন, তিনি অবশ্যই সকল প্রাণীকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করে বিচারের কাঠগড়ায় দাড় করাতে পারবেন।

আয়াতাবলীর আমল:

নিম্নের তিনটি বিষয় অনুধাবন করতে সৃষ্টি জগৎ কে নিয়ে গবেষণা এবং আল্লাহর নেয়মতকে স্মরণ করা:

(ক) আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস করা।

(খ) পুনরুত্থান দিবস সত্য, এ কথা বিশ্বাস করা।

(গ) আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান এবং তাঁর অনুসরণ করা।

﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ (٣٣) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ
وَبَنِيهِ (٣٦) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٣٧) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (٣٨) ضَاحِكَةٌ
مُسْتَبْشِرَةٌ (٣٩) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (٤٠) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (٤١) أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ
الْفَجَرَةُ (٤٢)﴾ [سورة عبس: ٣٣-٤٢].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়: কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

৩৩	অতঃপর যখন	আসবে	কিয়ামতের বিকট আওয়ায,	৩৪	সে দিন	মানুষ পালাবে
	فَإِذَا	جَاءَتِ	الصَّاخَّةُ		يَوْمَ	يَفِرُّ الْمَرْءُ

তার ভাই থেকে,	৩৫	তার মা	ও তার বাবা থেকে,	৩৬	তার স্ত্রী ও	তার সন্তান থেকে।
مِنْ أَخِيهِ		وَأُمِّهِ	وَأَبِيهِ		وَصَاحِبَتِهِ	وَبَنِيهِ

৩৭	সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন গুরুতর অবস্থা হবে,	যা তাকে ব্যতিব্যস্ত রাখবে।
	لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ	يُغْنِيهِ

৩৮	বহু চেহারা	সেদিন	উজ্জ্বল হবে,	৩৯	সহাস্য,	প্রফুল্ল।	৪০	আর বহু চেহারা
	وُجُوهٌ	يَوْمَئِذٍ	مُسْفِرَةٌ		ضَاحِكَةٌ	مُسْتَبْشِرَةٌ		وَوُجُوهٌ

সেদিন	ধূলি-ধূসর হবে।	৪১	সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে	কালিমা।	৪২	তারাই হলো
يَوْمَئِذٍ	عَلَيْهَا غَبَرَةٌ		تَرْهَقُهَا	قَتَرَةٌ		أُولَئِكَ هُمُ

পাপাচারী কাফির।	
الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ	

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

অতঃপর যখন কিয়ামতের দ্বিতীয় ফুঁৎকারে বিকট আওয়াজ আসবে, যা মানুষের শ্রবনশক্তিকে বিকল করে দিবে, তখন মানুষ তার ভাই-বোন, পিতা-মাতা, স্ত্রী-পরিজন এবং সন্তান-সন্তুতি থেকে পলায়ন করবে। প্রত্যেককেই তার গুরুতর অবস্থা নিজেকে নিয়ে ব্যাতিব্যস্ত রাখবে। বহু মুখ সেদিন আল্লাহর নেয়ামত পেয়ে উজ্জ্বল, সহাস্য এবং প্রফুল্ল থাকবে। পক্ষান্তরে বহু চেহারা সেদিন ধূলি-ধূসর হবে। মূলত লাঞ্ছনা এবং আল্লাহর ক্রোধ তাদের মুখমন্ডলকে আচ্ছন্ন করবে। তারাই পাপাচারী কাফির, যারা দুনিয়াতে আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করতো এবং তাঁর আয়াতাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো। (*আইসার আল-তাফাসীর: ৫/৫২১-৫২২, আল-মোন্তাখাব: ৮৮৬, আল-মোয়াস্সার: ১/৫৮৫-৫৮৬*)।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:
﴿الصَّاخَّةُ﴾ ‘বিকট আওয়ায’, এমন প্রচন্ড আওয়াযকে বলা হয়, যা শ্রবণশক্তিকে বিকল করে দেয় এবং অন্তরকে ভীতসন্ত্রস্ত করে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সিংগার দ্বিতীয় ফুঁৎকার, অথবা কিয়ামতের দিন। (*গরীব আল-কোরআন*, ইবনু কুতাইবাহ: ৪৪০, *আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫২১, *তাফসীর গরীব আল-কোরআন*, আল-কাওয়ারী: ৮০/৩৩)।
﴿صَاحِبَتِهِ﴾ ‘তার সাথী’, অত্র আয়াতাংশে ‘সাথী’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ‘স্ত্রী’। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫২১) ।

অত্র আয়াতাবলীর সাথে পূর্ববতী আয়াতাবলীর সম্পর্ক:
পূর্ববতী আয়াতাবলী তথা (২৪-৩২) নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার জীবনে মানুষের বসবাস এবং তাদের প্রতি তাঁর নেয়ামতের বর্ণনা দিয়েছেন। আর অত্র আয়াতাবলী তথা (৩৩-৪২) নাম্বার আয়াতে আখেরাতে মানুষের বসবাস এবং তাদের এক দলের প্রতি তাঁর নেয়ামত ও আরেক দলের প্রতি তাঁর ক্রোধের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন, যাতে তারা সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ প্রদত্ব ধন-সম্পদ থেকে তাঁর পথে ব্যয় করে। (*আল-কুরতুবী*: ১৯/২২৪) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:
১। অত্র সূরার (৩৩-৩৭) আয়াত থেকে বুঝা যায় কিয়ামতের প্রচন্ড ভয়াবহতা এবং নিজেদের অতিরিক্ত পেরেশানির কারণে মানুষের অবস্থা এমন হবে যে, পিতা সন্তান থেকে, স্বামী তার স্ত্রী থেকে, সন্তান তার মা থেকে এবং ভাই তার ভাই থেকে পলায়ন করবে। একই অর্থে বর্ণনা এসেছে সূরা মায়ারেয এর (১১-১৪) নাম্বার আয়াতে। ঐ সময়টা এমন ভয়াবহ হবে যে কেউ কাউকে চিনবে না এবং কেউ কারো দিকে তাকানোর সুযোগটুকু পাবে না। আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قَالَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ" (صحيح مسلم: ٢٨٥٩).
অর্থাৎ: “কিয়ামতের দিন মানুষকে খালি পায়ে ও উলঙ্গ অবস্থায় একত্রিত করা হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে আল্লাহর রাসূল! এমন হলে তো নারী-পুরুষ সবাই একে অপরের দিকে তাকাবে। তখন আল্লাহর রাসূল উত্তর দিলেন: কিয়ামতের ভয়াবহতা এবং পেরেশানি এতই মারাত্মক হবে যে একে অপরের দিকে তাকানোর হুশ থাকবে না” (*সহীহ মুসলিম*: ২৮৫৯) ।
২। অত্র সূরার (৩৮-৪২) আয়াত থেকে বুঝা যায় কিয়ামতের দিন মানুষ দুইটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে: (ক) আল্লাহর নেয়ামত পাওয়ার কারণে এক দল মানুষের চেহারা হস্যোজ্জ্বল হবে এবং (খ) লাঞ্চনা ও আল্লাহর ক্রোধে পতিত হওয়ার কারণে আরেক দলের চেহারা মলিন হয়ে যাবে। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/৭৮) ।

আয়াতাবলীর আমল:
কিয়ামতের ভয়াবহতার কথা স্মরণ রেখে আখেরাত ভিত্তিক জীবনযাপন করা।

(سُورَةُ التَّكْوِيْرِ)

সূরা আল-তাকভীর এর পরিচয়:

সূরার নাম:

ইবনু আশুর (র.) অত্র সূরার তিনটি নাম উল্লেখ করেছেন:

(ক) 'সূরা আল-তাকভীর', সূরাটি এ নামে পরিচিত, অধিকাংশ তাফসীরগ্রন্থ এবং মুসহাফে এ নামটি উল্লেখ করা হয়েছে।

(খ) 'সূরাতু ইজাস সামছু কুভ্ভিরাত', ইমাম বুখারী ও ইমাম তিরমিযী (র.) তাদের হাদীস গ্রন্থে অত্র নামটি দিয়ে শিরোনাম করেছেন। এছাড়াও আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এ নামটি পাওয়া যায়, হাদীসটি অত্র সূরার ফযিলতে আসবে।

(গ) "সূরাতু কুভ্ভিরাত", শব্দটি সূরায় থাকার কারণে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

অত্র সূরার একাধিক নাম পাওয়া গেলেও ইমাম সুয়ূতী (র.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল ইতক্বান' এ সূরাটি একাধিক নাম যুক্ত সূরার নামের তালিকায় উল্লেখ করেননি। (*আল-তাহরীর ওয়া আল-তানভীর*, ইবনু আশুর: ৩০/১৩৯) ।

আলোচ্যবিষয়: আখেরাতের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে সত্য দ্বীনের উপর অটল থাকা।

সূরার ফযিলত:

(ক) অত্র সূরা তেলাওয়াতকারী কিয়ামতের দিন শংকামুক্ত থাকবে। যেমন: আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ" (الترمذي: ٣٣٣٣).

অর্থাৎ: "যে ব্যক্তি কিয়ামতকে স্বচক্ষে দেখে খুশী থাকতে চায়, সে যেন সূরা তাকভীর, সূরা ইনফিতার এবং সূরা ইনশেক্বাক্ব পাঠ করে" (*সুনান আল-তিরমিযী*: ৩৩৩৩) । ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন: হাদীসটি একটি সনদে বর্ণিত হয়েছে, হাদীসের হুকুম 'হাসান'। শায়খ আলবানী (র.) হাদীসটিকে 'সহীহ' বলেছেন।

(খ) অত্র সূরাটি মুফাস্সালাত এর অন্তভূক্ত, আর মুফাস্সালাত সূরাগুলোকে কোরআনের অন্তর বলা হয়। যেমন: ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন:

(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].

অর্থাৎ: "প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, আর কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্সাল সূরাগুলো"।

(*সুনানে দারিমী*, ৩৪২০) ।

আরো একটি হাদীসে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে মুফাস্সালাত সূরাগুলো ইতিপূর্বে কোন নবী-রাসূলকে প্রদান করা হয়নি। যেমন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةِ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].

অর্থাৎ: “আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিষিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিষিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি”। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪)।

হাদীসে মুফাস্সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ৮১তম সূরা।

অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ষষ্ঠ সূরা, যা ‘সূরা মাসাদ’ এর পরে এবং ‘সূরা আ’লা’ এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

অবতীর্ণের স্থান: সকল তাফসীরকারক একমত যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, সতরাং তা সূরা মাক্কিয়্যাহ। (*বিতাকাত আল-তারীফ*, ২৮৩)।

আয়াত সংখ্যা: ২৯টি।

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: এ সূরাটির একটি অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট পাওয়া যায়, যা যথাস্থানে আসবে ইনশাআল্লাহ।

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (١) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (٢) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (٣) وَإِذَا الْعِشَارُ
عُطِّلَتْ (٤) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (٥) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (٦) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (٧)
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (٩) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (١٠) وَإِذَا السَّمَاءُ
كُشِطَتْ (١١) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (١٢) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (١٣) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا
أَحْضَرَتْ (١٤)﴾ [سورة التكوير : ١-١٤].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়:

কিয়ামতের দিন প্রত্যেকে তার কৃতকর্ম নিয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১	যখন	সূর্যকে	গুটিয়ে ফেলা হবে,	২	আর যখন	নক্ষত্ররাজি	পতিত হবে,	৩
	إِذَا	الشَّمْسُ	كُوِّرَتْ		وَإِذَا	النُّجُومُ	انْكَدَرَتْ	

আর যখন	পর্বতমালাকে	সরিয়ে দেওয়া হবে,	৪	আর যখন	দশ মাসের উটনীগুলো
وَإِذَا	الْجِبَالُ	سُيِّرَتْ		وَإِذَا	الْعِشَارُ

উপেক্ষিত হবে,	৫	আর যখন	বন্য পশুগুলোকে	একত্র করা হবে,	৬	আর যখন
عُطِّلَتْ		وَإِذَا	الْوُحُوشُ	حُشِرَتْ		وَإِذَا

সমুদ্রগুলোকে	অগ্নিউত্তাল করা হবে,	৭	আর যখন	আত্মাসমূহকে	পুনঃসংযোজিত করা হবে,
الْبِحَارُ	سُجِّرَتْ		وَإِذَا	النُّفُوسُ	زُوِّجَتْ

৮	আর যখন	জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে	জিজ্ঞাসা করা হবে	৯	কোন অপরাধের কারণে
	وَإِذَا	الْمَوْءُودَةُ	سُئِلَتْ		بِأَيِّ ذَنْبٍ

তাকে হত্যা করা হয়েছে?	১০	আর যখন	আমলনামাগুলো	প্রকাশ করে দেওয়া হবে,	১১
قُتِلَتْ		وَإِذَا	الصُّحُفُ	نُشِرَتْ	

আর যখন	আকাশ	খুলে দেওয়া হবে,	১২	আর যখন	জাহান্নামকে	প্রজ্বলিত করা হবে,
وَإِذَا	السَّمَاءُ	كُشِطَتْ		وَإِذَا	الْجَحِيمُ	سُعِّرَتْ

১৩	এবং যখন	জান্নাতকে	নিকটবর্তী করা হবে,	১৪	তখন প্রত্যেকেই জানতে পারবে
	وَإِذَا	الْجَنَّةُ	أُزْلِفَتْ		عَلِمَتْ نَفْسٌ

সে (আল্লাহর কাছে তার কৃতকর্ম থেকে) যা উপস্থিত করেছে।	
مَا أَحْضَرَتْ	

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

যখন সূর্যকে গুটিয়ে ফেলে তার কিরণকে নিঃশেষ করে দেওয়া হবে, আকাশ থেকে নক্ষত্ররাজিকে নিক্ষেপ করা হবে, পৃথিবী থেকে পর্বতমালাকে সরিয়ে ফেলে ধুনিত তুলার ন্যায় উড়িয়ে দেওয়া হবে, দশ মাস বয়সী গর্ভবতী মূল্যবান উটনীগুলো মালিক থেকে উপেক্ষিত হবে, বন্য পশুগুলোকে একত্র করে তাদেরকে কিসাস নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে, সমুদ্রগুলোকে অগ্নিউত্তাল করা হবে, আত্মাসমূহকে স্ব-স্ব দেহের সাথে পুণঃসংযোজিত করা হবে, জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে কোন অপরাধের কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে? ও হত্যাকারীকে ভৎসনা করা হবে, আমলনামাগুলোকে প্রকাশ করে দেওয়া হবে, আকাশ ভেঞ্জে ফেলা হবে, জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হবে এবং জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে, তখন প্রত্যেকেই তাদের ভালো-মন্দ আমলনামা সম্পর্কে অবগত হতে পারবে। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/৮২-৮৪, *আল-তাফসীর আল-মোয়াস্‌সার:* ১/৫৮৬) ।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الْعِشَارُ﴾ 'দশ মাস বয়সী গাভীন উট', 'আল-ইশার' শব্দটি আরবী, যা 'আল-উশারা' এর বহুবচন। অর্থাৎ: এমন গর্ভবতী উট যার দশ মাস পূর্ণ হয়ে গেছে। এ ধরণের উট আরববাসীদের কাছে খুব প্রিয় এবং মূল্যবান ছিল। এটাকে এখানে উল্লেখের বিশেষ কারণ হলো: যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন কারো কাছে এমন ধরণের মূল্যবান উট থকলেও সে কিয়ামতের ভয়াবহতার কারণে তার কথা ভুলে যাবে। (*আহসানুল বায়ান*: ১০৬২) ।

﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ 'আর যখন প্রানীসমূহ একত্র করা হবে', আয়াতের দুইটি অর্থ পাওয়া যায়:

(ক) সিংগায় প্রথম ফুৎকারের পর জল-স্থল ভাগের সকল প্রানী ভয়ে একত্র হবে, অতঃপর সকল প্রানী মারা যাবে, তারা হাশরের ময়দানে আর পুনর্জীবিত হবে না।

(খ) সিংগায় দ্বিতীয় ফুৎকারের পর সকল প্রানীকে একে অপরের থেকে কিসাস গ্রহণের জন্য একত্র করা হবে। (*আল-বাহ্‌র আল-মুহীত*: ১০/৪১৫) ।

তবে অধিকাংশ তাফসীরকারক দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করেছেন। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/৮৫)।

অত্র সূরার সাথে পূর্ব ও পরের সূরার সম্পর্ক:

অত্র সূরা তথা সূরা 'তাবভীর', তার পূর্বের সূরা 'আবাসা' এবং এর পরবর্তী দুইটি সূরা 'ইনফিতার' এবং 'মুতাফফিফীন' এর মধ্যে সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের মতো। কিয়ামতের দুইটি অংশ, প্রথমাংশে সিংগার প্রথম ফূঁকে এক প্রচন্ড ভূমিকম্পের মাধ্যমে সবকিছু ধ্বংস হয়ে হাশরের ময়দান সৃষ্টি হবে এবং দ্বিতীয়াংশে সিংগার দ্বিতীয় ফূঁকে সকল প্রাণী উত্থিত হয়ে বিচারের অপেক্ষায় হাশরের ময়দানে আল্লাহর সামনে দাড়িয়ে যাবে। অত্র চারটি সূরাতেই কিয়ামতের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অত্র সূরা তথা 'তাকভীর' সহ তার পূর্ববর্তী সূরা 'আবাসা' ও পরবর্তী সূরা 'ইনফিতার' এ কিয়ামতের প্রাথমিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। আর সূরা 'মুতাফফিফীন' এ কিয়ামতের দ্বিতীয় অবস্থা তুলে ধরে হয়েছে। সুতরাং পূর্ববতী সূরা এবং

পরবর্তী দুইটি সূরার সাথে অত্র সূরার সম্পর্ক হলো একে অপরের জন্য সম্পূরক। (*তানাসুক্ব আল-দুরার ফি তানাসুব আল-সুয়ার*, সয়ূতী: ১৫৮) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। পুনরুত্থান ও হিসাব দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য তাগীদ রয়েছে। অত্র সূরায় দেখতে পাই আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের ভয়াবহতার বর্ণনা দিয়ে যত সূরা শুরু করেছেন, তার সকল বর্ণনাকে এখানে একত্র করা হয়েছে। কিয়ামতের ১২টি ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা দিয়ে অত্র সূরার মূল বিষয়ের আলোচনা শুরু করেছেন। (আইসার আল-তাফাসীর: ৫/৫২৫) ।

২। অত্র সূরার (১-১৪) নাম্বার আয়াতে কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার ১২টি ভয়াবহ ঘটনা বর্ণনা করে একটি চিরন্তন সত্যকে তুলে ধরেছেন। এ ঘটনাসমূহের মধ্যে প্রথম ছয়টি সিঙ্গায় প্রথম ফুৎকারের পর বিশ্ব ধংস হওয়ার সাথে সম্পর্কিত এবং পরের ছয়টি সিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকারের পর হাশরের ময়দান সংগঠিত হওয়ার সাথে সম্পর্কিত। বিশ্ব ধংস হওয়ার সাথে সম্পর্কিত ছয়টি ভয়াবহ বিষয় হলো:

(ক) সূর্যকে গুটিয়ে ফেলে তার কিরণকে নিঃশেষ করে দেওয়া হবে।
(খ) আকাশ থেকে নক্ষত্ররাজিকে নিক্ষেপ করা হবে।
(গ) পৃথিবী থেকে পর্বতমালাকে সরিয়ে ফেলে ধূনিত তুলার ন্যায় উড়িয়ে দেওয়া হবে।
(ঘ) পশুগুলোকে একত্র করা হবে।
(ঙ) দশ মাস বয়সী গর্ভবতী মূল্যবান উটনীগুলো মালিক থেকে উপেক্ষিত হবে।
(চ) সমুদ্রগুলোকে অগ্নিউত্তাল করা হবে।

এবং হাশরের ময়দান সংগঠিত হওয়ার সাথে সম্পর্কিত ছয়টি বিষয় হলো:

(ক) আত্মাসমূহকে স্ব-স্ব দেহের সাথে পুণঃসংযোজিত করা হবে।
(খ) জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তাকে কেন হত্যা করা হয়েছে?
(গ) আমলনামাগুলোকে প্রকাশ করে দেওয়া হবে।
(ঘ) আকাশ ভেঙ্গে ফেলা হবে।
(ঙ) জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হবে।
(চ) জান্নাতকে মুমিনদের নিকটবর্তী করা হবে।

চৌদ্দ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে উল্লেখিত ঘটনাগুলো যখন পুরোপুরি সংগঠিত হবে, তখনই প্রত্যেকে হাশরের ময়দানে তাদের ভালো-মন্দ আমলনামা সম্পর্কে জানতে পারবে। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫২৪-৫২৫) ।

৩। অত্র সূরার (১-১৪) নাম্বার আয়াতকে আরবী ভাষায় 'জুমলাহ শর্তিয়্যাহ' বা 'শর্তযুক্ত বাক্য' বলে। এ ধরণের বাক্যে দুইটি অংশ থাকে: (ক) 'শর্ত': (১-১৩) নাম্বার আয়াত হলো 'শর্ত' এবং (খ) 'শর্তের জবাব': চৌদ্দ নাম্বার আয়াতটি হলো: 'শর্তের জবাব'। 'শর্ত বাক্য' এর নিয়ম হলো: দ্বিতীয় অংশটি বাস্তবায়ন হওয়ার জন্য প্রথম অংশ বাস্তবায়ন হওয়া শর্ত। সুতরাং বুঝা যায় উল্লেখিত ভয়াবহ ১২টি ঘটনা সংগঠিত হওয়ার মাধ্যমে হাশরের ময়দান রচিত হবে এবং সেখানে প্রত্যেকে তাদের ভালো-মন্দ কর্মের সাক্ষাত পাবে। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

আয়াতাবলীর আমল:

(ক) আখেরাত ভিত্তিক জীবন-যাপন করা।

(খ) অবসর সময়ে সূরা ‘তাবভীর’ পাঠ করা; কারণ তা পাঠককে হাশরের ময়দানে পেরেশানি থেকে মুক্ত রাখবে।

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (١٥) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (١٦) وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (١٧) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (١٨)
إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (١٩) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (٢٠) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (٢١) وَمَا صَاحِبُكُمْ
بِمَجْنُونٍ (٢٢) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ (٢٣) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (٢٤) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ
رَجِيمٍ (٢٥) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (٢٦) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٢٧) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا
تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٩)﴾ [سورة التكوير : ١٥–٢٩].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়: কোরআন আল্লাহর অহী ও সৎপথ প্রদর্শনকারী হওয়ার প্রমাণ।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১৫	আমি শপথ করছি	প্রত্যাবর্তনকারী নক্ষত্রের।	১৬	যা চলমান হয়ে	অদৃশ্য হয়ে যায়।		
	فَلَا أُقْسِمُ	بِالْخُنَّسِ		الْجَوَارِ	الْكُنَّسِ		
১৭	শপথ রাতের	যখন	তা বিদায় নেয়।	১৮	শপথ প্রভাতের	যখন	তা আগমণ করে।
	وَاللَّيْلِ	إِذَا	عَسْعَسَ		وَالصُّبْحِ	إِذَا	تَنَفَّسَ
১৯	নিশ্চয় তা (কোরআন)	আনীত বাণী	সম্মানিত বার্তবাহকের।	২০	যিনি শক্তিধর,		
	إِنَّهُ	لَقَوْلُ	رَسُولٍ كَرِيمٍ		ذِي قُوَّةٍ		
আরশের মালিকের নিকট	মর্যাদাসম্পন্ন।	২১	সেখানে সে (জিবরীল) মান্যবর,	আস্থাভাজন।			
عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ	مَكِينٍ		مُطَاعٍ ثَمَّ	أَمِينٍ			
২২	আর তোমাদের সাথী (মোহাম্মদ)	পাগল নয়।	২৩	নিশ্চয় সে(মোহাম্মদ) তাকে(জিবরীল) দেখেছে			
	وَمَا صَاحِبُكُمْ	بِمَجْنُونٍ		وَلَقَدْ رَآهُ			
স্পষ্ট দিগন্তে।	২৪	সে (মোহাম্মদ) নয়	অদৃশ্য জগতের (বাণী পৌঁছানোর) ব্যাপারে	কৃপণ।			
بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ		وَمَا هُوَ	عَلَى الْغَيْبِ	بِضَنِينٍ			
২৫	আর তা বাণী নয়	কোন অভিশপ্ত শয়তানের।	২৬	সুতরাং তোমরা কোথায় যাচ্ছো?			
	وَمَا هُوَ بِقَوْلِ	شَيْطَانٍ رَجِيمٍ		فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ			
২৭	এটাতো শুধুমাত্র উপদেশ	জগৎসমূহের জন্য।	২৮	তার জন্য, যে চায় তোমাদের মধ্য থেকে			
	إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ	لِلْعَالَمِينَ		لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ			
সরল পথে চলতে।	২৯	তোমরা কিছুই ইচ্ছা করতে পারো না	আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত,				
أَنْ يَسْتَقِيمَ		وَمَا تَشَاءُونَ	إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ				
যিনি জগৎসমূহের রব (প্রতিপালক)।							
رَبُّ الْعَالَمِينَ							

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

কোরআনের সত্যতা প্রমাণের জন্য তিনটি বিস্ময়কর বস্তু (ক) নক্ষত্ররাজি, যা দিনের বেলায় অদৃশ্যে চলে যায়, (খ) রাতের শেষভাগ, এবং (গ) আলোকোজ্জ্বল প্রভাত এর শপথ করে বলা হয়েছে: সম্মানিত বার্তাবাহক জিবরীল (আ.) আল্লাহ তায়ালা থেকে কোরআন বহণ করে নিয়ে মোহাম্মদ (সা.) এর কাছে এসেছেন। বার্তাবাহক জিবরীল (আ.) এর নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কেউ যেন প্রশ্ন তুলতে না পারে, সেজন্য আল্লাহ তায়ালা তার চারটি গুণ বর্ণনা করেছেন:

(ক) আল্লাহর কাছে সম্মানিত।
(খ) নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে খুবই সচেষ্ট।
(গ) আরশের মালিক আল্লাহ তায়ালার নিকট মর্যাদাপ্রাপ্ত।
(ঘ) ফেরেশতাবর্গের সর্দার এবং মান্যবর।
(ঙ) অহী বহণ করে আনার ব্যাপারে আমানতদার।

অতঃপর কোরআনের প্রচারক মোহাম্মদ (সা.) এর সুস্থতা, বিশ্বস্ততা এবং যোগ্যতার ব্যাপারে কেউ যেন সন্দেহ করতে না পারে, সেজন্য আল্লাহ তায়ালা তার চারটি গুণ বর্ণনা করেছেন:

(ক) মোহাম্মদ (সা.) অসুস্থ ও পাগল ছিলেন না।
(খ) তিনি জিবরীল (আ.) এর সাথে সাক্ষাত করে সরাসরি অহি গ্রহণ করেছেন।
(গ) তিনি কোরআন প্রচারের কাজে অলসত ও কার্পণ্য করেন নি।
(ঘ) তিনি বিতারিত শয়তান থেকে কোন উক্তি গ্রহণ করেন নি।

কোরআনের সত্যতার প্রমাণ পেশ করার পর আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, উল্লেখিত প্রমাণের মাধ্যমে কোরআন আল্লাহর বাণী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান পাওয়ার পরে মানুষের উচিৎ একমাত্র কোরআনকেই জীবনের গাইডেন্স হিসেবে গ্রহণ করা; কারণ কোরআন হলো জগৎসমূহের জন্য একমাত্র হেদায়েতের পথ। আর হেদায়েত পাওয়ার জন্য তাকে স্বেচ্ছায় আগ্রহভরে এগিয়ে আসতে হবে এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাওফীক প্রদান করা না হলে কেউ কোরআনের হেদায়েত পাওয়ার জন্য আগ্রহী হবে না। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫২৭, *তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/৮৯-৯০, *আল-মোন্তাখাব: ৮৮৮*, *আল-তাফসীর আল-মোয়াস্সার: ১/৫৮৬*) ।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الْخُنَّسِ﴾ 'প্রত্যাবর্তনকারী নক্ষত্ররাজি', অত্র আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে কয়েকটি মত পাওয়া যায়:

(ক) এর দ্বারা পাঁচটি বৃহদাকার নক্ষত্রকে কে বুঝানো হয়েছে: (ক) শনি, (খ) বৃহস্পতি, (গ) মঙ্গল, (ঘ) শুক্র এবং (ঙ) বুধগ্রহ। (*গরীব আল-কোরআন*, ইবনু কুতাইবাহ: ৪৪২) ।

(খ) অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে, সমস্ত নক্ষত্রকে বুঝানো হয়েছে, কারণ সমস্ত নক্ষত্রই তার গতিপথে একপর্যায় পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয় কিংবা দিনের বেলায় গোপন থাকে। (*আহসান আল-বায়ান*, সালাউদ্দীন ইউসুফ: ১০৬৩) ।

ইমাম ওয়াহাবা আল-জুহাইলী (র.) বলেন: দ্বিতীয় মতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। (*তাফসীর আল-মুনীর*: (৩০/৮৭) ।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾ 'শপথ রাতের যখন তা বিদায় নেয়', আয়াতের দুইটি অর্থ পাওয়া যায়:
(ক) আবু উবয়দা (র.) বলেন: আয়াতের অর্থ হলো: শপথ রাতের যখন তা আগমন করে।
(খ) অন্যান্য তাফসীরকারক বলেন: শপথ রাতের যখন তা বিদায় নেয়। (*গরীব আল-কোরআন*, ইবনু কুতাইবাহ: ৪৪২) ।
তবে ইমাম জাযায়িরী (র.) বলেন: অত্র আয়াতে দুইটি অর্থই প্রযোজ্য। সুতরাং তার মতে, আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়: শপথ রাতের যখন তা আগমন ও বিদায় গ্রহণ করে। (*আইসার আল-তাফসীর*, আল-জাযায়িরী: ৫/৫২৬) । অধিকাংশ তাফসীর গ্রন্থে দেখা যায় ইমাম জাযায়িরী (র.) এর মতটি উল্লেখ করেছেন।
﴿رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ 'সম্মানিত রাসূল', অধিকাংশ তাফসীকারকের মতে, অত্র আয়াতাংশ দ্বারা 'জিবরীল (আ.)' কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। (*আল-কুরতুবী*: ১৯/২৪০, *আলুসী*: ১৫/২৬৫) ।
﴿صَاحِبُكُمْ﴾ 'তোমাদের সাথী', সকল তাফসীরকারকের মতে, অত্র আয়াতাংশ দ্বারা 'মোহাম্মদ (সা.) কে বোঝানো হয়েছে। (*তাফসীর আল-নাসাফী*: ৩/৬০৮) ।
﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾ 'সুতরাং কোথায় যাচ্ছো তোমরা?', সকল তাফসীরকারক এক মত যে, অত্র আয়াতে 'তোমরা' দ্বারা সকল মানবজাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। (*তাফসীর ইবনু কাসীর*: ৮/৩৪০) ।

অত্র আয়াতাবলীর সাথে পূর্ববতী আয়াতাবলীর সম্পর্ক:

পূর্বের আয়াতাবলী তথা (১-১৪) নাম্বার আয়াতে পুনরুত্থান দিবস এবং হাশরের ময়দান সত্য এ কথা প্রমান করা হয়েছে। আর উল্লেখিত আয়াতাবলীতে যেই কোরআন হাশরের ময়দানের সত্যতার ব্যাপারে কথা বলেছে সেই কোরআন যে কোন মানুষের রচিত নয়, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরীল (আ.) এর মাধ্যমে মোহাম্মদ (সা.) এর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রমাণ উল্লেখ করার পাশাপাশি মানবতার উপর কর্তব্য হলো কেবল কোরআনকেই গাইডেন্স হিসেবে গ্রহণ করা বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫২৭) ।

উনত্রিশ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

ইবনু আবি হাতিম (র.) থেকে বর্ণিত আছে, আবু হুরাইরা (রা.) বলেন: অত্র সূরার আটাশ নাম্বার অবতীর্ণ হলে আবু জাহল বলতে লাগলো হেদায়েতের পথ গ্রহণ করা বা না করা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যদি চাই হেদায়েত গ্রহণ করবো, অথবা গ্রহণ করবো না এ জন্য কোন শাস্তি পেতে হবে না। আবু জাহলের এ বিকৃত মন্তব্যের উত্তরে আল্লাহ তায়ালা উনত্রিশ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করে জানিয়ে দিলেন তোমাদের ইচ্ছার উপর কোন কিছু নির্ভর করে না, বরং আল্লাহর ইচ্ছাই হলো চূড়ান্ত সমাধান। (*লুবাব আল-নুকূল*, সুয়ূতী: ৩৫৪) ।

আয়াতের কসমের ব্যাখ্যা:

মানুষের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা জায়েজ নেই। আর আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে ধরাবাধা কোন নিয়ম নেই। তবে সাধারণত তিনি যে বিষয়ে কথা বলতে চান তার সাথে সম্পর্কিত কোন বস্তুর কসম করেন। অত্র সূরার (১৫–১৮) আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নক্ষত্র, রাত্র এবং প্রভাতের কসম করে উনিশ নাম্বার আয়াতে বলেছেন: "নিশ্চয় সম্মানিত বার্তাবাহক জিবরীল (আ.) আল্লাহ তায়ালা থেকে কোরআন বহণ করে নিয়ে মোহাম্মদ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ করেছেন"। উল্লেখ্য যে, একটি কসম বাক্যের তিনটি অংশ থাকে: (ক) হরফে কসম, (খ) কসম বা যে জিনিসের কসম করা হয় এবং (গ) জাওয়াবে কসম বা কসমের পর যা বলা হয়। অত্র সূরায় কসমের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

- হরফে কসম: ফালা উকসিমু (আরবী শব্দ), অর্থাৎ: আমি কসম করছি।
- কসম: নক্ষত্র, রাত্র এবং প্রভাত।
- জাওয়াবে কসম: "নিশ্চয় সম্মানিত বার্তাবাহক জিবরীল (আ.) আল্লাহ তায়ালা থেকে কোরআন বহণ করে নিয়ে মোহাম্মদ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ করেছেন" (*তিবইয়ান ফি আকসাম আল-কোরআন*, ইবনু জাওজিয়্যাহ: ৭২–৭৫) ।

এখানে কসম এবং জাওয়াবে কসমের মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট; কারণ নক্ষত্ররাজি, রাত এবং দিনের ঘূর্ণায়নে এ মহাবিশ্ব এক মহাগন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলছে আর কোরআন শান্তির পয়গাম ছড়িয়ে দিচ্ছে। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। উল্লেখিত আয়াতাবলীতে আল্লাহ তায়ালা চারটি বিষয়কে ফোকাস করেছেন:

(ক) অত্র সূরার (১৫–১৮) নাম্বার আয়াতে নক্ষত্ররাজি, রাত এবং প্রভাতের শপথ করা হয়েছে।

(খ) উনিশ নাম্বার আয়াত উল্লেখিত কসমের জাওয়াবে কসম, যেখানে বলা হয়েছে: সম্মানিত বার্তাবাহক জিবরীল (আ.) আল্লাহ তায়ালা থেকে কোরআন বহণ করে নিয়ে মোহাম্মদ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ করেছেন।

(গ) (২০–২১) নাম্বার আয়াতে, বার্তাবাহক জিবরীল (আ.) এর নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কেউ যেন প্রশ্ন তুলতে না পারে, সেজন্য আল্লাহ তায়ালা তার চারটি গুণ বর্ণনা করেছেন: (ক) তিনি আল্লাহর কাছে সম্মানিত, (খ) নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে খুবই সচেষ্ট, (গ) আরশের মালিক আল্লাহ তায়ালার নিকট মর্যাদাপ্রাপ্ত, (ঘ) ফেরেশতাবর্গের সর্দার ও মান্যবর এবং (ঙ) অহী বহণ করে আনার ব্যাপারে আমানতদার।

(ঘ) (২২–২৫) নাম্বার আয়াতে কোরআনের প্রচারক মোহাম্মদ (সা.) এর সুস্থতা, বিশ্বস্ততা, যোগ্যতা এবং যোগসূত্রের ব্যাপারে কেউ যেন সন্দেহ পোষণ করতে না পারে, সেজন্য আল্লাহ তায়ালা তার চারটি গুণ বর্ণনা করেছেন: (ক) মোহাম্মদ (সা.) অসুস্থ ও পাগল ছিলেন না।, (খ) তিনি জিবরীল (আ.) এর সাথে সাক্ষাত করে সরাসরি অহি গ্রহণ করেছেন, (গ) তিনি কোরআন প্রচারের কাজে অলসতা ও কার্পণ্য করেন নি এবং (ঘ) তিনি বিতাড়িত শয়তান থেকে কোন উক্তি গ্রহণ করেন নি।

(ঙ) (২৬-২৯) নাম্বার আয়াতে মানবজাতিকে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, উল্লেখিত প্রমাণের মাধ্যমে কোরআন আল্লাহর বাণী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান পাওয়ার পরে মানুষের উচিৎ একমাত্র কোরআনকেই জীবনের গাইডেন্স হিসেবে গ্রহণ করা; কারণ কোরআন হলো জগৎসমূহের জন্য একমাত্র হেদায়েতের পথ। আর হেদায়েত পাওয়ার জন্য তাকে স্বেচ্ছায় আগ্রহভরে এগিয়ে আসতে হবে এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাওফীক কামনা করতে হবে। (*তাফসীর আল-মাওজুয়ী*: ১০/৫৩-৫৪, *তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/৮৯-৯০) ।

২। অত্র সূরার (২৯-২৫) আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং কোরআন সম্পর্কে মক্কার কাফের-মুশরিকদের মিথ্যাচারিতার জবাব দেওয়ার মাধ্যমে মোহাম্মদ (সা.) কে শান্তনা দিয়েছেন। তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে পাগল এবং কোরআনকে বানোয়াট কথাবার্তা বলে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতো। আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াতাবলীর মাধ্যমে ছাপ জানিয়ে দিয়েছেন মোহাম্মদ (সা.) পাগল নয়, বরং মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং কোরআন মানুষ বা শয়তানের কোন বানোয়াট গল্পকাহিনী নয়, বরং তা মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে জিবরীল (আ.) এর মাধ্যমে আনীত রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ হওয়া বাণী যা সকল মানবজাতির জন্য জীবনবিধান। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/৯০) ।

৩। অত্র সূরার (২৭-২৯) নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানব জীবনকে সুন্দর করার জন্য একটি ফর্মূলা দিয়েছেন, ফর্মূলাটি হলো:

প্রথমত:

কোরআনকে জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করার জন্য আল্লাহর কাছে তাওফীক কামনা করা; কারণ আল্লাহ প্রদত্ব তাওফীক ছাড়া কারো পক্ষে হেদায়েত পাওয়া সম্ভব না।

দ্বিতীয়ত:

কোরআনকে জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করতে সংকল্পবদ্ধ হওয়া।

তৃতীয়ত:

জীবনকে ভারসাম্যপূর্ণ ও সুখময় করতে কোরআনকে জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করা।

এখান থেকে বুঝা যায়, কোন কাজের ইচ্ছা পোষণের পূর্বে আল্লাহর সাথে একান্তে মোনাজাত করে তাঁর থেকে তাওফীক প্রার্থণা করা। অতঃপর সেটার জন্য সংকল্পবদ্ধ হওয়া। অবশেষে বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

আয়াতাবলীর আমল:

(ক) "কোরআন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া মানবতার একমাত্র জীবনবিধান" এ কথা মনেপ্রানে বিশ্বাস করা।

(খ) কোরআন থেকে হেদায়েত পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থণা করা।

(গ) যে কোন কাজ করার পূর্বে একান্তে আল্লাহ তায়ালার সাথে 'মোনাজাত' করা।

(سُورة الانْفِطَار)

সূরা আল-ইনফিতার এর পরিচয়:

সূরার নাম: অত্র সূরার চারটি নাম পাওয়া যায়:
(ক) ‘সূরা আল-ইনফিতার’, সূরাটি এ নামে পরিচিত, অধিকাংশ তাফসীরগ্রন্থ এবং মুসহাফে এ নামটি উল্লেখ করা হয়েছে।
(খ) “সূরাতু ইজাস সামাউন ফাতারত”, ইমাম বুখারী (র.) তার সহীহ গ্রন্থের তাফসীর অধ্যায়ে এ নামে শিরোনাম করেছেন। (*সহীহ আল-বুখারী*: ৬/১৬৭) ।
(গ) ‘সূরাতু ইনফতারাত’, কিছু কিছু তাফসীর গ্রন্থে এ নামটি উল্লেখ করা হয়েছে।
(ঘ) কোন কোন তাফসীরকারক বলেন: অত্র সূরার নাম হলো: ‘আল-মুনফাতিরাহ’।
অত্র সূরার অনেকগুলো নাম পাওয়া গেলেও ইমাম সুয়ূতী (র.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘আল ইতক্বান’ এ সূরাটি একাধিক নাম যুক্ত সূরার নামের তালিকায় উল্লেখ করেননি। (*আল-তাহরীর ওয়া আল-তানভীর*, ইবনু আশুর: ৩০/১৬৯) ।

আলোচ্যবিষয়: সৎআমলের মাধ্যমে বিচার দিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আহবান।

সূরার ফযিলত:
(ক) অত্র সূরা তেলাওয়াতকারী কিয়ামতের দিন শংকামুক্ত থাকবে। যেমন: আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ" (الترمذي: ٣٣٣٣).
অর্থাৎ: “যে ব্যক্তি কিয়ামতকে স্বচক্ষে দেখে খুশী থাকতে চায়, সে যেন সূরা তাকভীর, সূরা ইনফিতার এবং সূরা ইনশেক্বাক্ব পাঠ করে” (*সুনান আল-তিরমিযী*: ৩৩৩৩) । ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন: হাদীসটি একটি সনদে বর্ণিত হয়েছে, হাদীসের হুকুম ‘হাসান’। শায়খ আলবানী (র.) হাদীসটিকে ‘সহীহ’ বলেছেন।
(খ) অত্র সূরাটি মুফাস্সালাত এর অন্তভুক্ত, আর মুফাস্সালাত সূরাগুলোকে কোরআনের অন্তর বলা হয়। যেমন: ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন:
(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].
অর্থাৎ: “প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, আর কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্সাল সূরাগুলো”।
(*সুনানে দারিমী*, ৩৪২০) ।
আরো একটি হাদীসে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে মুফাস্সালাত সূরাগুলো ইতিপূর্বে কোন নবী-রাসূলকে প্রদান করা হয়নি। যেমন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةِ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].
অর্থাৎ: “আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিষিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিষিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্‌সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি”। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪) ।
হাদীসে মুফাস্‌সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ৮২তম সূরা।

অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ৮১তম সূরা, যা ‘সূরা নাযিয়াত’ এর পরে এবং ‘সূরা ইনশিক্বাক্ব’ এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

অবতীর্ণের স্থান: সকল তাফসীরকারক একমত যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, সতরাং তা সূরা মাক্কিয়্যাহ। (*বিতাকাত আল-তারীফ*, ২৮৬) ।

আয়াত সংখ্যা: ১৯টি।

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: এ সূরাটি অবতীর্ণের একটি প্রেক্ষাপট পাওয়া যায়, যার আলোচনা যথাস্থানে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (١) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ (٢) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (٣) وَإِذَا الْقُبُورُ
بُعْثِرَتْ (٤) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (٥) يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (٦) الَّذِي
خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (٧) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (٨)﴾ [سورة الانفطار: ١-٨].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়: কিয়ামতের দিনে মানুষের পূর্বপ্রেরিত কৃতকর্মের পুরস্কার এবং নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা পোষণকারীদের প্রতি তিরস্কার।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১	যখন	আকাশ	বিদীর্ণ হবে।	২	এবং যখন	নক্ষত্রগুলো	ঝরে পড়বে।	৩	এবং যখন
	إِذَا	السَّمَاءُ	انْفَطَرَتْ		وَإِذَا	الْكَوَاكِبُ	انْتَثَرَتْ		وَإِذَا

সমুদ্রগুলোকে	উত্তাল করে তোলা হবে।	৪	এবং যখন	কবরসমূহ	উন্মোচিত হবে।
الْبِحَارُ	فُجِّرَتْ		وَإِذَا	الْقُبُورُ	بُعْثِرَتْ

৫	তখন জানতে পারবে	প্রত্যেকেই	সে যা আগে পাঠিয়েছে	এবং যা পিছনে রেখে গেছে।
	عَلِمَتْ	نَفْسٌ	مَا قَدَّمَتْ	وَأَخَّرَتْ

৬	হে মানবজাতি!	কিসে তোমাকে প্রতারিত করলো	তোমার মহান রব সম্পর্কে।
	يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ	مَا غَرَّكَ	بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

৭	যিনি	তোমাকে সৃষ্টি করেছেন,	অতঃপর	তোমাকে সুসম করেছেন,	(এবং) তারপর
	الَّذِي	خَلَقَكَ	فَ	سَوَّاكَ	فَ

তোমাকে সুসমঞ্জস করেছেন।	৮	যে আকৃতিতে	তিনি চেয়েছেন	তোমাকে গঠন করেছেন।
عَدَلَكَ		فِي أَيِّ صُورَةٍ	مَا شَاءَ	رَكَّبَكَ

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

সিঙ্গায় প্রথম ফুৎকারের পরে আকাশ ফেটে যাওয়া, নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়া, সমুদ্রগুলোকে উত্তাল করার মাধ্যমে পানিশূন্য করে ফেলা এবং দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে হাশরের ময়দান রচনা হওয়ার পর যখন কবরবাসী উত্থিত হবে, তখন প্রত্যেকেই জানতে পারবে দুনিয়ার জীবনে সে কি করেছে? ভালো নাকি মন্দ?

হে মানবজাতি! তোমরা যারা ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছো, মহান রব সম্পর্কে কিসে তোমাদেরকে প্রতারিত করলো? ফলে তোমরা তাঁর অবাধ্য হয়ে গেলে। অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করে সুসম এবং সুসমঞ্জস করেছেন। তিনি যে আকৃতি তোমাদের জন্য যথার্থ মনে করেছেন, সে আকৃতিতেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। (*আইসার আল-*

তাফাসীর: ৫/৫৩০, আল-তাফসীর আল-মুনীর: ৩০/১০০, *আল-মোন্তাখাব: ৮৮৯*, *আল-তাফসীর আল-মোয়াস্সার: ১/৫৮৭*) ।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ﴾ 'আর যখন সমুদ্রগুলোকে উত্তাল করে তোলা হবে', বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে অত্র আয়াতের দুইটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়:
(ক) উত্তাল তরঙ্গের মাধ্যমে সমস্ত সমুদ্রকে একাকার করে একটি সমুদ্রে পরিণত করা হবে।
(খ) উত্তাল করার মাধ্যমে সমুদ্রগুলোকে পানিশূন্য করা হবে। (*আল-কুরতুবী*: ১৯/২৪৪) ।

অত্র সূরার সাথে পূর্ব ও পরের সূরার সম্পর্ক:

অত্র সূরা তথা সূরা ইনফিতার, তার পূর্বের দুইটি সূরা 'তাকভীর' ও 'আবাসা' এবং এর পরবর্তী সূরা 'মুতাফফিফীন' এর মধ্যে সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের মতো। কিয়ামতের দুইটি অংশ, প্রথমাংশে সিংগার প্রথম ফূঁকে এক প্রচন্ড ভূমিকম্পের মাধ্যমে সবকিছু ধ্বংস হয়ে হাশরের ময়দান সৃষ্টি হবে এবং দ্বিতীয়াংশে সিংগার দ্বিতীয় ফূঁকে সকল প্রাণী উত্থিত হয়ে বিচারের অপেক্ষায় হাশরের ময়দানে আল্লাহর সামনে দাড়িয়ে যাবে। অত্র চারটি সূরাতেই কিয়ামতের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অত্র সূরা তথা 'ইনফেতার' এবং তার পূর্বের দুইটি সূরা 'তাকভীর' ও 'আবাসা'তে কিয়ামতের প্রাথমিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। আর পরবতী সূরা 'মুতাফফিফীন' এ কিয়ামতের দ্বিতীয় অবস্থা তুলে ধরে হয়েছে। সুতরাং পূর্ববতী দুইটি সূরা এবং পরবর্তী সূরার সাথে অত্র সূরার সম্পর্ক হলো একে অপরের জন্য সম্পূরক। (*তানাসুক্ব আল-দুরার ফি তানাসুব আল-সূয়ার*, সয়ূতী: ১৫৮) ।

আয়াতাবলী অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

ইবনু আবি হাতীম (র.) ইকরিকামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: অত্র সূরার ছয় নাম্বার আয়াতটি উবাই ইবনু খালফ নামক কাফির সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। (*আসবাব আল-নুযুল*, সুয়ূতী: ৩৫৫) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। অত্র সূরার (১-৪) নাম্বার আয়াতে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের মহাপ্রলয়ের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সিংগার প্রথম ফুকের পর এ পৃথিবী সহ সারা বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। এখানে ধ্বংসের ধারাবাহিকতা থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, এ মহাপ্রলয়ে তারকাসমূহ পতিত হওয়ার মাধ্যমে প্রথমে আকাশ ধ্বংস হবে, কারণ আকাশ হলো পৃথিবীর জন্য ছাদ স্বরূপ আর ছাদ তো প্রথমেই ভাংতে হয়। এরপর সমুদ্রের পানি প্লাবিত করে পৃথিবীর উপরিভাগ ধ্বংস করে সমান করা হবে। তারপর পৃথিবী তার ভিতরে থাকা সকল কিছু বের করে দিবে। সবশেষে দ্বিতীয় ফুঁকের মাধ্যমে পৃথিবীর গহীনে থাকা কবরসমূহ থেকে সকল প্রানী উত্থিত হয়ে হাশরের ময়দানে জড়ো হবে। (আল-তাফসীর আল-কাবীর: ৩১/৭৩, *আল-মুনীর*: ৩০/৯৯) ।

২। অত্র সূরার (৫) নাম্বার আয়াতকে আরবী ভাষায় 'জাওয়াবে শর্ত' এবং (১-৪) নাম্বার আয়াতকে 'শর্ত' বলে। সুতরাং (১-৫) আয়াতের অর্থ হবে: যখন আকাশ ফেটে নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে, সমুদ্রগুলো উত্তাল করা হবে এবং কবরবাসী উত্থিত হবে, তখন প্রত্যেকেই জানতে পারবে দুনিয়ার জীবনে সে কি করেছে? ভালো নাকি মন্দ? (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/৯৯) ।
৩। পাঁচ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সকল প্রানীকে সতর্ক করেছেন যে, প্রত্যেকেই দুনিয়ার জীবনে কি করেছে, তার পরিণতি জানতে পারবে। একই অর্থে সূরা আনয়ামে এসেছে:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [سورة الأنعام، الآية: ٣٨].

অর্থাৎ: "যমীনের বুকে বিচরণশীল যে কোন জন্তু কিংবা বাতাসের বুকে নিজ ডানা দিয়ে উড়ে চলা যে কোন পাখী, এরা তোমাদের মতোই সৃষ্ট জাতি। আমি এ কিতাবে তাদের বর্ণনার কোন কিছুই বাকী রাখিনি। অতঃপর এদের সবাইকে তাদের মালিকের কাছে জড়ো করা হবে" (সূরা আল-আনয়াম: ৩৮) । অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: "হাশরের ময়দানে সকল প্রানী পুনরুত্থিত হবে, এমনকি ক্ষুদ্র মাছিটিও"।

সুতরাং অত্র সূরার পাঁচ নাম্বার আয়াত এবং সূরা আনয়াম এর উল্লেখিত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, হাশরের ময়দানে মানুষ-জিন জাতি সহ সকল প্রানী উত্থিত হয়ে আল্লাহর সামনে বিচারের মুখোমুখি হবে। বিবেকবান প্রানী ছাড়া অন্যান্য প্রানীর বিচার হবে কিসাস গ্রহণের মাধ্যমে, অর্থাৎ: এক প্রানী অন্য প্রানীকে দুনিয়াতে যে পরিমান আঘাত দিয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত প্রানী হাশরের ময়দানে আঘাত প্রদানকারী প্রানীকে সমপরিমাণ আঘাত করবে। এভাবে কিসাস বাস্তবায়নের পর সকল প্রানীকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হবে। অপরদিকে বিবেকবান প্রানী তথা মানুষ-জিন জাতিকে তাদের দুনিয়ার কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেওয়া হবে। ফলে তাদের কিছু অংশ স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিছু অংশ ক্ষণিকের জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করে এক সময় মুক্তি পাবে এবং বাকীরা স্থায়ীভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এ সম্পর্কে আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"يَقْضِي اللهُ بَيْنَ خَلْقِهِ، الْجِنِّ، وَالإِنْسِ، وَالْبَهَائِمِ، وَإِنَّهُ لَيَقِيدُ يَوْمَئِذٍ الْجَمَّاءَ مِنَ الْقَرْنَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ تَبِعَةً عِنْدَ وَاحِدَةٍ لأُخْرَى، قَالَ اللهُ: كُونُوا تُرَابًا، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقُولُ الْكَافِرُ: ﴿يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾" (الجامع الصحيح للسنن والمسانيد: ١٢٥/٢٢).

অর্থাৎ: "আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টি, জিন, মানবজাতি এবং পশুদের মাঝে বিচার করবেন। নিশ্চয় তিনি সেদিন শিংবিশিষ্ট্য প্রানী থেকে শিংবিহীন প্রানীর অধিকার আদায় করে দিবেন। এমনকি যখন একের কাছে অন্যের একটি আঘাতও বাকী থাকবে না, তখন আল্লাহ বলবেন: তোমরা সকলে মাটি হয়ে যাও। এ সময় কাফির বলবে: হায়! আমিও যদি তাদের মতো মাটি হয়ে যেতাম" (*আল-জামি আল-সহীহ লি আল-সুনান ওয়াল মাসানীদ*: ২২/১২৫) । শায়খ আলবানী (র.) এর নিকট হাদীসটি 'সহীহ'।

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ، مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ" (صحيح مسلم: ٢٥٨٢).

অর্থাৎ: “কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের কাছে তার অধিকারকে আদায় করে দেওয়া হবে। এমনকি, শিংবিশিষ্ট্য ছাগল থেকে শিংবিহীন ছাগলের অধিকার আদায় করে দেওয়া হবে”। (*সহীহ মুসলিম*, ইমাম মুসলিম: ২৫৮২) ।

৪। পাঁচ নাম্বার আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে কিয়ামতের দিন মানুষ দুই দলে বিভক্ত হবে:

(ক) একদল যারা নিজেদের আত্মার উপর যুলম করেছে, তারা নিজেদের প্রেরিত অপকর্ম দেখতে পাবে এবং জাহান্নামের শাস্তি স্বচক্ষে দেখবে।

(খ) আরেকদল যারা নিজেদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ রেখেছে, তারাও নিজেদের প্রেরিত সৎকর্ম দেখতে পাবে এবং তারা মহাসফলতা অর্জন করবে। (*তাফসীর সা’দী*: ৯১৪) ।

৫। অত্র সূরার ছয় নাম্বার আয়াত ‘উবাই ইবনু খালফ’ সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও ‘হে মানবজাতি’ বাক্যাংশ দ্বারা সকল মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে; কারণ তাফসীর শাস্ত্রের নিয়ম হলো: “আয়াতের শিক্ষা ধর্তব্য হয় শব্দ চয়নের ব্যাপকতার আলোকে, অবতীর্ণ হওয়ার বিশেষত্বের আলোকে নয়”। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/১০০) ।

৬। মানবজাতির উচিৎ আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ তাঁর প্রতি অনুগত পোষণ করা, কিন্তু মানুষ উল্টো দিকে হাটছে। অত্র সূরার (৬-৮) নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির প্রতি তাঁর বড় তিনটি অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পাপাচারিতা থেকে সতর্ক করেছেন:

(ক) মানবজাতিকে অস্তিত্ব দান করা।

(খ) তাদের অঙ্গপ্রতঙ্গকে সুনিপুনভাবে সমন্বয় সাধন করা।

(গ) আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নিজ পছন্দে প্রত্যেককে আকৃতি প্রদান করা। (আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন) ।

৭। বেশীরভাগ মানুষ হেদায়েতের ব্যাপারে ধোকায় পরে আছে, কোন জিনিষ তাদেরকে ধোকার জালে আবদ্ধ রেখেছে? এ ব্যাপারে তাফসীরকারকদের কয়েকটি মত পাওয়া যায়:

(ক) আল্লাহ প্রদত্ব নিয়ামতের বিলাসিতায় পড়ে মানুষ নিয়ামতদাতার কথা ভুলে যায়।

(খ) মানুষের মুর্খতা তাদেরকে হেদায়েত থেকে অমনযোগী করে রাখে।

(গ) মানুষের চির শত্রু শয়তানের কুমন্ত্রনার কারণে সে হেদায়েত থেকে অমনযোগী হয়।

(*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/১০০) ।

আয়াতাবলীর আমল:

(ক) আখেরাত ও কিয়ামতের ভয়াবহ চিত্র স্মরণ রেখে দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করা।

(খ) আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরুপ তাঁর প্রতি আনুগত্য পোষণ করা।

(গ) অতি বিলাসিতা, দ্বীনী বিষয়ে মুর্খতা এবং শয়তানের কুমন্ত্রনা ইত্যাদি বিষয় থেকে সুরক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থণা করা; কারণ এগুলো মানুষকে হেদায়েত থেকে দুরে রাখে।

﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (٩) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ
(١٢) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (١٤) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ (١٥) وَمَا هُمْ
عَنْهَا بِغَائِبِينَ (١٦) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٧) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٨) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ
لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (١٩)﴾ [سورة الانفطار: ٩-١٩].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়: কিয়ামতকে অস্বীকার করার কারণ এবং সেদিনের ভয়াবহতা।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

৯	না, কখনও নয়,	বরং	তোমরা অস্বীকার করো	শেষ বিচারকে।	১০	আর নিশ্চয়	
	كَلَّا	بَلْ	تُكَذِّبُونَ	بِالدِّينِ		وَإِنَّ	
তোমাদের উপর (নিযুক্ত) রয়েছে	সংরক্ষকগণ।	১১	সম্মানিত	লেখকবৃন্দ।	১২	তারা জানে	
عَلَيْكُمْ	لَحَافِظِينَ		كِرَامًا	كَاتِبِينَ		يَعْلَمُونَ	
যা	তোমরা করো।	১৩	নিশ্চয়	সৎকর্মপরায়নরা থাকবে	সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে।	১৪	আর নিশ্চয়
مَا	تَفْعَلُونَ		إِنَّ	الْأَبْرَارَ	لَفِي نَعِيمٍ		وَإِنَّ
পাপাচারিরা থাকবে	জাহিম (নামক দোযখ) এ।	১৫	তারা সেখানে প্রবেশ করবে	বিচার দিনে।			
الْفُجَّارَ	لَفِي جَحِيمٍ		يَصْلَوْنَهَا	يَوْمَ الدِّينِ			
১৬	আর তারা পারবে না	সেখান থেকে	উধাও হতে।	১৭	এবং তোমরা কি জানো		
	وَمَا هُمْ	عَنْهَا	بِغَائِبِينَ		وَمَا أَدْرَاكَ		
বিচারের দিন কি?	১৮	আবার বলি:	তোমরা কি জানো	বিচারের দিন কি?	১৯		
مَا يَوْمُ الدِّينِ		ثُمَّ	مَا أَدْرَاكَ	مَا يَوْمُ الدِّينِ			
সেদিন	কেউ সামর্থ রাখবে না	কারো জন্য কিছু করার,	আর সমস্ত কর্তৃত্ব হবে	সেদিন	আল্লাহর জন্য।		
يَوْمَ	لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ	لِنَفْسٍ شَيْئًا	وَالْأَمْرُ	يَوْمَئِذٍ	لِلَّهِ		

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত থেকে উদাসীন থাকার কারণে তাঁকে অস্বীকার করছো তা নয়, বরং তোমরা বিচারকে অস্বীকার করে থাকো, ফলে বিচার দিবসকে অস্বীকার করো এবং আল্লাহর অবাধ্য হয়ে থাকো। সাবধান! নিশ্চয় তোমাদের উপর সম্মানিত ফেরেশতা সংরক্ষক রয়েছে, যারা তোমাদের কৃতকর্মসমূহ সম্পর্কে জানেন এবং তা লিখে রাখেন। সুতরাং যারা সৎকর্মপরায়ণ, তারা চির স্থায়ী জান্নাতে থাকবে। অপরদিকে পাপাচারীরা সেদিন জাহীমের জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হবে, সেখান থেকে এক মুহূর্তের জন্য বের হওয়ার সুযোগ পাবে না। হে আল্লাহর নবী! আপনি কি জানেন বিচার দিবসের চিত্র কেমন হবে? আপনি কি জানেন এ দিনের ভয়াবহতা কি রকম হবে? সেদিন কেউ কারো

উপকার বা ক্ষতি করতে পারবে না, কারণ সব কিছু আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে থাকবে। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/১০৩, *আল-মোন্তাখাব*: ৮৯০, *আল-তাফসীর আল-মোয়াস্‌সার*: ১/৫৮৭) ।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿لَحَافِظِينَ - كِرَامًا كَاتِبِينَ﴾ 'সম্মানিত লেখক সংরক্ষকগণ', আমাদের সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, মানুষের সাথে সর্বদা দুইজন ফেরেশতা থাকেন, যারা তাদের আমলনামা লিপিবদ্ধ করেন। একজনে ভালো কর্ম লিখেন তার নাম 'কিরামুন' এবং অন্যজনে খারাব কর্ম লিখেন তার নাম 'কাতিবীন'। কোরান হাদীসের দৃষ্টিকোন থেকে প্রচলিত অর্থটি আমলনামা লিখে রাখেন অর্থে ঠিক হলেও তাদের সংখ্যা দুইজন এবং 'কিরামুন' ও 'কাতিবীন' তাদের নাম এ কথাটি ঠিক নয়। তাহলে দেখা যাক কোরআন ও সহীহ সুন্নাহ এ ব্যাপারে কি বলেছে:
অত্র সূরার উল্লেখিত (১০-১২) নাম্বার আয়াত, যেখানে আল্লাহ তায়ালা তাদের সংখ্যা বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ না করলেও বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা দুইয়ের অধিক সংখ্যাকে বুঝায়।
সূরা 'ক্বাফ' এর (১৭-১৮) নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:
﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (١٧) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٨)﴾ [سورة: ١٧-١٨].
অর্থাৎ: "সেখানে আরো দুইজন ফেরেশতা- একজন তার ডানে এবং আরেকজন তার বামে বসে আছে। একটি শব্দও সে উচ্চারণ করে না, যা সংরক্ষণ করার জন্যে একজন সদা সতর্ক প্রহরী তার পাশে নিয়োজিত থাকে না" (সূরা ক্বাফ: ১৭-১৮) । এখানে আল্লাহ তায়ালা সংরক্ষণকারী ফেরেশতার সংখ্যা দুইজন বলেছেন।
সূরা রা'দ এর এগারো নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:
﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [سورة الرعد: ١١].
অর্থাৎ: "মানুষের জন্য সামনে পিছনে একের পর এক দল (ফেরেশতা) নিয়োজিত থাকে, তারা আল্লাহর নির্দেশে তাকে হেফাযত করে" (সূরা রা'দ: ১১) । অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন।
আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ وَصَلاَةِ العَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ "
(متفق عليه، البخاري: ٥٥٥/ مسلم: ٦٣٢).
অর্থাৎ: "ফেরেশতাগণ পালা বদল করে তোমাদের মাঝে আগমণ করেন; একদল দিনে এবং একদল রাতে। আসর ও ফজরের সালাতে উভয় দল একত্র হন। অতঃপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী দলটি উঠে যান। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় রেখে আসলে? অবশ্য তিনি নিজেই তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। উত্তরে তারা বলেন: আমরা তাদেরকে সালাতে রেখে এসেছি, আমরা যখন তাদের

কিকট গিয়েছিলাম তখনও তারা সালাত আদায়রত অবস্থায় ছিলেন” (*মুত্তাফকুন আলাইহি, বুখারী*: ৫৫৫/ *মুসলিম*: ৬৩২) ।
আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে কুদসীতে এসেছে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:
"إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً، فَلاَ تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ" (صحيح البخاري: ٧٥٠١).
অর্থাৎ: “আমার বান্দা কোন গুনাহ্‌র কাজ করতে চাইলে তা না করা পর্যন্ত তোমরা তার গুনাহ্‌ লেখো না। আর যদি তা করেই ফেলে, তাহলে তা সমপরিমাণ লেখো। আর যদি আমার ভয়ে তা ত্যাগ করে, তাহলে তার আমলনামায় একটি নেকী লেখো। পক্ষান্তরে, যদি বান্দা কোন ভালো কাজের ইচ্ছা করলো কিন্তু তা না করে, তবুও তোমরা তার জন্য একটি নেকী লেখো। তারপর যদি তা করে, তবে তোমরা তার জন্য কাজটির দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত নেকী লেখো” (*সহীহ আল-বুখারী*: ৭৫০১) । অত্র হাদীসে লেখক ফেরেশতাদেরকে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করে সম্বোধন করেছেন।
সুতরাং এ সম্পর্কে উপরোল্লেখিত আয়াত ও হাদীসকে সমন্বয় করে ইবনু কাসীর (র.) বলেন: “প্রতিটি মানুষের সাথে চারজন ফেরেশতা সর্বদা অবস্থান করেন:

- ডান পাশে একজন, যিনি তার সৎআমল লিখে রাখেন।
- বাম পাশে একজন, যিনি তার বদআমল লিখে রাখেন।
- সামনে একজন, যিনি তাকে সামনের দিক থেকে হেফাজত করেন।
- পিছনে একজন, যিনি তাকে পিছনের দিক থেকে হেফাজত করেন।

এবং এ চারজন নির্দিষ্ট নয়, বরং রাতে ও দিনে পালাক্রমে পরিবর্তন হয়”। (তাফসীরে ইবনু কাসীর: ৪/৪৩৭) । (আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন) ।

﴿بِالدِّينِ﴾ ‘দ্বীনের প্রতি’, আয়াতাংশে ‘দ্বীন’ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এর উত্তরে ইমাম বায়যাভী (রহ.) বলেন: এর দ্বারা দুইটির যে কোন একট উদ্দেশ্য হতে পারে: (ক) ইসলাম, অথবা (খ) হাশরের ময়দানের হিসাব-নিকাশ। (*তাফসীর আল-বায়যাভী*: ৫/২৯২) ।

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٧) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٨)﴾ “তুমি কি জানো বিচারের দিবস কি? অতঃপর তুমি কি জানো বিচারের দিবস কি?” এখানে দুই বার একই বাক্য বলার উদ্দেশ্য কি? এ সম্পর্কে তাফসীরকারকদের থেকে দুইটি মত পাওয়া যায়:
(ক) অধিকাংশ তাফসীরকারক মনে করেন, এখানে একই বাক্য দুই বার বলার মাধ্যমে কিয়ামত দিনের অবস্থার ভয়াবহতার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/১০৫) ।
(খ) কতিপয় তাফসীরকারক মনে করেন, দুইটি বাক্য দেখতে এক মনে হলেও অর্থের দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে: হে আল্লাহর নবী! আপনি কি জানেন বিচার

দিবসের চিত্র কেমন হবে? আপনি কি জানেন এ দিনের ভয়াবহতা কি রকম হবে? (আল-মোন্তাখাব: ৮৯০)।

পূর্বের আয়াতাবলীর সাথে উল্লেখিত আয়াতাবলীর সম্পর্ক:

পূর্বের আয়াতাবলীতে কিয়ামতের ভয়াবহ চিত্র এবং মানবজাতির প্রতি আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামত ও মানবজাতি কর্তৃক তা অস্বীকার করা নিয়ে আলোচনা করার পর অত্র আয়াতবলীতে আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করার কারণ এবং আল্লাহর অবাধ্যতাকে বাদ দিয়ে তাঁকে অনুসরণের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে অত্র আয়াতাবলীতে কিয়ামতে মানবজাতি দুই দলে বিভক্ত হবে: এক দল জান্নাতী এবং আরেকদল জাহান্নামী বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/১০৩)।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। নয় নাম্বার আয়াতে আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ মূলত দুনিয়ার ভালো-মন্দ কর্মের জন্য বিচার হোক এটা চায় না। এজন্য তারা কিয়ামত ও হাশরের ময়দানকে অস্বীকার করে। এ অস্বীকৃতি থেকেই তারা আল্লাহর আনুগত্যকে মানতে নারাজ। ফলে তারা তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে তার নিয়ামতকে অস্বীকার করছে। (*তাফসীর আল-বায়যাভী*: ৫/২৯২, *তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/১০৪)।

২। অত্র সূরার (১০-১২) নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তোমাদের সাথে সর্বদা সম্মানিত লেখক সংরক্ষকগণ থাকেন, যারা তোমাদেরকে বিপদ-আপদ থেকে হেফাজত করেন এবং তোমাদের ভালো-মন্দ আমলসমূহ লিখে রাখেন। ইবনু কাসীর (র.) এর ভাষ্যমতে প্রতিটি মানুষের ডানে-বামে এবং সামনে-পিছে মোট চার জন সংরক্ষণকারী ফেরেশতা থাকেন (ইবনু কাসীর: ৪/৪৩৭)। অত্র চার জন ফেরেশতা এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট নয় এবং তাদের নির্দিষ্ট কোন নামও নেই, বরং স্বাভাবিক নিয়মে দিনে-রাতে তাদের পালা বদল হয়। তারা কিভাবে মানুষের ভালো-মন্দ কাজের পার্থক্য করে? এ প্রশ্নের উত্তরে সুফিয়ান সাওরী (র.) বলেছেন: তারা ভালো কাজ থেকে মেস্ক-আম্বরের সুঘ্রাণ এবং মন্দ কাজ থেকে দুগন্ধ পেয়ে বুঝতে পারে। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/১০৭)।

ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বিশেষ সময়গুলোতে তাদের থেকে লজ্জার কারণে উলঙ্গা হতে নিষেধ করেছেন।

"إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ عَنِ التَّعَرِّي فَاسْتَحْيُوا مِنْ مَلائِكَةِ اللَّهِ الَّذِينَ مَعَكُمُ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ الَّذِينَ لا يُفَارِقُونَكُمْ إلاَّ عِنْدَ إِحْدَى ثَلاثِ حَالاتٍ: الْغَائِطِ وَالْجَنَابَةِ وَالْغُسْلِ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ بِالْعَرَاءِ فليستتر بثوبه، أو بخذمة حَائِطٍ، أَوْ بِبَعِيرِهِ" (مسند البزار: ٤٧٩٩).

অর্থাৎ: "নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নগ্নতা থেকে নিষেধ করেছেন। সুতরাং তোমাদের সংরক্ষণে নিয়োজিত সম্মানিত লেখক ফেরেশতাদের লজ্জা করো, যারা পায়খানা, স্ত্রী সহবাস এবং গোসলের সময় ছাড়া সর্বদাই তোমাদের সাথে থাকেন। যখন তোমাদের কেউ একাকী

গোসল করে, তখন সে যেন কাপড়, অথবা দেওয়াল, অথবা উট দিয়ে আড়াল করে" (*মুসানাদ আল-বায্যার*: ৪৭৯৯)।
৩। অত্র সূরার (১৩-১৬) নাম্বার আয়াতে কিয়ামতের দিন মানুষের অবস্থা তুলে ধরেছেন। সেদিন মানুষ দুই দলে বিভক্ত হবে:
(ক) পুণ্যবানগণ, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আন্তরিক অনুগত ছিলেন, অন্যের অধিকার সংরক্ষণ করতেন, ঈমানদারদের সাথে চলাফেরা করতেন, আলেমদের নসীহত মান্য করতেন, কারো প্রতি অত্যাচার করতেন না ইত্যাদি, তারা অসীম নেয়ামত জান্নাতে প্রবেশ করবেন।
(খ) পাপাচারীগণ, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবাধ্য ছিল, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করতো, ঈমানদারদেরকে নিয়ে উপহাস করতো, অন্যের অধিকার নষ্ট করতো ইত্যাদি, তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সেখানে তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে, এক মুহূর্তের জন্য বের হওয়ার সুযোগ পাবে না। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/১০৫)।
৪। অত্র সূরার শেষের তিনটি আয়াত তথা (১৭-১৯) নাম্বার আয়াতে হাশরের ময়দানের বাস্তব এবং ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: সেদিন কেউ কারো উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা থাকবে না, সবকিছু আল্লাহর হাতে ন্যস্ত থাকবে। একই অর্থে পবিত্র কোরআনে অনেকগুলো আয়াতে এসেছে, যেমন: সূরা গাফির এর একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١٦)﴾ [سورة الغافر: ١٦].

অর্থাৎ: "সেদিন মানুষ বেড়িয়ে পড়বে, তাদের কোন কিছুই আল্লাহর কাছ থেকে গোপন থাকবে না; বলা হবে: আজ সর্বময় রাজত্ব ও কর্তৃত্ব কার জন্যে? উত্তর আসবে: প্রবল পরাক্রমশালী এক আল্লাহ তায়ালার জন্যে" (*সূরা আল-গাফির*: ১৬)।
সূরা বাক্বারা এর ৪৮ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (٤٨)﴾ [سورة البقرة: ٤٨].

অর্থাৎ: "তোমরা সে দিনকে ভয় করো যেদিন একজন আরেকজনের কোনই কাজে আসবে না, একজনের কাছ থেকে আরেকজনের পক্ষে কোনো সুপারিশও গ্রহণ করা হবে না, কারো কাছ থেকে মুক্তিপণ নেওয়া হবে না এবং না সেদিন তাদের কোনো সাহায্য করা হবে" (সূরা আল-বাক্বারা: ৪৮)। একই কথা সূরা বাক্বারার ১২৩ নাম্বার আয়াতেও ব্যক্ত করা হয়েছে। সুতরাং উল্লেখিত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার একক ক্ষমতা প্রতিফলিত হবে, অন্য কারো বিন্দু মাত্র শক্তি থাকবে না।

আয়াতাবলীর আমল:

(ক) আখেরাত ভিত্তিক জীবন-যাপন করা।
(খ) আমাদের সংরক্ষণে নিয়োজিত সম্মানিত লেখক ফেরেশতাদেরকে সম্মন করা এবং তাদের থেকে লজ্জার কারণে উলঙ্গ না হওয়া। বিশেষকরে পায়খানা, স্ত্রীসহবাস এবং গোসলের সময় উলঙ্গ না হওয়া।

(سُورة المطففين)

সূরা আল-মুতাফফিফীন এর পরিচয়:

সূরার নাম: অত্র সূরার তিনটি নাম পাওয়া যায়:

(ক) 'সূরা আল-মুতাফফিফীন', সূরাটি এ নামে পরিচিত।

(খ) "সূরাতু ওয়াইলু আল-মুতফফিফীন", ইমাম বুখারী (র.) তার সহীহ গ্রন্থের তাফসীর অধ্যায়ে এ নামটি উল্লেখ করেছেন। (*সহীহ আল-বুখারী*: ৬/১৬৭) ।

(গ) 'আল-তাতফীফ', ইমাম বাক্বায়ী (র.) তার 'নাজম আল-দুরার' গ্রন্থে এ নামটি উল্লেখ করেছেন। (*নাজম আল-দুরার*: ২১/৩১০) ।

তবে ইমাম সুয়ূতী (র.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল ইতক্বান' এ সূরাটি একাধিক নাম যুক্ত সূরার নামের তালিকায় উল্লেখ করেননি। (তাফসীর মওজুয়ী, মোস্তফা মুসলিম: ১০/৬৩) ।

আলোচ্যবিষয়: দুনিয়া ও আখিরাতে পূণ্যবান এবং অবাধ্য বান্দার অবস্থা।

সূরার ফযিলত: অত্র সূরাটি মুফাস্সালাত এর অন্তভুক্ত, আর মুফাস্সালাত সূরাগুলোকে কোরআনের অন্তর বলা হয়। যেমন: ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন:

(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].

অর্থাৎ: "প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, আর কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্সাল সূরাগুলো"।

(*সুনানে দারিমী*, ৩৪২০) ।

আরো একটি হাদীসে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে মুফাস্সালাত সূরাগুলো ইতিপূর্বে কোন নবী-রাসূলকে প্রদান করা হয়নি। যেমন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةِ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].

অর্থাৎ: "আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিষিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিষিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি"। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪) ।

হাদীসে মুফাস্সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ৮৩তম সূরা।

অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ৮৫তম সূরা, যা 'সূরা আনকাবূত' এর পরে এবং সূরা বাক্বারা এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

অবতীর্ণের স্থান: এ সূরাটি কোথায় হয়েছে, তা নিয়ে ওলামায়ে কেরাম থেকে অনেকগুলো মত পাওয়া যায়। তবে গ্রহণযোগ্য মত হলো: সূরাটি মাদানিয়্যাহ। (*বিতাকাত আল-তারীফ*, ২৮৯) ।

আয়াত সংখ্যা: ৩৬টি।

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: এ সূরাটি অবতীর্ণের একটি প্রেক্ষাপট পাওয়া যায়, যার আলোচনা যথাস্থানে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦)﴾ [سورة المطففين: ١-٦].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়:

ওজনে বেশী গ্রহণকারী এবং কম প্রদানকারীদেরকে সতর্কীকরণ।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১	ধ্বংস তাদের জন্য	যারা ওজনে কম দেয়।	২	যারা	লোকদের থেকে মেপে নেওয়ার সময়
	وَيْلٌ	لِلْمُطَفِّفِينَ		الَّذِينَ	إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ
পুরোপুরি গ্রহণ করে।	৩	এবং তাদেরকে মেপে অথবা ওজন করে দেয়ার সময়	কম দেয়।		
يَسْتَوْفُونَ		وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ	يُخْسِرُونَ		
৪	তারা কি ভেবে দেখেনি যে,	অবশ্যই তাদেরকে	পুনরুত্থিত করা হবে	৫	এক মহা দিবসে?
	أَلَا يَظُنُّ	أُولَئِكَ أَنَّهُمْ	مَبْعُوثُونَ		لِيَوْمٍ عَظِيمٍ
৬	যেদিন	দাঁড়াবে	সকল মানুষ	বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালকের সামনে।	
	يَوْمَ	يَقُومُ	النَّاسُ	لِرَبِّ الْعَالَمِينَ	

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য কঠিন শাস্তির ওয়াদা করেছেন, যারা অন্যের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করার সময় মেপে পুরোপুরি বরং আরো বেশী গ্রহণ করে, আর অন্যের কাছে কোন জিনিস বিক্রি করার সময় পরিমাপে কম প্রদান করে। তারা কি ভয় করে না যে, অচিরেই ভয়ঙ্কর দিন আপতিত হবে? সেদিন সকল মানুষ কবর থেকে উত্থিত হয়ে সারা জাহানের প্রতিপালকের সামনে দাণ্ডায়মান হবে; যিনি তাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন। (*আইসার আল-তাফাসীর: ৫/৫৩৪*, *আল-মোন্তাখাব: ৮৯১*, *আল-তাফসীর আল-মোয়াস্সার: ১/৫৮৮*) ।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿وَيْلٌ﴾ 'ধ্বংস', এ আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে দুইটি মত পাওয়া যায়:

(ক) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে বুঝানো হয়েছে।

(খ) জাহান্নামের তলদেশে অবস্থিত উপত্যকাকে বুঝানো হয়েছে, যেখানে দাগি আসামীদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। (*তাফসীর গরীব আল-কোরআন*, কাওয়ারী: ৮৩/১) ।

﴿ الْمُطَفِّفِينَ ﴾ আয়াতাংশের অর্থ হলো: 'যারা অন্যের হক্ব প্রদান করতে ওজনে বা পরিমাপে কমতি করে'। তবে অত্র সূরায় উদ্দেশ্য হলো: যারা অন্যের হক প্রদান করতে ওজনে বা

পরিমাপে কমতি করে এবং নিজের হক অন্যের থেকে গ্রহণের সময় পুরোপুরি বা পাওনার চেয়ে বেশী গ্রহণ করে। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/১১২) ।

অত্র সূরার সাথে পূর্ববর্তী সূরার সম্পর্ক:

অত্র সূরা তথা সূরা মুতাফফিফীন এবং তার পূর্বের তিনটি সূরা তথা ইনফেতার, তাকভীর ও আবাসা এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। কিয়ামতের দুইটি অংশ, প্রথমাংশে সিংগার প্রথম ফুঁকে এক প্রচন্ড ভূমিকম্পের মাধ্যমে সর্বকিছু ধ্বংস হয়ে হাশরের ময়দান সৃষ্টি হবে এবং দ্বিতীয়াংশে সিংগার দ্বিতীয় ফুঁকে সকল প্রাণী উত্থিত হয়ে বিচারের অপেক্ষায় হাশরের ময়দানে আল্লাহর সামনে দাড়িয়ে যাবে। অত্র চারটি সূরাতেই কিয়ামতের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সূরা ইনফেতার, তাকভীর এবং আবাসাতে কিয়ামতের প্রাথমিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। আর অত্র সূরা তথা সূরা মুতাফফিফীন এ কিয়ামতের দ্বিতীয় অবস্থা তুলে ধরে হয়েছে। সুতরাং পূর্ববর্তী তিনটি সূরার সাথে অত্র সূরার সম্পর্ক হলো একে অপরের জন্য সম্পূরক। (*তানাসুক্ব আল-দুরার ফি তানাসুব আল-সুয়ার*, সয়ূতী: ১৫৮) ।

অত্র সূরার সাথে পরবর্তী সূরার সম্পর্ক:

ইমাম আলুসী (র.) বলেন: সূরা ইনফিতার এ আলোচনা করা হয়েছে যে, দুই জন ফেরেশতা কিরামুন ও কাতিবীন সর্বদা মানুষের সাথে অবস্থান করে তাদের আমলনামা সংরক্ষণ করেন, অত্র সূরা তথা সূরা মুতাফফিফীনেও এ বিষয়ের স্বীকৃতি রয়েছে। আর পরবর্তী সূরা তথা সূরা ইনশেক্বাক্ব এ কিয়ামতের দিন আমলনামা পেশ করার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং সূরা ইনফিতার ও মুতাফফিফীন এর সাথে পরবর্তী সূরা তথা সূরা ইনশিক্বাক্ব এর সম্পর্ক হলো একে অপরের জন্য সম্পূরক। (*রুহুল মায়ানী*: ১৫/২৮৬) ।

অত্র সূরা অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

ইমাম নাসায়ী এবং ইবনু মাযাহ (র.) নিজ নিজ গ্রন্থে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পরে দেখতে পেলেন সেখানের কিছু মানুষ অন্যদেরকে ওজনে কম দিয়ে ঠকাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালা অত্র সূরার শুরুর আয়াতাবলী অবতীর্ণ করে তাদেরকে এহেন ঘৃণ্য কাজ থেকে সতর্ক করে দিলেন। (*আসবাব আল-নুযুল*, সুয়ূতী: ৩৫৫) ।

ইমাম সুদ্দী (র.) বলেন: অত্র আয়াতাবলী মদীনার ‘আবু জুহাইনা’ নামক প্রবীণ ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মানুষকে কম দিতো এবং নিজে বেশী গ্রহণ করতো। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/১১২) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ওজন/পরিমাপে কমবেশ করা হারাম, যদিও তা সামান্য হোক। যারা এ ধরণের জঘণ্য কাজে জড়াবে তাদেরকে কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার ভয় দেখানো হয়েছে। এ ছাড়াও ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"خَمْسٌ بِخَمْسٍ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا خَمْسٌ بِخَمْسٍ؟ قَالَ: "مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ، وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرُ، وَلَا ظَهَرَتْ فِيهِمُ الْفَاحِشَةُ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْمَوْتُ، وَلَا طَفَّفُوا الْمِكْيَالَ إِلَّا مُنِعُوا النَّبَاتَ وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَلَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا حُبِسَ عَنْهُمُ الْقَطْرُ" (المعجم الكبير للطبراني: ١٠٩٩٢).

“পাঁচের বিনিময়ে পাঁচ”, সাহাবায়ে কিরাম বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! “পাঁচের বিনিময়ে পাঁচ’ এর অর্থ কি? তিনি উত্তরে বললেন: (ক) যখন চুক্তি ভঙ্গ করা কোন দেশ বা জাতির স্বভাবে পরিণত হবে, তখন শত্রুপক্ষ তাদেরকে শোষণ করবে। (খ) যখন কোন সমাজে আল্লাহর বিধানকে অবমূল্যায়ন করা হবে, তখন সেখানে দরিদ্রতা বেড়ে যাবে। (গ) যখন কোন সমাজে বেহায়াপনা ছড়িয়ে পড়বে, তখন সেখানে মৃত্যু ছড়িয়ে পড়বে। (ঘ) যখন কোন সমাজে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে পরিমাপে কমবেশ করার সংস্কৃতি তৈরি হবে, তখন সেখানে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়বে। (ঙ) যখন কোন সমাজে যাকাত প্রচলন বন্ধ হয়ে যাবে, তখন সেখানে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে। (*আল-মুযাম আল-কাবীর*, আল-তাবরানী: ১০৯৯২) । ইমাম জুহাইলী (র.) তার তাফসীর গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে ‘সহীহ’ হুকুম দিয়েছেন।

২। অত্র সূরার (১-৬) নাম্বার আয়াত থেকে বুঝা যায় ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে কমবেশ করা কবীরা গুনাহ। শায়খ আবুল কাসিম আল-কুশাইরী (র.) নিম্নের বিষয়গুলো উপরোল্লেখিত হুকুমের আওতায় পড়বে বলে মত দিয়েছেন:

(ক) ওযন এবং পরিমাপ করা যায় এমন সকল জিনিসে কমবেশ করা।

(খ) ক্রয় করার সময় পণ্যের ত্রুটি প্রকাশ করা, কিন্তু বিক্রয় করার সময় তা লুকিয়ে রাখা।

(গ) নিজের কোন বিষয়ে ইনসাফ খুব দৃঢ়ভাবে কামনা করে, কিন্তু অন্যের ক্ষেত্রে ততটা গুরুত্ব পায় না।

(ঘ) নিজের জন্যে সর্বদা ভালাই পছন্দ করে, কিন্তু অন্যের ক্ষেত্রে ভিন্ন মনোভাব পোষণ করা।

(ঙ) নিজের মধ্যে বিরাজমান ত্রুটির ব্যাপারে উদাসীন, কিন্তু অন্যের ত্রুটি ধরতে খুবই সোচ্চার থাকা।

(চ) নিজের অধিকার পেতে খুবই সোচ্চার, কিন্তু অন্যের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে উদাসীন থাকা। (*লাতায়িফুল ইশারাত*, আল-কোশইরী: ৩/৭০০) ।

৩। ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ওযন ও পরিমাপে কমবেশ করা বড় জঘন্য একটি চারিত্রিক ব্যাধি। এ জন্য অত্র সূরার প্রথম ছয় আয়াতে চার ধরণের সতর্কতা করানোর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে এ ধরণের অপরাধে জড়াতে নিষেধ করেছেন:

(ক) প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, যারা ক্রয়ের সময় বেশী গ্রহণ করবে এবং বিক্রয়ের সময়ে কম দিবে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

(খ) চতুর্থ আয়াতে তাদেরকে বিচার দিনের ভয় দেখানো হয়েছে।

(গ) পঞ্চম আয়াতে বিচার দিনকে তাদের কাছে মহা দিবস হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

(ঘ) ষষ্ঠ আয়াতে মহান আল্লাহর সামনে ভয়ে দাড়িয়ে থাকার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

ওজনে কমবেশ করা এতই ভয়ঙ্কর যে, পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন জায়গাতে এ জাতীয় অপরাধ থেকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে সতর্ক করা হয়েছে:

প্রথমত: সূরা ইসরা এর ৩৫ নাম্বার আয়াতে পরিমাপের ক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রদান এবং ওযনের ক্ষেত্রে দাঁড়িপাল্লা সোজা করে ধরাকে উত্তম পন্থা বলা হয়েছে:

﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [سورة الإسراء: ٣٥].

অর্থাৎ: "পরিমাপ করার সময় মাপ কিন্তু পুরোপুরিই করবে, আর ওযন দেওয়ার সময় দাঁড়িপাল্লা সোজা করে ধরবে; লেনদেনের ব্যাপারে এটা হচ্ছে উত্তম পন্থা এবং পরিণামের দিক থেকে এটাই হচ্ছে উৎকৃষ্ট" (*সূরা ইসরা: ৩৫*) ।

দ্বিতীয়ত: সূরা আনয়াম এর ১৫২ নাম্বার আয়াতে মানবজাতিকে তাদের সাধ্যানুযায়ী ওযন এবং পরিমাপ ঠিক রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:

﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ، لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها﴾ (سورة الأنعام: ١٥٢).

অর্থাৎ: "পরিমাপ ও ওযন করার সময় ন্যায্যভাবেই তা করবে, আমি কারো উপর তার সাধ্যসীমার বাইরে কোন দায়িত্ব চাপাই না" (*সূরা আনয়াম: ১৫২*)।

তৃতীয়ত: সূরা রহমান এর ৯ নাম্বার আয়াতে ন্যায়পরায়ণতার সাথে ওযন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ﴾ [سورة الرحمن: ٩].

অর্থাৎ: "তোমরা ইনসাফ মোতাবেক ওযন প্রতিষ্ঠা করো এবং ওযনে কম দিয়ে এ মানদন্ডের ক্ষতি করো না" (*সূরা আর রহমান: ৯*) ।

চতুর্থত: সূরা হুদ এর ৮৫ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে ওযন এবং পরিমাপে কমবেশ করা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার শামিল:

﴿وَيا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ، وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ، وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [سورة هود: ٨٥].

অর্থাৎ: "হে আমার জাতি! তোমরা মাপ ও ওযনের কাজটি ইনাসাফের সাথে সম্পন্ন করো, লোকদের জিনিসপত্র কম দিয়ে তাদেরকে ক্ষতি করো না, আর আল্লাহর যমীনে কখনও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না" (*সূরা হুদ: ৮৫*) ।

এছাড়া একটি হাদীসে ওযন এবং পরিমাপে কমবেশ করাকে পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন একটি লম্বা হাদীসের একাংশে বলা হয়েছে:

"وَلَا طَفَّفُوا الْمِكْيَالَ إِلَّا مُنِعُوا النَّبَاتَ وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ" (المعجم الكبير للطبراني: ١٠٩٩٢).

"তোমরা ওযন এবং পরিমাপে কমবেশ করো না, মনে রেখ! যখন কোন সমাজে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে পরিমাপে কমবেশ করার সংস্কৃতি তৈরি হবে, তখন সেখানে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়বে" (*আল-মুযাম আল-কাবীর*, আল-তাবরানী: ১০৯৯২) ।

৫। ছয় নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে 'যেদিন মানুষ বিশ্ব প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে', কিন্তু মানুষ মানুষের সামনে সম্মান অথবা ভীতিসন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়াতে পারবে কি না? এ ব্যাপারে দুইটি মত পাওয়া যায়: এক দল ওলামায়ে কেরাম জায়েজ বলেছেন এবং আরেক দল না জায়েজ বলেছেন। উভয় দলের পক্ষেই দলীল রয়েছে।

ইমাম কুরতুবী (র.) দুইটি মতকে সমন্বয় করে বলেছেন: যার সামনে দাড়ানো হবে তার মনের অবস্থার উপর ভিত্তি করে জায়েজ বা না জায়েজ ফতোয়া আসবে। যদি সে এ ধরনের সম্মান কামনা করে এবং নিজেকে এটার যোগ্য মনে করে দাম্ভিক হয়ে উঠে, তাহলে তার সামনে

দাড়ানো জায়েজ নেই। আর যদি তার মনের ভিতর এ রকম কিছু না থাকে এবং সে দুর্বল হওয়ার কারনে তাকে সেবা শশ্রূষার জন্য হয় -যেমনটা সা'দ ইবনু মুয়ায এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল- , তাহলে তার সামনে দাড়ানো জায়েজ আছে। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/১১৬) ।

আয়াতাবলীর আমল:

ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ওযন এবং পরিমাপে কমবেশ না করা।

﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (٧) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ (٨) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (٩) وَيْلٌ
يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٠) الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (١١) وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
(١٢) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (١٣) كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ (١٤) كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (١٥) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ (١٦) ثُمَّ
يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (١٧)﴾ [سورة المطففين: ٧-١٧].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়: মন্দ কাজের সংরক্ষণ এবং মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীদের কাহিনী।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

৭	না, (এ কাজ) কখনো ঠিক নয়,	অবশ্যই	পাপাচারীদের আমলনামা	সিজ্জীনে থাকবে।	৮
	كَلَّا	إِنَّ	كِتَابَ الْفُجَّارِ	لَفِي سِجِّينٍ	

তুমি কি জানো	সিজ্জীন কি?	৯	লিখিত কিতাব।	১০	দুর্ভোগ হবে	সেদিন	মিথ্যাচারীদের।
وَمَا أَدْرَاكَ	مَا سِجِّينٌ		كِتَابٌ مَرْقُومٌ		وَيْلٌ	يَوْمَئِذٍ	لِلْمُكَذِّبِينَ

১১	যারা	অস্বীকার করে	বিচার দিনকে।	১২	আর তা অস্বীকার করে	শুধু সীমালঙ্ঘনকারী পাপিষ্ট।
	الَّذِينَ	يُكَذِّبُونَ	بِيَوْمِ الدِّينِ		وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ	إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ

১৩	যখন	তেলাওয়াত করে শুনানো হয়	তার সামনে	আমার আয়াত,	তখন সে বলে:
	إِذَا	تُتْلَى	عَلَيْهِ	آيَاتُنَا	قَالَ

(এটাতো) পূর্ববর্তীদের গল্পগাথা।	১৪	কখনো এটা ঠিক নয়,	বরং	তাদের অন্তরে ঝং ধরিয়েছে
أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ		كَلَّا	بَلْ	رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ

তাদের কৃতকর্ম।	১৫	এটাও কখনো ঠিক নয়,	নিশ্চয় তারা	তাদের রব থেকে	সেই দিন
مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ		كَلَّا	إِنَّهُمْ	عَنْ رَبِّهِمْ	يَوْمَئِذٍ

আড়ালে থাকবে।	১৬	অতঃপর	অবশ্যই তারা	প্রবেশ করবে	জাহীমে।	১৭	অতঃপর
لَمَحْجُوبُونَ		ثُمَّ	إِنَّهُمْ	لَصَالُو	الْجَحِيمِ		ثُمَّ

বলা হবে,	এটা তা,	যা	তোমরা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করতে।	
يُقَالُ	هَذَا	الَّذِي	كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ	

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

লেনদেনে যারা কমবেশ করছে, তারা মোটেই ঠিক করছে না। অবশ্যই এ সকল পাপাচারীদের আমলনামা ‘সিজ্জীন’ এ সংরক্ষিত থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা নিজেই প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে ‘সিজ্জীন’ এর পরিচয় দিয়ে বলেন: তোমরা কি জানো সিজ্জীন কি? তা হলো- সপ্তম

যমীনের নীচে শয়তানের ঘাটির কাছে লিখিত একটি ফলক, যেখানে পাপাচারীদের মৃত্যুর পর তাদের রূহ এবং আমলনামা সংরক্ষণে রাখা হয়।

যারা আল্লাহ, কোরআন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করে, তাদের জন্য কিয়ামতের দিন জাহান্নামের ভিতর ওয়াইল উপত্যাকার ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে। আর এ গুলোকে কেবল সীমালঙ্ঘনকারী পাপিষ্টরাই অস্বীকার করে থাকে। তাদের অবস্থা হলো- যখন তাদের সামনে কোরআন তেলাওয়াত করা হয় এবং তার ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়, তখন তারা বলে কোরআনতো পূর্ববর্তী যুগের গল্পকথা।

আল্লাহ তায়ালা তাদের মন্তব্যের উত্তরে বলেন: এ ধরণের কথা বলা কখনও তাদের জন্য সমীচীন নয়, বরং তাদের অপকর্মের জন্য অন্তরের উপর মরিচা পরে যাওয়ার কারণে এ রকম অযথা কথাবর্তা বলে বেড়ায়। এ ধরণের অবাঞ্চনীয় কথা বলা কখনও ঠিক না, এটার কারণেই তারা কিয়ামতের দিন যখন মুমিনরা সবচেয়ে বড় পুরস্কার 'আল্লাহর দর্শন' লাভ করবে, তখন তাদের মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে, ফলে তারা 'আল্লাহর দর্শন' লাভ থেকে বঞ্চিত হবে। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে বলা হবে তোমরা আল্লাহ, কোরআন, রাসূল এবং পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করতে, এখন তার ফল ভোগ করো। (*কুরতুবী*: ১৯/২৫৭, *আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫৩৬-৫৩৭, *আল-মোন্তাখাব*: ৮৯১-৮৯২, *আল-তাফসীর আল-মোয়াস্‌সার*: ১/৫৮৮) ।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الْفُجَّارِ﴾ 'পাপাচারীগণ', এ আয়াতাংশ সম্পর্কে ইবনু হাজার আসকালানী (র.) বলেন: 'ফাজির' বা পাপাচারী শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক একটি আরবী শব্দ, যা সকল ধরণের অন্যায় কাজ, যেমন: যুলম, কুফর, অন্যকে ঠকানো, ওযনে কম দেওয়া, যেনা-ব্যবিচার, বেহায়পনা, মানুষ হত্যা ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াতে 'যারা ওযন এবং পরিমাপে কমবেশ করে' তাদেরকে 'ফুজ্জার' বা পাপাচারীগণ বলে আখ্যা দিয়েছেন। (*ফাতহুল বারী*, *তাফসীর গরবী আল-কোরআন*, কাওয়ারী: ৮৩/৭) ।

﴿سِجِّينٍ﴾ 'সিজ্জীন' আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে ইমাম ফখরুদ্দীন আল-রাযী (র.) বলেন: অধিকাংশ তাফসীরকারকগণের মতে, 'সিজ্জীন' হলো-সপ্তম যমীনের নিছে শয়তানের ঘাটিতে সকল শয়তানের নাম খচিত একটি কালো টুকরা পাথর বা ফলক, যেখানে পাপাচারী মানুষ ও জ্বিন জাতির আমলনামা এবং তাদের রূহ মৃত্যুর পরে সংরক্ষিত থাকে। কা'ব আল-আহবার, ইবনু আব্বাস, বারা ইবনু আযিব, আতা আল-খুরাসানী, আবু হুরাইরা, ক্বালবী এবং মুজাহিদ (রা.) প্রমুখ এ মতের প্রবক্তা। (*আল-তাফসীর আল-কাবীর*, ফখরুদ্দীন আল-রাযী: ৩১/৮৬, *কুরতুবী*: ১৯/২৫৭) । এখন প্রশ্ন হতে পারে 'সিজ্জীন' এর অত্র সংজ্ঞাটি আল্লাহ প্রদত্ব পরিচয়ের সাথে কি সাংঘর্ষিক নয়? এর উত্তর হলো- দুইটি কারণে সাংঘর্ষিক নয়: (ক) আল্লাহ তায়ালা আয়াতে বর্ণিত 'লিখিত কিতাব' দ্বারা এ ফলকটিকে উদ্দেশ্য করেছেন। (খ) ইমাম ক্বফফাল (র.) বলেন: 'কিতাবুম মারকুম' আয়াতাংশটি 'সিজ্জীন' শব্দের গুণ নয়, বরং

'কিতাবুল ফুজ্জার' এর গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং 'কিতাবুল ফুজ্জার' এর দুইটি গুণ: একটি হলো– 'ফি সিজ্জীন' এবং আরেকটি হলো– 'কিতাবুম মারকুম'। আর 'ওয়ামা আদরাকা মা সিজ্জীন' এ আয়াতাংশটি 'জুমলাহ মু'তারেজা' (*আল-কাবীর*, রাযী: ৩১/৮৭) ।

অত্র আয়াতাবলীর সাথে পূর্ববতী আয়াতাবলীর সম্পর্ক:

পূর্ববর্তী আয়াতাবলীতে ওযন ও পরিমাপে কমবেশ করার অপরাধের ভয়াবহতা এবং পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কে অমনযোগী থাকাকে এ ধরণের অপরাধে জড়ানোর মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করার পর অত্র আয়াতাবলীতে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দুইটি বিষয়ে সতর্ক করেছেন: (ক) পাপাচারীদের কৃতকর্ম 'সিজ্জীন' এ সংরক্ষিত থাকবে এবং (খ) সীমাহীন অপকর্মের কারণে তাদের অন্তরে মরিচা পরে যাওয়ার ফলে তারা পুনরুত্থান দিবস ও কোরআনকে অস্বীকার করে এবং এ দুইটি বিষয়কে অস্বীকার করার কারণে তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/১১৯) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। অত্র সূরার (৭-৯) নাম্বার আয়াতে, যারা ওযন ও পরিমাপে কমবেশ করে, তাদেরকে পাপাচারী আখ্যা দেওয়া হয়েছে; আর যারা পাপাচারী, মৃত্যুর পর তাদের আত্মা এবং আমলনামা 'সিজ্জীন' (যার পরিচয় ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) এ রাখা হয়। এ সম্পর্কে একটি মাওকুফ হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) অত্র সূরার (৭-৯) নাম্বার আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কা'ব আল-আহবার (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বলেন:

"إِنَّ رُوحَ الْفَاجِرِ يُصْعَدُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَتَأْبَى السَّمَاءُ أَنْ تَقْبَلَهَا، فَيُهْبَطُ بِهَا إِلَى الأَرْضِ، وَتَأْبَى الأَرْضُ أَنْ تَقْبَلَهَا، فَتُدْخَلُ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى سِجِّينٍ، وَهُوَ خَدُّ إِبْلِيسَ، فَيَخْرُجُ لَهَا مِنْ تَحْتِ خَدِّ إِبْلِيسَ كِتَابٌ، فَيُخْتَمُ، وَيُوضَعُ تَحْتَ خَدِّ إِبْلِيسَ لِهَلاكِهِ لِلْحِسَابِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ﴾ [المطففين: ٧] (الزهد لابن المبارك: ١٢٢٣).

অর্থাৎ: (নিশ্চয় পাপাচারী আত্মাকে আকাশের দিকে বহণ করে আনা হয়, অতঃপর আকাশ তা প্রত্যাখ্যান করলে পৃথিবীতে নিয়ে আসা হয়। অনুরূপভাবে পৃথিবীও তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। অতঃপর তাকে সপ্তম যমীনের নীচে প্রবেশ করানো হয়, এমনকি 'সিজ্জীন' এ পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। এটা হলো– ইবলিশের গাল বা দুর্গ। অতঃপর তার জন্য ইবলিশের দুর্গ থেকে একটি কিতাব বের করে সেখানে সিলগালা করে রাখা হয়। উল্লেখ্য যে, আমলনামা ও আত্মা ইবলিশের গালে রাখা হিসাবের সময় ধংসের নিশানা। এটাই হলো "কখনও নয়, বরং পাপাচারীদের আমলনামা 'সিজ্জীন'এ রাখা হবে। তুমি কি জানো 'সিজ্জীন' কি? তা হলো– লিখিত ফলক") আয়াতের ব্যাখ্যা। (*আল-যুহদ লি ইবনি মুবারক*: ১২২৩) । এ হাদীসের সমর্থনে সহীহ মুসলিমের একটি মাওকুফ হাদীস রয়েছে, আবু হুরাইরা (রা.) বলেন:

"وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ - قَالَ حَمَّادٌ وَذَكَرَ مِنْ نَتْنِهَا، وَذَكَرَ لَعْنًا - وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ رُوحٌ: خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ. قَالَ: فَيُقَالُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ" (صحيح مسلم: ٢٨٧٢).

অর্থাৎ: "আর কাফেরের অবস্থা হলো- যখন তার আত্মা বের করে আকাশের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন আকাশের অধিবাসীরা বলে: পৃথিবী থেকে অপবিত্র আত্মা এসেছে। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন: তখন আকাশ থেকে বলা হয়: তাকে শেষ সীমান্তে নিয়ে যাও" (*সহীহ মুসলিম*: ২৮৭২) । ইমাম সুয়ূতী (র.) ক্বাজী ইয়াজ (র.) এর বরাতে বলেন: 'শেষ সীমান্ত' হলো 'সিজ্জীন' (*আল-দীবাজ আল সহীহি মুসলিম বি হাজ্জাজ*, সুয়ূতী: ৬/২০৫) ।

২। অত্র সূরার (১০-১৩) নাম্বার আয়াতে, যারা বিচারের দিন বা পুনরুত্থান দিবসকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে তাদেরকে জাহান্নামের ওয়াইল নামক ভয়ংকর উপত্যাকায় (যা জাহান্নামে শাস্তি প্রদানের বিশেষ সেল) শাস্তি প্রদান করা হবে। আর তিনটি গুণের মানুষ পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করে থাকে:

(ক) যারা আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ব বিধানের সীমালঙ্ঘন করে।

(খ) পাপাচারে যারা লিপ্ত থাকে। এবং

(গ) যারা কোরআনকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করে। (*আল-তাফসীর আল-কাবীর*: ৩১/৮৭) ।

৩। অত্র সূরার চৌদ্দ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কোরআন অস্বীকার করার কারণ উল্লেখপূর্বক বলেন: তারা কোরআনকে অস্বীকার করে, কারণ বেশী বেশী পাপ কাজের ফলে তাদের অন্তরের উপর মরিচা বা আবরণ পড়ে গেছে। মূলত জন্মের সময় মানুষের আত্মা আয়নার মতো স্বচ্ছ থাকে। প্রাপ্ত বয়েসে উপনীত হওয়ার পর একটি গুণাহের কাজ করলে অন্তরের উপর একটি কালো দাগ পড়ে; আবার ভালো কাজ করলে তা মুছে যায়। মানুষের পাপ কাজের পরিমাণ অধিক বেশী হলে এক পর্যায়ে তার পুরো অন্তরটা কালো হয়ে যায়। এ অবস্থায় সে ভালো কোন চিন্তা করতে পারে না, এমনকি ভালো-মন্দের পার্থক্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আল্লাহ অন্তরের এ অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ সম্পর্কে সুনানে তিরমিযীতে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"إِنَّ العَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٤]". (سنن الترمذي: ٣٣٣٤).

অর্থাৎ: "নিশ্চয় বান্দা যখন একটি ভুল করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পরে যায়। অতঃপর যখন সে এ ভুল থেকে ফিরে আসে, ক্ষমা প্রার্থণা করে এবং তাওবা করে, তাহলে তার অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়। আর যদি সে ভুল কাজ বারংবার করে, তাহলে কালো দাগের পরিধি বাড়তে থাকে, এমনকি এক পর্যায়ে পুরো অন্তরটি কালো হয়ে যায়। এটাই হলো মরিচা, যা আল্লাহ তায়ালা কোরআনে উল্লেখ করেছেন: (না, কখনও না, বরং তাদের অপকর্মের কারণে অন্তরের উপর মরিচা পড়ে গেছে) [সূরা মুতাফফিফীন: ১৪]" (সুনান আল-তিরমিযী: ৩৩৩৪)। ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটিকে 'হাসান সহীহ' বলেছেন। শায়খ আলবানী (র.) 'হাসান' বলেছেন। অপরিচ্ছন্ন আত্মাকে কিভাবে পরিষ্কার করতে হয় এ সম্পর্কে আলোচনা সূরা আ'লাতে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

৪। অত্র সূরার (১৫-১৭) নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা কোরআন সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে এবং পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করে, কিয়মতের দিন তাদের জন্য তিনটি লাঞ্ছনা রয়েছে: (ক) আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে দেখা দিবেন না, (খ) তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং (গ) জাহান্নামে প্রবেশকালে তাদেরকে ব্যঙ্গ করে বলা হবে, তোমরা দুনিয়াতে যে অপকর্ম করেছো তার বিনিময়ে এখন জাহান্নামের স্বাদ গ্রহণ করো। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

৫। অত্র সূরার ১৫ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে: "কখনও নয়, নিশ্চয় তারা সেদিন তাদের রব থেকে আড়ালে থাকবে"। এ আয়াতে একটি আক্বায়িদী মাসয়ালার সমাধান রয়েছে। মাসয়ালাটি হলো: বান্দাহ কি কখনও আল্লাহকে দেখতে পারবে? এ ব্যাপারে দুইটি মত রয়েছে: (ক) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, দুনিয়াতে চর্মচক্ষু দিয়ে আল্লাহর দর্শন লাভ কারো পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু জান্নাতে প্রবেশের পর জান্নাতীরা আল্লাহ তায়ালাকে দেখতে পারবেন। ওলামায়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত কোরআন, সহীহ সুন্নাহ এবং ইজমাউস সালাফ দিয়ে তাদের পক্ষে দলীল পেশ করেন। তারা অত্র আয়াত দিয়ে দলীল পেশ করে বলেন: অত্র আয়াতে অবাধ্যদেরকে আল্লাহর সাক্ষাত থেকে বঞ্চিত রাখার বিশেষ একটি বিশেষত্ব রয়েছে। আর সে বিশেষত্বটি হলো: আল্লাহ পাপাচারীদের উপর রাগ করে তাঁর দর্শন থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে লাঞ্ছিত করার ঘোষণা দিয়েছেন। যদি মুমিনরাও সেদিন আল্লাহর দর্শন লাভ করতে না পারে, তাহলে আয়াতের এ বিশেষত্ব আর বাকী থাকে না। ফলে মুমিন ও কাফির সমান হয়ে যায়, আয়াতের উদ্দেশ্য ম্লান হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন মুমিনরা বিশেষ একটি সময়ে আল্লাহ তায়ালাকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করবেন, কিন্তু পাপাচারীরা তাঁকে দেখা থেকে বঞ্চিত হবে। (*আল-তাফসীর আল-কাবীর*, রাযী: ৩১/৮৯)। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন: কিয়ামতে আল্লাহকে তাঁর অনুগত বান্দারা দেখবেন অত্র আয়াত তার দলীল। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/১২৪)। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতের স্বপক্ষে সূরা ক্বিয়ামাহ এর (২২-২৩) নাম্বার আয়াত, সূরা ইউনুস এর ২৬ নাম্বার আয়াত এবং সূরা ক্বাফ এর ৩৫ নাম্বার আয়াত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জারীর (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে, তিনি বলেন:

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَيْلَةَ البَدْرِ، فَقَالَ: "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا، لاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ" [صحيح البخاري: ٧٤٣٦].

অর্থাৎ: "একদা পূর্ণিমার রাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের কাছে বের হয়ে এসে বললেন: শীঘ্রই তোমরা তোমাদের রবকে ক্বিয়ামতের দিন দেখতে পাবে, যেমন এ চাঁদটিকে তোমরা দেখছো এবং একে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধে হচ্ছে না"। (*সহীহ আল-বুখারী*: ৭৪৩৬)।

(খ) অপরদিকে মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের মতে, আল্লাহর দর্শন দুনিয়া এবং আখিরাতে কোথাও সম্ভব নয়। তারা তাদের স্বপক্ষে কোরআনের নিম্নের আয়াত দিয়ে দলীল প্রদান করেন:

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة الأعراف:١٤٣].

অর্থাৎ: "মূসা বললো: হে আমার রব! আমাকে দেখা দাও, আমি স্বচক্ষে তোমার দিকে তাকাই। আল্লাহ বললেন: না, তুমি কখনও আমাকে দেখতে পাবে না, বরং তুমি পাহাড়টির দিকে তাকাও, তা যদি স্বস্থানে স্থির থাকতে পারে, তাহলে তুমি আমাকে অবশ্যই দেখতে পাবে" (*সূরা আল-আরাফ*: ১৪৩) । মুতাজিলা আলেমগণ মনে করেন অত্র আয়াতে 'লান' শব্দটি এসেছে, যার অর্থ হলো: কখনও না। এটা দুনিয়া ও আখিরা উভয় জগতের জন্য ব্যাপকার্থে এসেছে। তাদের এ মতের জবাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আলেমদের পক্ষ থেকে দুইটি জবাব পাওয়া যায়:

(ক) আয়াতের অর্থ হলো: তুমি দুনিয়াতে চর্মচক্ষু দিয়ে কখনও আমাকে দেখতে পাবে না, এখানে আখেরাতকে বুঝানো হয়নি।

(খ) যদি আল্লাহকে দেখা সর্বকালের জন্য অসম্ভব হতো, তাহলে মূসা (আ.) নবী হয়ে তাঁকে দেখার জন্য আরজু পেশ করতেন না। (*মোহাম্মদ ইবনু সালিহ আল ওসাইমিন পেইজ থেকে*) ।

আয়াতাবলীর আমল:

(ক) "পাপাচারীদের আত্মা ও আমলনামা মৃত্যুর পর আকাশ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সপ্তম যমীনের তলদেশে ইবলিশের গাল খ্যাত 'সিজ্জীন' এ সংরক্ষিত থাকে" সর্বদা এ কথা স্মরণ করে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা।

(খ) কোন ধরণের পাপ কাজ সংঘটিত হলে সাথে সাথে ক্ষমাপ্রার্থণা ও তাওবা করার মাধ্যমে অন্তর থেকে পাপের কালো দাগ মুছে ফেলা।

(গ) "কোরআন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত অহী" এ কথা বিশ্বাস করা এবং তা সম্পর্কে কোন ধরণের বিরূপ মন্তব্য না করা।

﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (١٨) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ (١٩) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (٢٠)
يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ (٢١) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (٢٢) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (٢٣) تَعْرِفُ فِي
وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (٢٤) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (٢٥) خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ
فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (٢٦) وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (٢٧) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (٢٨)﴾
[سورة المطففين:١٨–٢٨].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়: পুণ্যকাজের সংরক্ষণ এবং পুণ্যবানদের পুরষ্কার।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১৮	না, (এ কাজ) কখনো ঠিক নয়,	অবশ্যই	পুণ্যবানদের আমলনামা	ইল্লিয়্যীন এ থাকবে।	১৯
	كَلَّا	إِنَّ	كِتَابَ الْأَبْرَارِ	لَفِي عِلِّيِّينَ	
তুমি কি জানো	ইল্লিয়্যীন কি?	২০	লিখিত কিতাব।	২১	আর তা তদারকি করে থাকেন
وَمَا أَدْرَاكَ	مَا عِلِّيُّونَ		كِتَابٌ مَرْقُومٌ		يَشْهَدُهُ
(আল্লাহর) নিকটবর্তী (ফেরেশতা) গণ।	২২	অবশ্যই	পুণ্যবানগণ	পরম স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবেন।	
الْمُقَرَّبُونَ		إِنَّ	الْأَبْرَارَ	لَفِي نَعِيمٍ	
২৩	সুসজ্জিত আসনে বসে	তারা অবলোকন করবে।	২৪	তুমি দেখতে পাবে	তাদের চেহারায়
	عَلَى الْأَرَائِكِ	يَنْظُرُونَ		تَعْرِفُ	فِي وُجُوهِهِمْ
স্বাচ্ছন্দ্যের লাবণ্যতা।	২৫	তাদেরকে পান করানো হবে	ইনটেক বোতল থেকে বিশুদ্ধ পানি।		
نَضْرَةَ النَّعِيمِ		يُسْقَوْنَ	مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ		
২৬	যার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে	মিসক দিয়ে,	আর এ বিষয়ে	প্রতিযোগিতা করা উচিৎ	
	خِتَامُهُ	مِسْكٌ	وَفِي ذَلِكَ	فَلْيَتَنَافَسِ	
প্রতিযোগীদের।	২৭	আর তার সাথে মিশ্রন হবে	তাসনীমের।	২৮	তা (তাসনীম) একটি ঝর্ণা
الْمُتَنَافِسُونَ		وَمِزَاجُهُ	مِنْ تَسْنِيمٍ		عَيْنًا
যেখান থেকে পান করবে	নৈকট্যপ্রাপ্তগণ।				
يَشْرَبُ بِهَا	الْمُقَرَّبُونَ				

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

পাপাচারীদের কুকর্মের সংরক্ষণ এবং তার ভয়াবহ পরিণতি বর্ণনার পর অত্র আয়াতাবলীতে পুণ্যবানদের সৎকর্মের সংরক্ষণ এবং তার পুরষ্কার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন: সাবধান! কুকর্মে জড়িয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখী হওয়া তাদের জন্য

কখনও ঠিক নয়, নিশ্চয় পুণ্যবানদের সৎকর্ম 'ইল্লিয়্যীন' এ সংরক্ষিত থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা নিজেই প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে 'ইল্লিয়্যীন' এর পরিচয় দিয়ে বলেন: হে আল্লাহর নবী! আপনি কি জানেন 'ইল্লিয়্যীন' কি? তা হলো: সপ্তম আকাশে আরশের নীচে লিখিত একটি ফলক, যেখানে পুণ্যবানদের মৃত্যুর পর তাদের রুহ এবং আমলনামা সংরক্ষণে রাখা হয়। আল্লাহ তায়ালার নিকটতম ফেরেশতাগণ তার তদারকি করেন।

নিশ্চয় পুণ্যবানদের জন্য কিয়ামতের দিন জান্নাত রয়েছে। সেখানের অন্যতম নেয়ামতাবলীর মধ্যে দুইটি নেয়ামত হলো:

(ক) সুসজ্জিত আসন: যার উপর বসে তারা আশেপাশের সবকিছু অবলোকন করবেন। সেদিন তাদের চেহারায় স্বাচ্ছন্দ্যের লাবণ্যতা ফুটে উঠবে।

(খ) তাসনীম মিশ্রিত পানি: ইনটেক বোতলে বিশুদ্ধ মেনারাল পানি তাদেরকে পান করানো হবে, যার মুখ মিস্ক দিয়ে বন্ধ করা থাকবে। এ জাতীয় পানির সাথে জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঝর্ণাধারা 'তাসনীম' (যার পানি কেবল আল্লাহর সবচেয়ে নিকটতম বান্দারা পান করবেন) থেকে পানি মিশ্রন করা হবে। সুতরাং জান্নাতের এ নেয়ামত লাভের জন্য সকলকে ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করা উচিৎ। (*কুরতুবী*: ১৯/২৬২, *আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫৩৯, *আল-মোন্তাখাব*: ৮৯২-৮৯৩, *আল-তাফসীর আল-মোয়াস্সার*: ১/৫৮৮) ।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿لَفِي عِلِّيِّينَ﴾ 'অবশ্যই ইল্লিয়্যীন এ থাকবে' আয়াতাংশে 'ইল্লিয়্যীন' দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে সকল ওলামা একমত যে, 'ইল্লিয়্যীন' উর্ধ্বজগতের একটি স্থান, যেখানে পুণ্যবানদের রুহ এবং সৎআমল তাদের মৃত্যুর পর সংরক্ষিত থাকবে। তবে উর্ধ্বজগতের কোন স্থান, তা নির্দিষ্টভাবে বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম ফখরুদ্দীন আল-রাযী (র.) তার তাফসীর গন্থে আলেমদের অনেকগুলো মত উল্লেখ করেছেন:

(ক) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন: 'ইল্লিয়্যীন' চতুর্থ আকাশে অবস্থিত, তার থেকে আরেকটি বর্ণনায় এসেছে তা সপ্তম আকাশে অবস্থিত।

(খ) ইমাম ক্বাতাদাহ এবং মুকাতিল (র.) বলেছেন: 'ইল্লিয়্যীন' নামক পাথরের ফলকটি সপ্তম আকাশের উপরে আরশের ডান পাশে অবস্থিত।

(গ) ইমাম দাহ্হাক (র.) বলেন: 'ইল্লিয়্যীন' সপ্তম আকাশে জান্নাতুল মাওয়ার ভিতরে সিদরাতুল মুন্তাহায় অবস্থিত। (*আল-তাফসীর আল-কাবীর*, রাযী: ৩১/৯০) ।

(ঘ) আবার কেউ কেউ বলেছেন: 'ইল্লিয়্যীন' সপ্তম আকাশে আরশের নীচে অবস্থিত। (*তাফসীর আল-কুরতুবী*: ১৯/২৬২) ।

﴿كِتَابٌ مَرْقُومٌ﴾ 'লিখিত কিতাব', অত্র আয়াতাংশে আল্লাহ তায়ালা 'ইল্লিয়্যীন' এর সজ্ঞায় বলেন: তা হলো: 'লিখিত কিতাব'। 'লিখিত কিতাব' দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে ইমাম ফখরুদ্দীন আল-রাযী তার তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, 'লিখিত কিতাব' দ্বারা দুইটি উদ্দেশ্য হতে পারে: (ক) পুণ্যবানদের আমলনামা খচিত পাথরের ফলক এবং (খ) পুণ্যবানদের আমলনামা ও প্রতিদান খচিত পাথরের ফলক। এর ধরণ সম্পর্কে ইমাম মুক্বাতিল (র.) বলেন:

পুণ্যবানদের আমল ও প্রতিদান আরশের চৌকাঠের সাথে লেখা থাকবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: তাদের আমল ও প্রতিদান খচিত জাবারজাদ পাথরের ফলকটি আরশের নীচে ঝুলান্ত থাকবে। (*আল-তাফসীর আল-কাবীর*, ইমাম রাযী: ৩১/৯১) । সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ব 'ইল্লিয়্যীন' এর সংজ্ঞার সাথে তাফসীরকারকদের কথার সাথে কোন বৈপরীত্য নেই।

﴿الْمُقَرَّبُونَ﴾ 'নিকটবর্তীগণ', আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? একুশ নাম্বার আয়াতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ফেরেশতাগণ। (*তাফসীর আল-নাসাফী*: ৩/৬১৬, *তাফসীর গরীব আল-কোরআন*, আল-কাওয়ারী: ৮৩/২১, *তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/১২৫) । সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে: "ফেরেশতাগণ তার তদারকি করবে"।

অনুরূপভাবে (২৮) নাম্বার আয়াতেও একই শব্দ এসেছে। সকল তাফসীরকারকগণের মতে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণ, যাদেরকে সূরা ওয়াক্বিয়াতে 'সাবিকুন' বা অগ্রগামী বলা হয়েছে। (তাফসীর আল-মুনীর: ৩০/১২৫) । সুতরাং (২৮) নাম্বার আয়াতের অর্থ হবে: 'তাসনীম' এর পানি কেবল আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণ পান করবেন।

﴿رَحِيقٍ﴾ 'রাহীক্ব', আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'এমন খাটি স্বচ্ছ মদ, যাতে নেশা এবং মাতলামির লেশমাত্র থাকবে না'। (তাফসীর আল-কুরতুবী: ১৯/২৬৪) ।

﴿خِتَامُهُ مِسْكٌ﴾ 'যার শেষ হলো মিস্ক', আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে ইমাম কুরতুবী (র.) তিনটি মত উল্লেখ করেছেন: (ক) 'রাহীক্ব' নামক পানীয় পান করার সময় শেষ মুহূর্তে মিস্ক এর সুগন্ধ পাবে। (খ) সংরক্ষিত রাখার জন্য তা 'মিস্ক' দিয়ে সিলগালা করা থাকবে। (গ) পান করার পরে তা 'মিস্ক' দিয়ে সিলগালা করা হবে। (তাফসীর কুরতুবী: ১৯/২৬৫) ।

﴿تَسْنِيمٍ﴾ 'তাসনীম', অত্র শব্দটি 'সানাম' আরবী শব্দ থেকে এসেছে। বাংলায় যার অর্থ হলো: কোন কিছুর উপরিভাগ। এ শব্দটি কোরআনে একবারই এসেছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: জান্নাতের উচু স্থানে বিদ্যমান ঝর্ণা, যা জান্নাতের সবচেয়ে সেরা পানীয় হবে। জান্নাতীগণ দুই ধরণের হবে:

(ক) 'স্যাবিকূন' যাদেরকে 'মুক্বাররাবূন' বলা হয় (সূরা ওয়াক্বিয়াহ: ১০-১১)। এরা মানের দিক থেকে সেরা জান্নাতী, যাদেরকে আমরা (ভি.ভি.আই.পি) বলতে পারি। তাদেরকে পানীয় প্রদান করা হবে 'তাসনীম' ঝর্ণা থেকে।

(খ) 'আসহাবুল ইয়ামীন' (সূরা ওয়াক্বিয়াহ: ২৭) । এরা দ্বিতীয় মানের জান্নাতী। 'রাহীক্ব" বা বিশুদ্ধ পানির সাথে 'তাসনীম' থেকে পানি মিশ্রন করে তাদের পানীয় বানানো হবে। একে বলা হয় 'মাউন মাসকূব'। (*ফাতহুল ক্বাদীর*, *শাওকানী*: ৫/৪৮৮-৪৮৯) ।

অত্র আয়াতাবলীর সাথে পূর্ববর্তী আয়াতাবলীর সম্পর্ক:

পূর্ববর্তী আয়াতাবলীতে পাপাচারীদের রুহ ও কৃতকর্ম 'সিজ্জীন' এ সংরক্ষিত থাকা এবং তাদের ভয়াবহ পরিণতি বর্ণনার পর অত্র আয়াতাবলীতে পুণ্যবানদের রুহ ও কৃতকর্ম 'ইল্লিয়্যীন' এ

সংরক্ষণ করা এবং তাদের পুরস্কারের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং দুই গ্রুপ আয়াতের মধ্যে সম্পূরক সম্পর্ক। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/১২৫-১২৬)।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। অত্র সূরার (১৮-২১) নাম্বার আয়াতে, পুণ্যবানদের আত্মা এবং আমলনামা তাদের মৃত্যুর পর 'সিদরাতুল মোন্তাহা' অথবা আরশের নীচে ঝুলান্ত জাবারজাদ পাথরের ফলকে ফেরেশতাদের তদারকিতে রাখা হয়। এ সম্পর্কে একটি হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) অত্র সূরার (১৯) নাম্বার আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কা'ব আল-আহবার (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বলেন:

"إِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ إِذَا قُبِضَتْ عُرِجَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَيُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتَلَقَّاهُ الْمَلَائِكَةُ بِالْبُشْرَى، حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى الْعَرْشِ، وَتَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ فَيَخْرُجُ لَهَا مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ رَقٌّ فَيُخْتَمُ، وَيُرْقَمُ، وَيُوضَعُ تَحْتَ الْعَرْشِ بِمَعْرِفَةِ النَّجَاةِ لِلْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ﴾ [المطففين: ١٨-٢٠] (الزهد لابن المبارك: ١٢٢٣).

অর্থাৎ: (নিশ্চয় মুমিনের আত্মা কবজ করে আকাশের দিকে বহণ করে আনা হয়। অতঃপর তার জন্য আকাশের দরজা খুলে দেওয়া হয়। ফেরেশতাগণ সুসংবাদ প্রদান পূর্বক গ্রহণ করে তাকে আরশের কাছে পৌছিয়ে দেন। অতঃপর তার জন্য আরশের নীচ থেকে একটি চামড়া বের হয়। অতঃপর তাতে নাম্বারিং এবং কিয়ামতের দিন হিসাবের পরে মুক্তির বিষয় লিখে আরশের নীচে রাখা হয়। এটাই হলো "কখনও নয়, বরং পুণ্যবানদের আমলনামা 'ইল্লিয়্যীন' এ রাখা হয়। তুমি কি জানো 'ইল্লিয়্যীন কি? তা হলো: লিখিত ফলক" আয়াতের ব্যাখ্যা। (*আল-যুহদ লি ইবনি মুবারক*: ১২২৩)। এ হাদীসের সমর্থনে সহীহ মুসলিমের একটি মাওকুফ (মারফু হুকমী) হাদীস রয়েছে, আবু হুরাইরা (রা.) বলেন:

"إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا» - قَالَ حَمَّادٌ: فَذَكَرَ مِنْ طِيبِ رِيحِهَا وَذَكَرَ الْمِسْكَ - قَالَ: " وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَقُولُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ "، (صحيح مسلم: ٢٨٧٢).

অর্থাৎ: "যখন মুমিনের আত্মা বের হয়, তখন দুইজন ফেরেশতা তা গ্রহণ করে উর্ধ্ব জগতে আরোহণ করেন। (রাবী হাম্মাদ (র.) বলেছেন: অতঃপর আবু হুরায়রা (রা.) রুহ থেকে মিস্‌কের সুগন্ধি বের হওয়ার কথা উল্লেখ করলেন)। তিনি বলেছেন: এবং আকাশের অধিবাসীরা বলেন: পৃথিবী থেকে পবিত্র আত্মা এসেছে, আপনার উপর এবং আপনি যে শরীরে বাস করেছিলেন তার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। অতঃপর তাকে নিয়ে রবের কাছে যাওয়া হয়। তখন আল্লাহ বলেন: তাকে শেষ সীমান্তে নিয়ে যাও" (*সহীহ মুসলিম*: ২৮৭২)। ইমাম সুয়ূতী (র.) ক্বাজী ইয়াজ (র.) এর বরাতে বলেন: 'শেষ সীমান্ত' দ্বারা 'সিদরাতুল মোন্তাহা' কে বুঝানো হয়েছে। (*সরহে সহীহ মুসলিম*, নাওয়াভী: ১৭/২০৫)।

২। অত্র সূরার (২২-২৫) নাম্বার আয়াতে, পুণ্যবানদের জন্য মহা পুরষ্কার জান্নাতের নিয়ামত বর্ণনার পাশাপাশি তার তিনটি ধরণ তুলে ধরা হয়েছে:

(ক) তারা সোফায় বসে চতুর্দিকের দৃষ্টিনন্দন পরিবেশ অবলোকন করবেন।
(খ) তাদের চেহারায় স্বাচ্ছন্দ্যের লাবণ্যতা ফুটে উঠবে।
(গ) ইনটেক বোতলে ‘তাসনীম’ মিশ্রিত বিশুদ্ধ পানি তাদের জন্য প্রস্তুত থাকবে।

(*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/১২৮-১২৯) ।

৩। অত্র সূরার (২৫-২৮) নাম্বার আয়াতে সাধারণ জান্নাতীদের পানীয় ‘রাহীক্ব’ বা ‘মাউন মাসকুব’ এর চারটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে:
(ক) সংরক্ষণের জন্য পানির বোতল ইনটেক থাকবে।
(খ) ‘মিস্‌ক’ বা কস্তুরী দিয়ে সিলগালা করা থাকবে।
(গ) এ ধরনের পানীয় পাওয়ার জন্য দুনিয়াতে সৎআমলের প্রতি প্রতিযোগিতা করা উচিৎ।
(ঘ) এর সাথে প্রথম স্তরের জান্নাতীদের পানীয় ‘তাসনীম’ এর মিশ্রণ থাকবে।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, জুহাইলী: ৩০/১২৯) ।

৪। সূরা ওয়াকিয়াহ এর (১০-৪০) নাম্বার আয়াত এবং অত্র সূরার (২৫-২৮) নাম্বার আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, জান্নাতীগণ মানের দিক থেকে দুই স্তরের হবে এবং মানের পার্থক্যের কারণে জান্নাতে তাদের সুযোগ-সুবিধারও কিছু পার্থক্য থাকবে। যা সূরা ওয়াক্বিয়াহ এ বর্ণিত দুই শ্রেনীর জান্নাতীগণের খাবার-পাণীয় এর তালিকা থেকে পরিলক্ষিত হয়। (তাফসীর আল-কাবীর, রাযী: ৩১/৯৩)। অনুরূপভাবে, এখানে (২৫-২৮) নাম্বার আয়াতেও বলা হয়েছে যে, ফার্ষ্ট ক্লাস জান্নাতীদেরকে ‘তাসনীম’ এবং সেকন্ড ক্লাস জান্নাতীদেরকে ‘রাহীক্ব’ নামক পানীয় দেওয়া হবে।
৫। অত্র সূরার (২৬) নাম্বার আয়াত থেকে বুঝা যায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জণের জন্য যেমন প্রতিযোগিতা মূলক সৎআমল করা যায়, তেমনিভাবে জান্নাতের নেয়ামত পাওয়ার জন্যও দুনিয়াতে সৎআমলের জন্য প্রতিযোগিতা করা যাবে, এর কারণে কাউকে জান্নাতের প্রতি লোভী, অথবা স্বার্থপর বলা যাবে না। যদিও আমাদের সমাজের অনেককেই এমনটা বলতে শুনা যায়। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

আয়াতাবলীর আমল:

(ক) “পুণ্যবানদের আত্মা ও আমলনামা মৃত্যুর পর আরশের সাথে ঝুলান্ত জাবারযাদ পাথরের একটি ফলকে আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের তদারকিতে সংরক্ষণ করার মাধ্যমে তাদেরকে সম্মানিত করা হয়, এ কথা স্মরণ রেখে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং বেশী বেশী সৎআমল করা।
(খ) জান্নাতের নিয়ামত লাভের জন্য দুনিয়াতে সৎআমলের প্রতিযোগিতা করা।
(গ) জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর লাভের জন্য চেষ্ট করা।

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠)
وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (٣١) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ (٣٢) وَمَا
أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (٣٣) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٤) عَلَى الْأَرَائِكِ
يَنْظُرُونَ (٣٥) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦)﴾ [سورة المطففين: ٢٩–٣٦].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়: কাফিররা এ পৃথিবীতে মুমিনদেরকে নিয়ে উপহাস করে, আর ঈমানদারগণ কাফেরদেরকে নিয়ে উপহাস করবে আখেরাতে।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

২৯	নিশ্চয়	যারা	অপরাধ করেছিল	তারা	মুমিনদেরকে নিয়ে	(দুনিয়ায়) উপহাস করতো।
	إِنَّ	الَّذِينَ	أَجْرَمُوا	كَانُوا	مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا	يَضْحَكُونَ
৩০	এবং যখন	তারা গমণ করতো	তাদের পাশ দিয়ে,	তখন তারা চোখ টেপাটেপি করতো।		
	وَإِذَا	مَرُّوا	بِهِمْ	يَتَغَامَزُونَ		
৩১	আর যখন	ফিরে যেতো	নিজেদের লোকদের কাছে,	তখন তারা ফিরতো	উৎফুল্ল হয়ে।	
	وَإِذَا	انْقَلَبُوا	إِلَى أَهْلِهِمُ	انْقَلَبُوا	فَكِهِينَ	
৩২	এবং যখন	তারা তাদেরকে দেখতো,	তখন তারা বলতো:	নিশ্চয়	তারা	অবশ্যই পথভ্রষ্ট।
	وَإِذَا	رَأَوْهُمْ	قَالُوا	إِنَّ	هَؤُلَاءِ	لَضَالُّونَ
৩৩	অথচ তাদেরকে (কাফিরদেরকে) পাঠানো হয়নি	তাদের (মুমিনদের) উপর	তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে।			
	وَمَا أُرْسِلُوا	عَلَيْهِمْ	حَافِظِينَ			
৩৪	অতএব, আজ	মুমিনরা	কাফেরদেরকে নিয়ে	হাসবে।	৩৫	উঁচু সোফার উপর বসে
	فَالْيَوْمَ	الَّذِينَ آمَنُوا	مِنَ الْكُفَّارِ	يَضْحَكُونَ		عَلَى الْأَرَائِكِ
তারা অবলোকন করতে থাকবে।	৩৬	কাফিররা প্রতিফল পেল তো	তাদের কৃতকর্মের জন্য?			
يَنْظُرُونَ		هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ	مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ			

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

পাপাচারীদের কুকর্মের সংরক্ষণ ও তার ভয়াবহ পরিণতি এবং মুমিনদের সৎকর্মের সংরক্ষণ ও তার পুরষ্কার বর্ণনার পর সূরার উপসংহারে "দুনিয়াতে কাফিররা মুমিনদেরকে তুচ্ছ ভেবে তাদের সাথে উপহাসমূলক আচরণ করতো, একই আচরণ আল্লাহ তায়ালা আখিরাতে মুমিনগণকে কাফেরদের সাথে করার সুযোগ দিবেন" বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নিশ্চয় আবু জাহল, ওতবা, ওয়ালিদ, শায়বা এবং অন্যান্য কাফিররা বেলাল, আম্মার, সুহাইব, খুবাইব এবং অন্যান্য মুমিনদের সাথে সাক্ষাৎ হলে তাদেরকে নিয়ে উপহাস করতো। মক্কার

অলিগলিতে কিংবা হারাম শরীফের আশেপাশে কাফিরদের সাথে মুমিনদের সাক্ষাত হলে তারা অহংকারপূর্বক একে অপরকে নিজ পলক ও ভ্রূ দ্বারা ইঙ্গিত করে মুমিনদের অবজ্ঞা করতো এবং তাদের দ্বীনের ব্যাপারে খোঁটা দিতো। অনুরূপভাবে নিজ গৃহে ফিরে তারা নিজেরা যার উপর আছে সেটাকেই সঠিক মনে করে উৎফুল্ল থাকতো, আর মুমিনদেরকে দেখলে বলতো: তারা পূর্ব পুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে মোহাম্মাদের ধর্ম গ্রহণ করার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।
কাফেরদের এহেন আচরণের উত্তরে আল্লাহ তায়ালা বলেন: তাদেরকে মুমিনদের উপর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পাঠানো হয়নি, কেন তারা অনধিকার চর্চা করে?! আর আজ কিয়ামতের দিন মুমিনরা জান্নাতে সুসজ্জিত সুউচ্চ সোফায় বসে জাহান্নামে কাফেরদের করুণ দশা দেখে উপহাস করবে, যেমনটা দুনিয়াতে তারা মুমিনদের সাথে করতো। কাফিররা মুমিনদের সাথে দুনিয়াতে যে অযথা উপহাস করতো, তারা কি তার যথাযথ প্রতিফল পেয়েছে? হ্যা, তারা যথার্থ প্রতিদান পেয়েছে। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫৪১, আল-তাফসীর আল-মুনীর: ৩০/১৩৩-১৩৪, *আল-মোন্তাখাব*: ৮৯৩, *আল-তাফসীর আল-মোয়াস্সার*: ১/৫৮৯) ।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ 'নিশ্চয় যারা অপরাধ করে', আয়াতাংশ দ্বারা মক্কার মুশরিক নেতৃবৃন্দ আবু জাহল, ওয়ালিদ ইবনু মুগীরাহ এবং আসী ইবনু ওয়াইল আল-সাহমী নামক অপরাধীদেরকে বুঝানো হয়েছে। তারা আম্মার, সুহাইব, বেলাল (রা.) প্রমুখ দুর্বল মুসলমানদেরকে দেখে উপহাস করতো। (*আল-তাফসীর আল-কাবীর*: ৩১/৯৪) ।

﴿وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ﴾ "আর যখন তারা তাদের পাশ দিয়ে গমণ করতো, তখন তারা চোখ টেপাটেপি করতো", অত্র আয়াতের দুইটি অর্থ হতে পারে:
(ক) যখন মুমিনরা কাফেরদের পাশ দিয়ে গমণ করতো, তখন কাফিররা চোখ টেপাটেপি করতো। (*আল-মোন্তাখাব*: ৮৯৩) ।
(খ) যখন কাফিররা মুমিনদের পাশ দিয়ে গমণ করতো, তখন কাফিররা চোখ টেপাটেপি করতো। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/১৩১) ।
দুইটি অর্থকে সমন্বয় করে বলা যায়: কাফিরদের সাথে মুমিনদের সাক্ষাত হলে, তারা চোখ টেপাটেপি করে মুমিনদেরকে অবজ্ঞা করতো। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

﴿وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ﴾ 'আর কাফিররা উৎফুল্ল হয়ে নিজ পরিবারের কাছে ফিরতো', তাদের উৎফুল্ল হওয়ার দুইট কারণ:
(ক) তারা মুমিনদেরকে উপহাস করতে পেরে উৎফুল্ল অনুভব করতো।
(খ) তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের ধর্মের উপর থাকতে পেরে উৎফুল্ল অনুভব করতো।
অত্র আয়াতের ক্ষেত্রে দুইটি কারণই প্রযোজ্য হতে পারে। তবে, দ্বিতীয় কারণটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত; কারণ পরের আয়াতে বলা হয়েছে: তারা নিজেদেরকে সঠিক ধর্মের উপর আছে দাবী করে মুমিনদেরকে পথভ্রষ্ট বলতো। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

﴿فَٱلْيَوْمَ﴾ 'অতএব, আজ', সকল তাফসীরকারকগণ একমত যে, অত্র আয়াতাংশে 'আজ' দ্বারা 'কিয়ামতের দিন' কে বুঝানো হয়েছে। (আল-কুরতুবী: ১৯/২৬৮) ।

আয়াতাবলী অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আলী (রা.) সহ একদল মুসলিমকে দেখে মুনাফিকরা চোখের ইশারায় উপহাস ও হাসাহাসি করছিল। অতঃপর মুনাফিকরা তাদের সঙ্গী-সাথীদের সাথে সাক্ষাতে বলতে লাগলো: আজ কিছু টাক মাথার সাথে সাক্ষাত হয়েছে। এ খবর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে পৌছার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াতাবলী অবতীর্ণ করে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। (*আল-তাফসীর আল-কাবীর*: ৩১/৯৪) ।

অত্র আয়াতাবলীর সাথে পূর্ববতী আয়াতাবলীর সম্পর্ক:

পূর্বের আয়াতাবলীতে আখেরাতে পাপিষ্ঠ এবং পুণ্যবানদের অবস্থা তুলে ধরার পর অত্র আয়াতাবলীতে আল্লাহ তায়ালা "কাফিররা মুমিনদের সাথে দুনিয়াতে যে অযথা উপহাস করে, তারা তার যথাযথ প্রতিফল আখেরাতে পাবে" বিষয়ে আলোচনা করেছেন। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/১৩২) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। অত্র সূরার (২৯-৩৩) নাম্বার আয়াতে, মুমিনদের সাথে অবাধ্য পাপিষ্ঠদের চারটি ঘৃণ্য আচরণের কথা তুলে ধরে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাদের উপযুক্ত জবাব দেওয়া হয়েছে:

(ক) তারা মুমিনদেরকে নিয়ে হাসি-তামাশা করে।

(খ) তারা মুমিনদের সাথে সাক্ষাত হলে চোখের ইশারায় ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপ করে।

(গ) তার মুমিনদের সাথে ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপের কথা সঙ্গীদের সাথে শেয়ার করে মঝা নেয়।

(ঘ) মুমিনরা তাদের মতাদর্শের না হওয়ার কারণে তাদেরকে পথভ্রষ্ট আখ্যা দেয়।

অপরাধীদের এহেন আচরণের উত্তরে আল্লাহ তায়ালা বলেন: তাদেরকে মুমিনদের উপর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পাঠানো হয়নি, কেন তারা অনধিকার চর্চা করে?! বরং নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করাই তাদের দায়িত্ব। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/১৩৩) ।

২। সূরার সর্বশেষ তিনটি আয়াত তথা (৩৪-৩৬) নাম্বার আয়াতে, দুই পদ্ধতিতে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে শান্তনা দিয়েছেন:

(ক) যারা দুনিয়াতে মুমিনদেরকে নিয়ে উপহাস করতো, আখেরাতে মুমিনরাও তাদেরকে নিয়ে উপহাস করার সুযোগ পাবে।

(গ) আল্লাহ তায়ালা অবাধ্যদেরকে কটাক্ষপূর্বক বলবেন: তারা মুমিনদের সাথে দুনিয়াতে যা করেছিল তার যথার্থ প্রতিফল পেয়ে গেছে। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/১৩৩-১৩৪) ।

৩। যারা মুসলমানদেরকে সহ্য করতে পারে না এবং তাদেরকে দেখে উপহাস ও ব্যাঙ্গ করে, তাদের উচিৎ উল্লেখিত আয়াতাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সংশোধন হওয়া। একজন খাটি মুসলিম কখনও আল্লাহ প্রদত্ত নিয়মের বাইরে যেতে পারে না। ফলে, তারা মিথ্যা বলে না,

অন্যের মাল অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে না, লেনদেনে কাউকে ঠকায় না, অন্যায়ভাবে কারো উপর প্রভাব বিস্তার করে না, কাউকে গালি দেয় না, কারো পিছনে লেগে থাকে না, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে না এবং কারো দোষ অন্বেষণ করে না। এ সুযোগে দুনিয়া অন্বেষী মহল কাফের, মুশরিক, পাপিষ্ট এবং আল্লাহর অবাধ্যরা মুসলমানদেরকে দুর্বল মনে করে সর্বদাই তাদেরকে ঘায়েল করার চেষ্টায় থাকে। মুমিনদের সাথে এ ধরণের আচরণ আমাদের সমাজে আজকাল খুব বেশী পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন তোমরা ক্ষণিকের এ দুনিয়ায় স্বল্প সময়ের জন্য মুসলমানদেরকে নিয়ে উপহাস করছো, আর মুসলমানরা আখিরাতে জান্নাতের সুউচ্চ এবং সুসজ্জিত সোফায় বসে জাহান্নামের জলন্ত আগুনে তোমাদের দগ্ধ হওয়ার দৃশ্য দেখে অনন্তকাল ধরে উল্লাস করবে এবং তোমাদেরকে নিয়ে উপহাস করবে। সুতরাং সময় থাকতে সাবধান হয়ে যাও। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

৪। আল্লাহ তায়ালা খাটি মুসলমানদেরকে আখেরাতে সম্মানিত করবেন এবং ইসলামের দুশমনদেরকে অপমানিত করবেন। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫৪২) ।

৫। (৩২-৩৩) আয়াত থেকে বুঝা যায়, অপরাধী পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় সর্বদা তিনটি কাজ করে:

(ক) হক্কপন্থীদের উপর অন্যায়ভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

(খ) ক্ষমতার জোড়ে নিজেদেরকে হক্কপন্থী সাব্যস্ত করে।

(গ) হক্বপন্থীদেরকে অন্যায়ভাবে পথভ্রষ্টতার তোকমা লাগিয়ে দুর্বল করার চেষ্টা করে।

(আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন) ।

আয়াতাবলীর আমল:

ইসলাম সর্বদা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলার কথা বলে। কোন অবস্থাতেই সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকে সমর্থন করে না। কোরআনের দিকে গবেষণার দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যাবে তার প্রতিটি আয়াতই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শান্তির কথা বলেছে। মানবজাতিকে এমন কাজ করার প্রতি উৎসাহিত করেছে, যা পালনের মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকবে এবং এমন কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে, যা করা হলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে। উল্লেখিত আয়াতাবলীতেও দেখতে পাই আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে নিম্নের তিনটি বিষয় থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, যা করলে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে। যেমন:

(ক) কাউকে নিয়ে উপহাস বা কটাক্ষ করা।

(খ) কারো উপর অন্যায়ভাবে প্রভাব বিস্তার করা।

(গ) কাউকে পথভ্রষ্টের তোকমা দেওয়া।

সুতরাং সকলের উচিৎ উপরোল্লিখিত তিনটি কাজ থেকে বিরত থাকা।

(سُورة الانْشِقَاق)

সূরা আল-ইনশেক্বাক্ব এর পরিচয়:

সূরার নাম:

ইবনু আশুর (র.) তার তাফসীর গ্রন্থে অত্র সূরার দুইটি নাম উল্লেখ করেছেন:

(ক) ‘সূরাতু ইজাস সামাউন সাক্কাত’ এ নামটি সাহাবাদের মাঝে প্রশিদ্ধ ছিল।

(খ) ‘সূরাতু ইনশেক্বাক্ব’ তাফসীরকারকগণ তাদের তাফসীর গ্রন্থে এবং সকল মুসহাফে অত্র নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। (*তাহরীর ওয়াত তানভীর*, ইবনু আশুর: ৩০/২১৭) ।

এছাড়াও অত্র সূরার আরো একটি নাম পাওয়া যায়:

(গ) ‘সূরাতু আস সাফাক্ব’ (তাফসীর মওজুয়ী, মোস্তফা মুসলিম: ১০/৭৩) ।

আলোচ্যবিষয়: কিয়ামতের ভয়াবহতা এবং মানুষ দুই দলে বিভক্ত হওয়ার দৃশ্য।

সূরার ফযিলত:

(ক) অত্র সূরা তেলাওয়াতকারী কিয়ামতের দিন শংকামুক্ত থাকবে। যেমন: আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ" (الترمذي: ٣٣٣٣).

অর্থাৎ: “যে ব্যক্তি কিয়ামতকে স্বচক্ষে দেখে খুশী থাকতে চায়, সে যেন সূরা তাকভীর, সূরা ইনফিতার এবং সূরা ইনশেক্বাক্ব পাঠ করে” (*সুনান আল-তিরমিযী*: ৩৩৩৩) । ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন: হাদীসটি একটি সনদে বর্ণিত হয়েছে, হাদীসের হুকুম ‘হাসান’। শায়খ আলবানী (র.) হাদীসটিকে ‘সহীহ’ বলেছেন।

(খ) অত্র সূরাটি মুফাস্সালাত এর অন্তভূক্ত, আর মুফাস্সালাত সূরাগুলোকে কোরআনের অন্তর বলা হয়। যেমন: ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন:

(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].

অর্থাৎ: “প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, আর কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্সাল সূরাগুলো”।

(*সুনানে দারিমী*, ৩৪২০) ।

আরো একটি হাদীসে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে মুফাস্সালাত সূরাগুলো ইতিপূর্বে কোন নবী-রাসূলকে প্রদান করা হয়নি। যেমন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةَ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].

অর্থাৎ: “আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিষিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিষিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি”। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪) ।
হাদীসে মুফাস্সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ৮৪তম সূরা।

অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ৮২তম সূরা, যা ‘সূরা ইনফিতার’ এর পরে অবতীর্ণ হয়েছে।

অবতীর্ণের স্থান: সকল তাফসীরকারক একমত যে, অত্র সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, সূরা মাক্কিয়্যাহ। (*বিতাকাত আল-তারীফ*, ২৯২) ।

আয়াত সংখ্যা: ২৫টি।

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: এ সূরাটি অবতীর্ণের কোন প্রেক্ষাপট পাওয়া যায় না।

﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (٢) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (٣) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ
(٤) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (٥) يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (٦) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ
كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (٧) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (٨) وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا (٩) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ
وَرَاءَ ظَهْرِهِ (١٠) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (١١) وَيَصْلَى سَعِيرًا (١٢) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا (١٣) إِنَّهُ
ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (١٤) بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا (١٥)﴾ [سورة الانشقاق: ١-١٥].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়: কিয়ামতের ভয়াবহতা এবং মানুষ দুই দলে বিভক্ত হওয়ার দৃশ্য।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১	যখন	আকাশ	ফেটে যাবে।	২	আর নির্দেশ মান্য করবে	স্বীয় রবের,	যা তার কর্তব্য।
	إِذَا	السَّمَاءُ	انْشَقَّتْ		وَأَذِنَتْ	لِرَبِّهَا	وَحُقَّتْ

৩	আর যখন	পৃথিবীকে	সম্প্রসারিত করা হবে।	৪	এবং নিক্ষেপ করবে	যা তার মধ্যে আছে
	وَإِذَا	الْأَرْضُ	مُدَّتْ		وَأَلْقَتْ	مَا فِيهَا

এবং খালি হয়ে যাবে।	৫	আর নির্দেশ মান্য করবে	স্বীয় রবের,	যা তার কর্তব্য।	৬	হে মানুষ!
وَتَخَلَّتْ		وَأَذِنَتْ	لِرَبِّهَا	وَحُقَّتْ		يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ

তুমি	তোমার রবের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত যে কঠিন পরিশ্রম করো,	তুমি তা দেখতে পাবে।	৭
إِنَّكَ	كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا	فَمُلَاقِيهِ	

সুতরাং যাকে	দেওয়া হবে	নিজ আমলনামা	ডান হাতে	৮	তার হিসাব নেওয়া হবে
فَأَمَّا مَنْ	أُوتِيَ	كِتَابَهُ	بِيَمِينِهِ		فَسَوْفَ يُحَاسَبُ

সহজভাবে।	৯	সে ফিরে যাবে	নিজ পরিবারের কাছে	খুশীতে।	১০	(পক্ষান্তরে) যাকে
حِسَابًا يَسِيرًا		وَيَنْقَلِبُ	إِلَى أَهْلِهِ	مَسْرُورًا		وَأَمَّا مَنْ

দেওয়া হবে	নিজ আমলনামা	পিঠের পিছনের দিক থেকে।	১১	অচিরেই	সে আহবান করবে
أُوتِيَ	كِتَابَهُ	وَرَاءَ ظَهْرِهِ		فَسَوْفَ	يَدْعُو

মৃত্যুকে।	১২	আর সে প্রবেশ করবে	জ্বলন্ত আগুনে।	১৩	নিশ্চয় সে	পরিবারের সাথে ছিল
ثُبُورًا		وَيَصْلَى	سَعِيرًا		إِنَّهُ	كَانَ فِي أَهْلِهِ

আনন্দে।	১৪	যেহেতু সে	মনে করতো	সে কখনও প্রত্যাবর্তিত হবে না।	১৫	হ্যা,
مَسْرُورًا		إِنَّهُ	ظَنَّ	أَنْ لَنْ يَحُورَ		بَلَى

নিশ্চয়	তার রব	তার প্রতি সাম্যক দৃষ্টি রাখেন।
إِنَّ	رَبَّهُ	كَانَ بِهِ بَصِيرًا

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

ইস্রাফিল (আ.) এর সিংগায় প্রথম ফুৎকারের পর, যখন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আকাশকে ফেটে যাওয়ার আদেশ করা হবে এবং সে তা শুনবে ও মানবে। আর শ্রবণ ও অনুসরণ করা তো তার দায়িত্ব। আর যখন যমীনের উপর বিরাজমান পাহাড়-পর্বত চূর্ণবিচূর্ণ করে সমতল করা হবে এবং ইস্রাফিলের দ্বিতীয় ফুৎকারের সাথে সাথে যমীন তার ভিতরের মৃত প্রাণী এবং সকল গুপ্ত ধন ও ক্ষনিজ পদার্থ বের করে দিয়ে খালি হয়ে যাবে। যমীনকে তার ভিতরের সবকিছু বের করে দিয়ে খালি হতে বলা হবে এবং সে তা শুনবে ও মানবে। আর শ্রবণ ও অনুসরণ করা তো তার দায়িত্ব। হে মানব! তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত ভালো-মন্দ কাজের জন্য যে কঠোর পরিশ্রম করেছিলে তার পুরস্কার অথবা তিরস্কার তোমার রবের কাছ থেকে অবশ্যই পাবে।

সুতরাং যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, তার হিসাব সহজ করা হবে। হিসাব-নিকাশের পর জান্নাতে প্রবেশ করে সে আনন্দে তার পরিবারের যারা জান্নাতী হয়েছে তাদের সাথে সাক্ষাত করে সুসংবাদ দিবে। অপরদিকে যাকে তার আমলনামা পিঠের পিছনের দিক থেকে দেওয়া হবে, সে কষ্টে মৃত্যু কামনা করতে থাকবে। অতঃপর সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। সে দুনিয়ায় পরিবারের সাথে আনন্দে ছিল এবং আখেরাতের বিষয়কে মোটেই পরোয়া করেনি। কারণ সে তখন মনে করতো তাকে কখনও বিচারের জন্য আল্লাহর মুখোমুখি হতে হবে না। সাবধান! আল্লাহ তায়ালা সকলের প্রতি সদা দৃষ্টি রাখেন। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫৪৮-৫৪৩, *আল-মোন্তাখাব*: ৮৯৪-৮৯৫, *আল-তাফসীর আল-মোয়াস্সার*: ১/৫৮৯)।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿فَمُلَاقِيهِ﴾ 'তুমি তাঁর সাক্ষাত পাবে', অত্র আয়াতাংশে 'তার' সর্বনামটি কোন দিকে ফিরেছে? এ বিষয়ে তাফসীরকারকদের থেকে দুইটি মত পাওয়া যায়:

(ক) সর্বনামটি 'তোমার রব' এর দিকে ফিরেছে, অর্থাৎ: "অতঃপর সে তোমার রবের সাক্ষাৎ পাবে"। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫৪৩)।

(খ) সর্বনামটি কৃতকর্মের দিকে ফিরেছে, অর্থাৎ: "অতঃপর সে কৃতকর্মকে দেখতে পাবে"। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/১৩৯)।

এখানে দ্বিতীয় মতটি প্রাধান্য পাবে; কারণ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহর সাক্ষাৎ সবচেয়ে বড় নেয়ামত হওয়ার কারণে কেবল জান্নাতীরাই জান্নাতে প্রবেশের পর তাঁর সাক্ষাৎ পাবে। সুহাইব (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ"

(صحيح مسلم: ٤٦٧).

অর্থাৎ: "যখন জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তায়ালা জান্নাতীদের উদ্দেশ্যে বলবেন: তোমরা কি আরো কিছু চাও? আমি তোমাদেরকে আরো দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি।

অতঃপর তারা উত্তর দিবেন: আপনি কি আমাদের চেহারাকে উজ্জ্বল করেননি? আপনি কি আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতের ব্যবস্থা করেননি? আমাদের চাওয়ার আর কি বাকী আছে! আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন: তখন আল্লাহ এবং জান্নাতীদের মধ্যকার পর্দা উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং জান্নাতীরা আল্লাহ তায়ালাকে মন ভরে দেখবে। আল্লাহ তায়ালাকে দর্শনের নেয়ামতের চেয়ে বড় কোন নিয়ামত জান্নাতীদেরকে দেওয়া হয়নি" (*সহীহ মুসলিম*: ৪৬৭) ।

﴿وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ 'খুশীতে সে তার পরিবারের কাছে ফিরে যাবে', অধিকাংশ তাফসীরকারকদের মতে, হিসাব-নিকাশ শেষে জান্নাতে প্রবেশের পর খুশীতে তারা নিজ আহলের কাছে গিয়ে সুসংবাদ দিবে। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫৪৩) ।

﴿يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ﴾ 'হে মানব! তুমি পরিশ্রমী', আয়াতাংশে কাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? এ বিষয়ে তাফসীরকারকদের থেকে দুইটি মত পাওয়া যায়:
(ক) ব্যাপকভাবে সকল মানবজাতিকে বুঝানো হয়েছে।
(খ) আরেক দল তাফসীরকারক বলেন, বিশেষ কোন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, কেউ কেউ বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সম্বোধন করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন: উবাই ইবনু খালাফকে বুঝানো হয়েছে।
ইমাম ফখরুদ্দীন আল-রাযী (র.) প্রথম মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন; কারণ পরবর্তী আয়াতে সকল মানবজাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। (*আল-তাফসীর আল-কাবীর*: ৩১/৯৭) ।

অত্র সূরার সাথে পূর্ববর্তী সূরার সম্পর্ক:

ইমাম আলুসী (র.) বলেন: সূরা ইনফিতার এ আলোচনা করা হয়েছে যে দুই জন ফেরেশতা কিরামুন ও কাতিবীন সর্বদা মানুষের সাথে অবস্থান করে তাদের আমলনামা সংরক্ষণ করেন, সূরা মুতাফফিফীনেও এ বিষয়ের স্বীকৃতি রয়েছে। আর অত্র সূরা তথা সূরা ইনশেক্বাক্ব এ কিয়ামতের দিন আমলনামা পেশ করার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং পূর্ববর্তী সূরার সাথে অত্র সূরার সম্পর্ক স্পষ্ট। (*রূহুল মায়ানী*: ১৫/২৮৬) ।

অত্র সূরার সাথে পরবর্তী সূরার সম্পর্ক:

আবু হাইয়্যান আল-আন্দালুসী (র.) বলেন: অত্র সূরা তথা সূরা আল-ইনশিক্বাক্ব এ আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিরুদ্ধে মক্কার কাফির-মুশরিকদের নানামুখী ষড়যন্ত্র, মুমিনদের প্রতি যুলম-নির্যাতন এবং গালিগালাজের বর্ণনা দিয়েছেন। আর পরের সূরা তথা সূরা বুরুজ এ পূর্ববতী যুগের মুমিনদের উপর তৎকালীন কাফির-মোশরিকদের নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) সহ তার উম্মতকে জানিয়ে দিলেন যে কাফেররা অত্যাচার শুধু তোমাদের উপর করছে তা নয়, বরং পূর্ববতী যুগে ঈমানদারদের উপরও তারা সীমাহীন অত্যাচার চালিয়েছিল। তারা এ অত্যাচারে ধৈর্য ধারণ করে রক্ত এমনকি জীবন দিয়েছে, তবুও

ঈমান থেকে ফিরে আসেনি। তোমাদেরও উচিৎ তাদের মতো ধৈর্য ধারণ করে ঈমানের উপর অটল থাকা। সুতরাং উভয় সূরার মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট। (*আল-বাহর আল-মুহীত*: ৮/৪৪৯) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। অত্র সূরা ‘জুমলা শরতিয়্যাহ’ বা শর্ত বাক্য দিয়ে শুরু হয়েছে। একটি শর্ত বাক্যের তিনটি অংশ থাকে: (ক) আদাতুশ শর্ত বা শর্তের হরফ, (খ) শর্ত এবং (গ) জাওয়াবে শর্ত বা শর্তের উত্তর। এখানে শর্তের হরফ ও শর্ত স্পষ্ট, কিন্তু শর্তের উত্তর অস্পষ্ট থাকার কারণে এটি নির্ধারণের ব্যাপারে তাফসীরকারকদের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে প্রশিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য মত হলো: ষষ্ঠ আয়াতটি শর্তের উত্তর এবং এখানে ‘ফা’ অক্ষরটি উহ্য আছে। সুতরাং আয়াতাবলীর অর্থ দাড়াবে: “যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং যমীনকে প্রশস্ত করা হবে ও যমীন তার ভিতরের সবকিছু বের করে দিয়ে খালি হয়ে যাবে, তখন হে মানব! তোমরা তোমাদের কষ্টার্জিত কৃতকর্মের সাক্ষাৎ পাবে। (*তাফসীর আল-কুরতুবী*: ১৯/২৭০) ।

২। অত্র সূরার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে: “আকাশ যখন ফেটে যাবে” এবং তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে: “ভূমন্ডলকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে”। এই দুইটি আয়াতকে সমন্বয় করলে মানুষের মনের ভিতর লুকানো একটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। মানুষ সাধারণত মনে করে সৃষ্টি জগতের সূচনালগ্ন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত লক্ষলক্ষ বছরে যে পরিমান মানব ও জ্বীন জাতি সহ অন্যান্য সৃষ্টি এ পৃথিবীতে এসেছে তাদের সবাইকে কিয়ামতের দিন কিভাবে এ ছোট পৃথিবীকে হাশরের ময়দান বানিয়ে সেখানে একত্র করা হবে? কেমন যেন আল্লাহ তায়ালা এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন: ইস্রাফীল (আ.) এর সিঙ্গায় প্রথম ফুৎকারের পর এ সীমাহীন মহাকাশকে ভেঙ্গেচুরে এ পৃথিবীর সাথে সংযোগ করার মাধ্যমে তাকে সম্প্রসারিত করে হাশরের ময়দান বানানো হবে। চল্লিশ বছর পরে দ্বিতীয় ফুৎকারের মাধ্যমে সকল সৃষ্টি বিচারের সম্মুখীন হওয়ার জন্য সেখানে উত্থিত হবে। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

৩। অত্র সূরার (৭-১৫) নাম্বার আয়াতে কিয়ামতের দিন মানুষের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সে দিন মানুষ দুই শ্রেনীতে বিভক্ত হয়ে পড়বে:

(ক) কিছু মানুষকে তাদের আমলনামা ডান হাতে প্রদান করা হবে। এ শ্রেনীর মানুষের জন্য হিসাব সহজ করা হবে। তাদের হিসাব সহজ হওয়ার অর্থ হলো: তারা ভালো কাজ যা করেছে তার জন্য প্রতিদান দেওয়া হবে, আর খারাপ যা করেছে তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হবে না। তার প্রতি কঠোর হয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে না এটা কেন করেছো এবং ওটা কেন করো নাই ইত্যাদি। এভাবেই তার জন্য জান্নাতের ফয়সালা হয়ে যাবে। অতঃপর সে আনন্দে তার জান্নাতী আত্মীয়-স্বজনের কাছে গিয়ে সুসংবাদ দিবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বদা সহজ হিসেবের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন। যেমন: একটি হাদীসে দেখতে পাই:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ: "اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا"، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْحِسَابُ، قَالَ: "يُنْظَرُ فِي كِتَابِهِ وَيُتَجَاوَزُ عَنْهُ، إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ يَا عَائِشَةُ هَلَكَ، وَكُلُّ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ يُلْقِي اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةَ تَشُوكُهُ" (المستدرك للحاكم: ١٩٠).

অর্থাৎ: “আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন: কোন এক সালাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি “হে আল্লাহ! কিয়ামতে আমার হিসাব সহজ করে দিও”। অতঃপর সালাত শেষ করলে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! সহজ হিসাব কি? তিনি উত্তরে বললেন: “তার ভালো কাজকে নজরে নেওয়া হবে এবং খারাপ কাজকে ভ্রূক্ষেপ করা হবে না। হে আয়শা, জেনে রাখো ঐ দিন যার আমলের চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হবে, সে ধ্বংস হবে। আর ঐ দিন মুমিনের থেকে তার পেরেশানি আল্লাহ দুর করবেন, এমনকি একটি কাটার আঘাতের ব্যাথাও সেদিন সে অনুভব করবে না”। (*আল-মুস্তাদরাক্ব লি আল-হাকিম*: ১৯০) ।
ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) বলেন: হিসাব সহজ হওয়ার অর্থ হলো: যাদেরকে ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন এবং তারাও আল্লাহর সাথে নিজস্ব অজুহাত বা আবদার পেশ করতে পারবেন। অপরদিকে যাদেরকে আমলনামা পিছনের দিক দিয়ে প্রদান করা হবে, তাদের দিকে আল্লাহ একবারের জন্য ফিরে তাকাবেন না এবং তারাও তাঁর সাথে কথা বলার সাহস পাবে না। (*আল-তাফসীর আল-কাবীর*: ৩১/৯৮-৯৯) ।
(খ) আর কিছু মানুষকে তাদের আমলনামা পিঠের পিছনের দিক থেকে বাম হাতে প্রদান করা হবে; কারণ অপরাধী হিসেবে তাদের ডান হাত ঘাড়ের সাথে লটকানো থাকবে এবং বাম হাত পিঠের সাথে বাধা থাকবে (*আল-তাফসীর আল-কাবীর*: ৩১/৯৯) । তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশের জন্য বাধ্য করা হলে তাদের কেউ মৃত্যু কামনা করবে, কেউ বলবে হায় আমরা যদি আজ মাটি হয়ে যেতাম!, কেউ সৎআমল করার জন্য পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে, আবার কেউ কিয়ামতের দিনে মুক্তি পাবার আশায় যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করতো, সে সকল শরীকদেরকে খুজে বেড়াবে; কিন্তু তাদের কোন কৌশলই সেদিন কোন উপকারে আসবে না এবং তাদের কোন কথায় কান দেওয়া হবে না। তারা বিভিন্ন মিথ্যা অযুহাত পেশ করতে চাইবে, কিন্তু আল্লাহ পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিবেন যে তিনি তাদের সকল কৃতকর্ম স্বচক্ষে দেখেছেন। অবশেষে সবাইকে নির্মমভাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।
তাদের এ ভয়াবহ পরিণতির তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন:
(ক) তারা আল্লাহর অনুসরণ ও সৎআমল ত্যাগ করে দুনিয়াতে তাদের পরিবারের সাথে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতো।
(খ) দুনিয়ার অত্যাধিক আনন্দ-ফুর্তির কারণে আখেরাতের কথা ভুলে গিয়েছিল।
(গ) তারা ঈমানদারদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছিল। (*সূরা মুতাফফিফীন*: ৩৪) ।
৪। অত্র সূরার (১৩-১৪) নাম্বার আয়াত থেকে দুইটি বিধান নির্গত হয়:
(ক) আল্লাহর অনুসরণ এবং সৎআমল পরিত্যাগ করে দুনিয়ার ক্ষণিকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে মত্ত থাকা কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার করার শামিল। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫৪৫) ।
(খ) অহংকার ও বিলাসিতা থেকে যে আনন্দের উদ্ভব হয় তা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ, কিন্তু আল্লাহর নির্ধারিত তাক্বদীরে খুশী হয়ে, অথবা ভালো কিছু অর্জন করার কারণে আনন্দ প্রকাশ করা নিষিদ্ধ নয়। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/১৪৩-১৪৪) ।

আয়াত ও সূরার আমল:

(ক) অবসর সময়ে সূরা ইনশেক্বাক্ব পাঠ করা; কারণ তা পাঠককে হাশরের ময়দানে পেরেশানি থেকে মুক্ত রাখবে।

(খ) আখেরাত ভিত্তিক জীবন-যাপন করা।

(গ) কিয়ামতের দিন হিসাব সহজ করার জন্য সালাতের মধ্যে দুয়ায় মাছুরার পরে নিম্নের দোয়াটি পাঠ করা: "اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا" অর্থাৎ: “হে আল্লাহ! তুমি কিয়ামতের দিন আমার হিসাব সহজ করে দাও।

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (١٦) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (١٧) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (١٨) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ
(١٩) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٠) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (٢١) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ
(٢٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (٢٣) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٤) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ
أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٢٥)﴾ [سورة الانشقاق: ١٦-٢٥].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়: কিয়ামত দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে উৎসাহ প্রদান।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১৬	অতএব শপথ করছি	অস্তরাগের।	১৭	রাত	ও তা যা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তার শপথ।
	فَلَا أُقْسِمُ	بِالشَّفَقِ		وَاللَّيْلِ	وَمَا وَسَقَ

১৮	এবং শপথ চাঁদের	যখন তা পরিপূর্ণ হয়।	১৯	অবশ্যই তোমরা আরোহণ করবে
	وَالْقَمَرِ	إِذَا اتَّسَقَ		لَتَرْكَبُنَّ

এক স্তর থেকে অন্য স্তরে।	২০	সুতরাং কি হয়েছে তাদের?	তারা কেন ঈমান গ্রহণ করে না?	২১
طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ		فَمَا لَهُمْ	لَا يُؤْمِنُونَ	

এবং যখন	তেলাওয়াত করা হয়	তাদের সামনে	কোরআন,	তখন কেন সাজদা করে না?
وَإِذَا	قُرِئَ	عَلَيْهِمُ	الْقُرْآنُ	لَا يَسْجُدُونَ

২২	বরং	কাফিররা	মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।	২৩	আর আল্লাহ	ভালো ভাবেই অবগত আছেন
	بَلِ	الَّذِينَ كَفَرُوا	يُكَذِّبُونَ		وَاللَّهُ	أَعْلَمُ

তারা আমল নামায় কি জমা করে।	২৪	অতএব তাদেরকে সুসংবাদ দাও	যান্ত্রণাদায়ক শাস্তির।
بِمَا يُوعُونَ		فَبَشِّرْهُمْ	بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

২৫	তবে তারা ব্যতীত,	যারা ঈমান এনেছে	এবং সৎআমল করেছে,	তাদের জন্য রয়েছে
	إِلَّا	الَّذِينَ آمَنُوا	وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ	لَهُمْ

অফুরন্ত পুরস্কার।
أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

কাফির-মুশরিকরা মনে করে মৃত্যুর পর আখেরাত বা হাশরের ময়দান বলতে কিছু নেই, আল্লাহ তায়ালা তাদের এ ভিত্তিহীন দাবীর উত্তরে পশ্চিমাকাশে সান্ধ্যকালীন রক্তিম আভা, রাত ও তার ভিতরে বিরাজমান সকল বস্তু এবং পরিপূর্ণ চাঁদের শপথ করে বলেছেন: অবশ্যই তোমরা দুনিয়ার জীবন শেষ করে আখেরাতের জীবনে পদার্পণ করবে। কি হলো তাদের! কিসের ভিত্তিতে তারা ঈমান গ্রহণ করছে না? তাদের সামনে কোরআন তেলাওয়াত করা হলে,

কেন বিনয়ী হয়ে সাজদা করে না? বরং কাফিররা সর্বদা কোরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তারা তাদের আমলনামায় কি জমা করছে? শিরক, বিদআত, অবাধ্যতা এবং অপকর্ম নাকি সৎআমল? সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ভালোভাবেই অবগত আছেন। অতএব হে নবী! যারা কুফরী এবং অসৎআমল করছে, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। অপরদিকে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎআমল করছে, তাদের জন্য কিয়ামতের দিন অফুরন্ত পুরস্কার রয়েছে। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫৪৬-৫৪৭, *আল-মোন্তাখাব*: ৮৯৫, *আল-তাফসীর আল-মোয়াস্সার*: ১/৫৮৯) ।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿فَلَا أُقْسِمُ﴾ ‘সুতরাং আমি কসম করছি’, বাহ্য দৃষ্টিতে অত্র আয়াতের অর্থ ‘সুতরাং আমি কসম করছি না’ মনে হলেও সকল মুফাসসির এর অর্থ করেছেন: ‘সুতরাং আমি কসম করছি’, বিশিষ্ট তাফসীরকারক সমরকান্দী (র.) এমনটাই বলেছেন। কিন্তু আয়াতে যে ‘লা’ বা না শব্দটি রয়েছে তা কি ‘অতিরিক্ত’ হিসেবে এসেছে নাকি ‘না বোধক’ অর্থে এসেছে? এটা নিয়ে তাফসীরকারকদের থেকে দুইটি মত পাওয়া যায়:

একদল আলেম বলেন: অত্র আয়াতে ‘লা’ শব্দটি ‘অতিরিক্ত’, যা শব্দ চয়নের সৌন্দর্যের জন্য এসেছে। আয়াতের অর্থ হবে: “সুতরাং আমি সান্ধ্যকালীন লালিমা, রাত এবং চাঁদের কসম করে বলছি, তারা বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবেই”।

আরেক দল আলেম বলেন: ‘লা’ শব্দটি ‘না বোধক’ অর্থে এসেছে। কিন্তু কসমকে না করা হয়নি, বরং ‘ফালা’ বা সুতরাং না শব্দটি দিয়ে কাফেরদের হাশরের দিন অস্বীকার করাকে ‘না’ বলার মাধ্যমে জবাব দেওয়া হয়েছে। আয়াতের অর্থ হবে: “সুতরাং তারা যে কিয়ামতকে অস্বীকার করছে তা মোটেই ঠিক নয়। আমি সান্ধ্যকালীন লালিমা, রাত এবং চাঁদের কসম করে বলছি, তারা বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবেই”। (*ফাতহুল ক্বাদীর*: ৫/৪০২) । একই অর্থে অত্র আয়াতাংশটি কোরানের মোট সাত জায়গায় এসেছে, সূরা ক্বিয়ামাহ: ১, সূরা বালাদ: ১, সূরা ওয়াক্বিয়া: ৭৫, সূরা আল-হাকক্বাহ: ৩৮, সূরা আল-মায়ারেজ: ৪০, সূরা আল-তাকভীর: ১৫ এবং সূরা আল-ইনশিক্বাক্ব: ১৬।

﴿الشَّفَقِ﴾ ‘অস্তরাগ’, অত্র আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ সম্পর্কে ওয়াহেদী (র.) বলেন: সকল ভাষাবিধ এবং তাফসীরকারকগণ একমত যে, এর দ্বারা সূর্যাস্তের পরে পশ্চিমাকাশে বিরাজমান সান্ধ্যকালীন লাল আবরণ কে বুঝানো হয়েছে; যা সূর্যাস্তের পরেও বেশ কিছুক্ষণ দেখা যায়। এ আবরণ যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ মাগরিব সালাতের ওয়াক্ত বাকী থাকে এবং তা আড়াল হয়ে গেলে ইশার সালাতের সময় আরম্ভ হয়। (*কুরতুবী*: ১৯/২৭৪, ফাতহুল ক্বাদীর: ৫/৪৯৪) ।

﴿طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ ‘এক স্তর থেকে আরেক স্তরে’, অধিকাংশ তাফসীরকারকদের মতে, আয়াতাংশ দ্বারা মানুষের শুক্রবিন্দু থেকে শুরু করে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত যতগুলো স্তর অতিক্রম করতে হয় সকল স্তরকে বুঝানো হয়েছে। যেমন: মানুষ শুক্রবিন্দু থেকে জমাট রক্ত, তা থেকে মাংসপিন্ড, অতঃপর জিবরীলের (আ.) ফু, অতঃপর শিশু হয়ে জন্মগ্রহণ,

অতঃপর দুনিয়ার জীবন, অতঃপর মৃত্যু এবং সবশেষে বিচারের মুখোমুখি হওয়ার জন্য পুনরুত্থিত হওয়া। (*তাফসীর গরীব আল-কোরআন*: ৮৪/১৯) ।

অত্র আয়াতাবলীর সাথে পূর্ববর্তী আয়াতাবলীর সম্পর্ক:

পূর্বের আয়াতাবলীতে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন মানুষের ভয়াবহ অবস্থা এবং তাদের দুই দলে বিভক্তি হওয়ার বিষয়ে আলোচনার পর অত্র আয়াতাবলীতে মহাবিশ্বের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সান্ধ্যকালীন লালিমা, রাত এবং চাঁদের শপথ করে পুনরুত্থান অনিবার্যভাবে ঘটবে এবং মানবজাতি ভয়াবহ পরিস্থিতির স্বীকার হবে তার নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা মানুষের কিছু আশ্চর্যের কথা বলেছেন যে, তারা সৃষ্টিজগতের নিদর্শন দেখার পরেও কোরআন ও পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না এবং হঠকারিতা ও ঔদ্ধ্যত্যের বশবর্তী হয়ে কোরআনের কোন আয়াতের কাছে নতি স্বীকার করে না, এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে!? এদের জন্য সবচেয়ে কঠিন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অপেক্ষা করছে। তবে যারা তাওবা করে ইসলামের পথে ফিরে এসে ঈমান আনায়ন এবং সৎআমল করবে তাদের জন্য জান্নাতের অফুরন্ত পুরস্কার রয়েছে। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/১৪৬) ।

আয়াতে বর্ণিত কসমের ব্যাখ্যা:

মানুষের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা জায়েজ নেই। আর আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে ধরাবাধা কোন নিয়ম নেই। তিনি সাধারণত যে বিষয়ে কথা বলতে চান তার সাথে সম্পর্কিত কোন বস্তুর কসম করেন। উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়ালা পশ্চিমাকাশের সান্ধ্যকালীন লালিমা, রাত এবং চাঁদের শপথ করে বলেছেন, “অবশ্যই তোমরা বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে আল্লাহর মুখোমুখি হবে”। উল্লেখ্য যে, একটি কসম বাক্যের তিনটি অংশ থাকতে হয়: (ক) হরফে কসম, (খ) কসম বা যে জিনিসের কসম করা হয় এবং (গ) জাওয়াবে কসম বা কসমের পর যে বিষয় কথা বলা হয়। অত্র আয়াতের কসমের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

- হরফে কসম: ফালা উক্বসিমু (আরবী শব্দ)।
- কসম: পশ্চিমাকাশের সান্ধ্যকালীন লালিমা, রাত এবং চাঁদ।
- জাওয়াবে কসম: অবশ্যই তোমরা বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে আল্লাহর মুখোমুখি হবে।

কসম এবং জাওয়াবে কসমের মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট; কারণ এখানে আল্লাহ তায়ালা তিনটি মহানিদর্শন তথা পশ্চিমাকাশের সান্ধ্যকালীন লালিমা, রাত এবং চাঁদের কসম করে কিয়ামত সংগঠিত হবে তার নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। কসমে উল্লেখিত এ মহানিদর্শন তিনটি সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইশারায় ঘুর্ণায়মান হয়। আর যার ইশারায় মহানিদর্শনগুলো পরিচালিত হতে পারে, তারই ইশারায় সৃষ্টির বিচারের জন্য কিয়ামত ও পুনরুত্থান দিবস সংগঠিত হতে পারবে এটাই স্বাভাবিক। (*তিবইয়ান ফি আকসাম আল-কোরআন*, ইবনু জাওজিয়্যাহ: ৭০) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। অত্র সূরার (১৬-১৯) নাম্বার আয়াতে মহাবিশ্বের তিনটি মহানিদর্শন পশ্চিমাকাশের সান্ধ্যকালীন লালিমা, রাত এবং চাঁদের শপথ করে মানুষকে নিশ্চিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তারা মার্তৃগর্ভে শুক্রবিন্দু থেকে জমাট রক্ত, তা থেকে মাংসপিন্ড, অতঃপর

জিবরীলের (আ.) ফুঁ, অতঃপর শিশু হয়ে জন্মগ্রহণ, অতঃপর দুনিয়ার জীবন, অতঃপর মৃত্যু, অতঃপর বিচারের মুখোমুখি হওয়ার জন্য পুনরুত্থিত হওয়া এবং সবশেষে বিচারের পরে জান্নাতী অথবা জাহান্নামী হওয়া। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫৪৭) ।

২। কোরআনের স্পষ্ট বর্ণনা শুনার পরেও যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে এবং কোরআনের তেলাওয়াত শুনে বিনয়ী হয়ে সাজদা করে না, তাদেরকে (২০-২১) নাম্বার আয়াতে তিরস্কার ও ব্যঙ্গ করা হয়েছে; কারণ এখানে প্রশ্নটি ইনকার এবং আশ্চর্যবোধক অর্থে এসেছে, যা তিরস্কার ও ব্যঙ্গ করার জন্য ব্যবহার হয়। কাফির-মুশরিকরা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে মূলত কোরআনকে অস্বীকার করার করার কারণে, আর কোরআনকে অস্বীকার করে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি কারণে, যা কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে পরিলক্ষিত হয়:

(ক) তাদের পূর্বপুরুষরা কোরআন অস্বীকার করতো, তাই তারাও অস্বীকার করে।

(খ) তাদের অন্তরের বক্রতার কারণে।

(গ) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি হিংসার কারণে।

(ঘ) দুনিয়াবী পদ-পদবী হারানোর ভয়ে। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/১৪৯) ।

শয়তান কারো উপর বিজয়ী হয়ে প্রথম যে কাজটি করে তা হলো- আল্লাহ ও আখেরাতের কথা ভুলিয়ে দেয়। (*সূরা মোজাদালাহ*: ১৯) । আর মানুষ যখন আল্লাহ ও আখেরাতের কথা ভুলে যায়, তখন সে দুনিয়াদার হয়ে যায়, যা থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে বারবার সতর্ক করেছেন। মানুষ যখন দুনিয়াদার হয়, তখন সে পূর্বপুরুষদের মাঝে সম্মান খুজে, সরলতা থেকে অন্তর বক্র হতে শুরু করে, পাশে কে বড় হচ্ছে তার বিরুদ্ধে লেগে থাকে এবং দুনিয়াবী পদ-পদবী তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। যার প্রতিচ্ছবি আমাদের সমাজের সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। এ থেকে বেঁচে থাকার জন্য সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে যাতে শয়তান আমাদের উপর কখনও বিজয় হতে না পারে। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

৩। অধিকাংশ ওলামার মতে, অত্র সূরার একুশ নাম্বার আয়াত পড়লে অথবা শুনলে সাজদা করা ওয়াজিব। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, তিনি বলেছেন:

"سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ)، وَ (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ)". (سنن الترمذي: ٥٧٣).

অর্থাৎ: "আমরা সূরা আলাক্ব এবং সূরা ইনশেক্বাক্ব পড়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে সাজদা করেছি" (*সুনান আল-তিরমিযী*: ৫৭৩) । (*রুহুল মায়ানী*: ২২/৩১০) ।

৪। অত্র সূরার (২২-১৪) নাম্বার আয়াতে যারা কোরআন কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা উপহাস এবং ব্যঙ্গাত্বমূলকভাবে জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিয়েছেন। কারণ, এখানে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে (সা.) উদ্দেশ্য করে বলেছেন: ওদেরকে জাহান্নামের যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। কোন অশুভ সংবাদকে কারো কাছে সুসংবাদ হিসেবে উপস্থাপন করা হলে, সেখানে সংবাদ প্রদানের মধ্যে উপহাস নিহিত থাকে। (*ফাতহুল ক্বাদীর*, শাওকানী: ৫/৪৯৬) ।

৫। অত্র সূরার ২৫ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎআমল করছে, তাদের জন্য কিয়ামতের দিন অফুরন্ত পুরস্কার রয়েছে।

আয়াতাবলীর আমল:

একুশ নাম্বার আয়াত নিজে তেলাওয়াত করলে, অথবা কারো তেলাওয়াত শুনলে ক্বিবলামুখী হয়ে সালাতের সাজদার মতো একটি সাজদা প্রদান করা।

(سُورة البُرُوج)

সূরা আল-বুরুজ এর পরিচয়:

সূরার নাম: সকল মুসহাফ এবং তাফসীর গ্রন্থে অত্র সূরার একটি নাম পাওয়া যায় 'সূরা আল-বুরূজ'। (তাফসীর মাওজুয়ী, মোস্তফা মুসলিম: ১০/৮৭) ।

আলোচ্যবিষয়: সুখের শেষ হাসিটা মুমিনের।

সূরার ফযিলত:

(ক) যোহর এবং আসরের সালাতে সূরা বুরুজ এবং তারিক্ব পাঠ করা: এ সম্পর্কে জাবির ইবনু সামুরা (সা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে, তিনি বলেন:

"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَنَحْوِهِمَا". (مسند أحمد: ٩٧٩).

অর্থাৎ: "রাসূলুল্লাহ (সা.) যোহর এবং আসর সালাতে সূরা বুরুজ এবং সূরা তারিক্ব অথবা অনুরূপ সূরা তিলাওয়াত করতেন" (*মুসনাদে আহমাদ: ৯৭৯*) । শায়খ আলবানী (র.) হাদীসটিকে 'হাসান সহীহ' বলেছেন।

(খ) অত্র সূরাটি মুফাস্সালাত এর অন্তর্ভুক্ত, আর মুফাস্সালাত সূরাগুলোকে কোরআনের অন্তর বলা হয়। যেমন: ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন:

(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].

অর্থাৎ: "প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, আর কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্সাল সূরাগুলো"।

(*সুনানে দারিমী*, ৩৪২০) ।

আরো একটি হাদীসে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে মুফাস্সালাত সূরাগুলো ইতিপূর্বে কোন নবী-রাসূলকে প্রদান করা হয়নি। যেমন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةِ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].

অর্থাৎ: "আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিষিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিষিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি"। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪) ।

হাদীসে মুফাস্সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ৮৫তম সূরা।

অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ২৬তম সূরা, যা 'সূরা শাম্স' এর পরে এবং 'সূরা ত্বীন' এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

অবতীর্ণের স্থান: সকল তাফসীরকারক একমত যে, অত্র সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, সূরা মাক্কিয়্যাহ। (*বিতাকাত আল-তারীফ*, ২৯৫) ।

আয়াত সংখ্যা: ২২টি।

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: এ সূরাটি অবতীর্ণের কোন প্রেক্ষাপট পাওয়া যায় না।

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (١) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (٢) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (٣) قُتِلَ أَصْحَابُ
الْأُخْدُودِ (٤) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (٥) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (٦) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ
شُهُودٌ (٧) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (٨) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٩)﴾ [سورة البروج: ١-٩].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়: আসহাবুল উখদুদ এর ধ্বংস চিত্র।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১	কক্ষপথ বিশিষ্ট আসমানের কসম।	২	প্রতিশ্রুত দিবসের কসম।	৩	কসম দ্রষ্টার
	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ		وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ		وَشَاهِدٍ

এবং দৃষ্টের।	৪	ধ্বংস হয়েছে	গর্তের অধিপতিরা।	৫	যাতে ছিল ইন্ধনপূর্ণ অগ্নি।
وَمَشْهُودٍ		قُتِلَ	أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ		النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ

৬	যখন	তারা	তার কিনারায় উপবিষ্ট ছিল।	৭	আর তারা	মুমিনদের সাথে যা করেছিল
	إِذْ	هُمْ	عَلَيْهَا قُعُودٌ		وَهُمْ	عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ

তার প্রত্যক্ষদর্শী।	৮	তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল,	শুধুমাত্র	ঈমান আনার কারণে
شُهُودٌ		وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ	إِلَّا	أَنْ يُؤْمِنُوا

মহাপ্রক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি।	৯	যার জন্য	আকাশ-যমীনের রাজত্ব।	আর আল্লাহ
بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ		الَّذِي لَهُ	مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	وَاللَّهُ

প্রতিটি বিষয়ের	প্রত্যক্ষদর্শী।
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ	شَهِيدٌ

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

তারকাযুক্ত আকাশ, কিয়ামত দিবস, জুমুয়ার দিন এবং আরাফার দিনের কসম করে আল্লাহ তায়ালা বলেন: অবশ্যই গর্তের অধিপতিদেরকে হাশরের ময়দানে পুনর্জীবিত করে বিচারের কাঠগড়ায় দাড় করানো হবে। তাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য। তারা গর্তে আগুন জ্বালিয়ে সেখানে অসংখ্য মুমিনদেরকে নিক্ষেপ করে নির্মমভাবে হত্যা করে জঘন্য অপরাধ করেছিল। আর নেতৃস্থানীয় লোকজন পাশে বসে মুমিনদের পোড়ানো দৃশ্য দেখে উল্লাস করেছিল। তারা মুমিনদের ঈমানকে অপছন্দ করেই তাদের উপর সীমাহীন অত্যাচার চালিয়েছিল। অথচ আকাশ-যমীনের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী, মহাপরাক্রমশালী এবং প্রশংসিত আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান আনয়ন করা তাদের উপর নৈতিক দায়িত্ব ছিল।

আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫৪৮-৫৪৯, *আল-মোন্তাখাব*: ৮৯৬-৮৯৭, *আল-তাফসীর আল-মোয়াস্সার*: ১/৫৯০)।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الْبُرُوجِ﴾ 'আল-বুরুজ', অত্র আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে তাফসীরকারকদের থেকে অনেক মত পাওয়া যায়। তবে ইমাম শাওকানী (র.) তার তাফসীরে হাসান, মুজাহিদ, কতাদাহ এবং দাহ্হাক (র.) এর মতকে প্রথমে উল্লেখ করে এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর তা হলো: 'আল-বুরুজ' দ্বারা 'আন-নুযুম' বা তারকারাশিকে বুঝানো হয়েছে। (*তাফসীর আল-ক্বাদীর*: ৫/৪৯৮)। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাড়ায় "তারকারাশি যুক্ত আকাশের কসম"।

﴿الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ﴾ 'প্রতিশ্রুত দিবস', ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন: সকল তাফসীরকারকদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে অত্র আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: কিয়ামত দিবস। (*আল-কুরতুবী*: ১৯/২৮৩)। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাড়ায়: "কিয়মত দিবসের কসম"।

﴿شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾ 'দ্রষ্টা এবং দৃষ্টা', এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে তাফসীরকারদের অসংখ্য মত পাওয়া যায়। ইবনু কুতাইবাহ (র.) বলেন: 'দ্রষ্টা' হলো জুমুয়ার দিন এবং 'দৃষ্টা' হলো আরাফার দিন। ইমাম কুরতুবী (র.) ও এ মতটিকে প্রধান্য দিয়েছেন। (*গরীব আল-কোরআন*, ইবনু কুতাইবাহ: ৪৪৮, *আল-কুরতুবী*: ১৯/২৮৫-২৮৬)। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে: "আরাফার দিন এবং জুমুয়ার দিনের কসম"।

﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾ 'গর্তের সঙ্গীবৃন্দকে হত্যা করা হয়েছে', এর অর্থ কি? এ ব্যাপারে তাফসীরকারদের তিনটি মত পাওয়া যায়।

(ক) গর্তের অধিপতিরা, যারা মুমিনদেরকে আগুনের গর্তে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিল, তারা ধ্বংস হোক। এক্ষেত্রে আয়াতটিতে অত্যাচারী কাফেরদের ধ্বংসের জন্য বদদোয়া করা হয়েছে।

(খ) মুমিনদেরকে গর্তের জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে কতল করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আয়াতটিতে কতল হওয়া মুমিনদের সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

(গ) গর্তের অধিপতি কাফিররা তাদের জ্বালানো আগুন দ্বারা নিজেরাই ধ্বংস হয়েছে। এক্ষেত্রে জ্বলন্ত আগুনে কাফেরদের ধ্বংস হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ, তারা যখন গর্ত খনন করে অগুন জ্বালিয়ে মুমিনদেরকে গর্তে নিক্ষেপ করতেছিল, তখন গর্তের আগুন আশেপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে, গর্তের পাশে বসে যারা উল্লাস করতেছিল তারাও ধ্বংস হয়েছিল। (*আল-কুরতুবী*: ১৯/২৯৪)।

উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ তাফসীর গ্রন্থে প্রথম মতের আলোকে সূরার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমিও অধিকাংশ তাফসীরকে অনুসরণ করে প্রথম মতটি সামনে রেখেই ব্যাখ্যা করার চেষ্ট করেছি।

অত্র সূরার সাথে পরবর্তী সূরার সম্পর্ক:

আল্লাহ তায়ালা অত্র সূরা তথা সূরা আল-বুরুজ এর শেষের আয়াতে লাওহে মাহফুজ নিয়ে কথা বলেছেন এবং পরবর্তী সূরা তথা সূরা তারিক্ব এর প্রথম আয়াতে আকাশ এবং উজ্জ্বল নক্ষত্রের কসম করে মানুষের আমল সংরক্ষিত রাখার বিষয়ে কথা বলেছেন। এ দুইয়ের মধ্যে

সম্পর্ক খুবই নিবিড়; কারণ লাওহে মাহফুজের সংরক্ষণ আকাশ সংরক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত। অনুরূপভাবে লাওহে মাহফুজ যেমন আল্লাহর কুদরাতের বহিঃপ্রকাশ, তেমনিভাবে মানুষের আমল সংরক্ষণ করাও আল্লাহর কুদরাতের বহিঃপ্রকাশ। (*তাফসীর আল-ওয়াসিত*: ১৫/৪৯৬) ।

অত্র সূরার সাথে পূর্ববতী সূরার সম্পর্ক:

আবু হাইয়্যান আল-আন্দালুসী (র.) বলেন: পূর্ববতী সূরা তথা সূরা আল-ইনশিক্বাক্ব এ আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিরুদ্ধে মক্কার কাফির-মুশরিকদের নানামুখী ষড়যন্ত্র, মুমিনদের প্রতি যুলম-নির্যাতন এবং গালিগালাজের বর্ণনা দিয়েছেন। আর অত্র সূরা তথা সূরা বুরুজ এ পূর্ববতী যুগের মুমিনদের উপর তৎকালীন কাফির-মোশরিকদের নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) সহ তার উম্মতকে জানিয়ে দিলেন যে কাফেররা অত্যাচার শুধু তোমাদের উপর করছে তা নয়, বরং পূর্ববতী যুগে ঈমানদারদের উপরও তারা সীমাহীন অত্যাচার চালিয়েছিল। তারা এ অত্যাচারে ধৈর্য ধারণ করে রক্ত এমনকি জীবন দিয়েছে, তবুও ঈমান থেকে ফিরে আসেনি। তোমাদেরও উচিৎ তাদের মতো ধৈর্য ধারণ করে ঈমানের উপর অটল থাকা। সুতরাং উভয় সূরার মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট। (*আল-বাহর আল-মুহীত*: ৮/৪৪৯) ।

আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনা:

সুহাইব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: একজন বাদশাহর রাজকীয় যাদুকর ছিল। যখন এ যাদুকর বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হলো, তখন সে বাদশাহকে বললো: আমাকে একটি বুদ্ধিমান বালক দিন, যাকে আমি যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিবো। সুতরাং বাদশাহ একজন তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন বালক খোঁজ করে তার কাছে সমর্পণ করলেন। ঐ বালকের আসা-যাওয়ার পথে এক পাদরিরও ঘর ছিলো। বালকটি যাওয়া-আসার সময় সেই পাদরির নিকট গিয়ে বসত এবং তার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবন করতো, যা তার কাছে ভালো লাগতো। এ ভাবেই তার আসা-যাওয়া অব্যাহত থাকে। একদা এই বালকটির যাওয়ার পথে এক বৃহদাকার জন্তু বসেছিলো, যে মানুষের আসা-যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে রেখেছিলো। বালকটি চিন্তা করলো, আজকে আমি পরীক্ষা করবো যে, যাদুকর সত্য, না পাদরি। সে একটি পাথরের টুকরা কুড়িয়ে হাতে নিয়ে বললো: হে আল্লাহ! যদি পাদরির আমল তোমার নিকট যাদুকরের আমল থেকে উত্তম এবং পছন্দনীয় হয়, তাহলে এই জন্তুকে মেরে ফেল; যাতে মানুষের আসা-যাওয়ার পথ চালু হয়ে যায়। এ বলে বালকটি পাথর ছুড়লে জন্তুটি মারা গেল।

এবার বালকটি পাদরির নিকট গিয়ে সব কথা বিস্তারিত বললো। পাদরি বললেন: হে বৎস! এবার দেখছি তুমি পূর্ণ দক্ষতায় পৌঁছে গেছো। এবার তোমার পরীক্ষা শুরু হতে চলছে। কিন্তু এ পরীক্ষা অবস্থায় আমার নাম তুমি প্রকাশ করবে না। বালকটি জন্মান্ধত্ব, ধবল প্রভৃতি রোগের চিকিৎসাও করতো; তবে তা আল্লাহর উপর বিশ্বাসের শর্ত রেখেই করতো। এই শর্তানুযায়ী বাদশার এক সহচরের অন্ধ চক্ষুকে আল্লাহর কাছে দুয়া করে ভালো করে দিলো। বালকটি চিকিৎসা করার সময় রোগীকে বলতো যে, যদি আপনি আল্লাহর উপর ঈমান আনেন, তাহলে

আমি তাঁর নিকট দুয়া করবো, তিনি আরোগ্য দান করবেন। সুতরাং সে আল্লাহর নিকট প্রার্থণা করলে তিনি রোগীকে আরোগ্য দান করতেন।

এ খবর বাদশাহর নিকট পৌঁছলে, তিনি বড় উদ্বিগ্ন হলেন। কিছু সংখ্যক ঈমানদারকে তিনি হত্যা করে ফেললেন। আর এ বালকটির ব্যাপারে তিনি কয়েকটি লোককে ডেকে বললেন যে, এ বালকটিকে উঁচু পাহাড়ের উপর নিয়ে গিয়ে নিচে ফেলে দাও। বালকটি আল্লাহর কাছে দোয়া করলে পাহাড় কাঁপতে লাগলো; যার কারণে সে ছাড়া সকলেই পড়ে মারা গেলো।

বাদশাহ তখন বালকটিকে অন্য কিছু লোকের কাছে সমর্পণ করে বললেন: একে একটি নৌকায় চড়িয়ে সমুদ্রের মধ্যস্থলে নিয়ে গিয়ে তাতে নিক্ষেপ করো। সেখানেও বালকটির দোয়ার কারণে নৌকাটি উল্টে গেলো। ফলে, সকলে পানিতে ডুবে মারা গেলো। কিন্তু বালকটি বেঁচে গেলো। এবার বালকটি বাদশাহকে বললো: যদি আপনি আমাকে হত্যাই করতে চান, তাহলে এর সঠিক পদ্ধতি হলো এই যে, একটি খোলা ময়দানে লোকদেরকে জমায়েত করুন, আর ‘বিসমিল্লাহি রাব্বিল গুলাম’ অর্থাৎ: ‘বালকের রবের নামে আরম্ভ করছি’ বলে আমার প্রতি তীর নিক্ষেপ করুন; দেখবেন আমি মৃত্যুবরণ করবো। বাদশাহ তাই করলেন। ফলে, বালকটি মৃত্যু বরণ করলো। সেই ঘটনাস্থলেই লোকেরা সোচ্চার হয়ে বলে উঠলো যে, “আমরা এ বালকটির রবের উপর ঈমান আনলাম”। এতে বাদশাহ আরো উদ্বিগ্ন হলেন।

অতএব তিনি তাদের জন্য গর্ত খনন করে তাতে আগুন জ্বালাতে আদেশ করলেন। অতঃপর হুকুম দিলেন যে, যে ব্যক্তি ঈমান হতে ফিরে না আসবে, তাকে এই অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করো। এইভাবে একে একে সকল ঈমানদার আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে থাকলো। পরিশেষে একটি মহিলার পালা এলো, যার সঙ্গে তার বাচ্চাও ছিলো। সে একটু পশ্চাদপদ হলো। কিন্তু বাচ্চাটি বলে উঠলো: “আম্মাজান! ধৈর্য ধরুন; আপনি সত্যের উপরে আছেন”। সুতরাং সেও আগুনে শহীদ হয়ে গেলো” (*সহীহ মুসলিম*: ৩০০৬) ।

ইমাম কুরতুবী (র.) তার তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ঈসা (আ.) কে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার পর এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আগমনের চল্লিশ বছর পূর্বে সৌদিআরবের নাজরান নামক জায়গাতে ‘জু নুয়া ইউসুফ’ নামে এক খৃষ্টান বাদশাহ সত্তর/আশি/বিশ/বার হাজার মুমিনকে নির্মমভাবে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিল। (*আল-কুরতুবী*: ১৯/২৯১-২৯৩) ।

সূরা বুরুজের কসমের ব্যাখ্যা:

মানুষের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা জায়েজ নেই। আর আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে ধরাবাধা কোন নিয়ম নেই। তিনি সাধারণত যে বিষয়ে কথা বলতে চান তার সাথে সম্পর্কিত কোন বস্তুর কসম করেন। অত্র সূরায় আল্লাহ তারকাযুক্ত আকাশ, কিয়ামত দিবস, জুমুয়ার দিন এবং আরাফার দিনের কসম করে বলেছেন: “অবশ্যই গর্তের অধিপতিদেরকে হাশরের ময়দানে পুনর্জীবিত করে বিচারের কাঠগড়ায় দাড় করানো হবে”। উল্লেখ্য যে, একটি কসম বাক্যের তিনটি বিষয় থাকতে হয়: (ক) হরফে কসম, (খ) কসম বা যে জিনিসের কসম করা হয় এবং (গ) জাওয়াবে কসম বা কসমের পর যে বিষয় কথা বলা হয়। অত্র সূরায় কসমের ব্যাখ্যা নিম্নরুপ:

- হরফে কসম: ওয়াও (আরবী হরফ)।
- কসম: তারকাযুক্ত আকাশ, কিয়ামত দিবস, জুমুয়ার দিন এবং আরাফার দিন।
- জাওয়াবে কসম: অবশ্যই গর্তের অধিপতিদেরকে হাশরের ময়দানে পুনর্জীবিত করে বিচারের কাঠগড়ায় দাড় করানো হবে। (*তিবইয়ান ফি আকসাম আল-কোরআন*, ইবনু জাওজিয়্যাহ: ৬২-৬৩) ।

এখানে কসম এবং জাওয়াবে কসমের মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট; কারণ কিয়ামত দিবসের কসম করে আল্লাহ তায়ালা সেখানে গর্তের অধিপতিদেরকে পুনর্জীবিত করে বিচারের কাঠগড়ায় দাড় করানোর ঘোষণা দিয়েছেন। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

উল্লেখ্য যে, এখানে জাওয়াবে কসম নিয়ে তাফসীরকারকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে:

(ক) ইবনুল আনবারী (র.) বলেন: জাওয়াবে কসম উহ্য রয়েছে। আর তা হলো: অবশ্যই গর্তের অধিপতিদেরকে বিচারের জন্য পুনর্জীবিত করা হবে। সুতরাং কসম বাক্যের অর্থ হবে: তারকাযুক্ত আকাশ, কিয়ামত দিবস, জুমুয়ার দিন এবং আরাফার দিনের শপথ, অবশ্যই গর্তের অধিপতিদেরকে বিচারের জন্য পুনর্জীবিত করা হবে।

(খ) আল-ফাররা (র.) বলেন, জাওয়াবে কসম হলো (৪-৭) নাম্বার আয়াত। সুতরাং কসম বাক্যের অর্থ দাড়ায়: তারকাযুক্ত আকাশ, কিয়ামত দিবস, জুমুয়ার দিন এবং আরাফার দিনের শপথ, অবশ্যই গর্তের অধিপতিদের প্রতি আল্লাহর লানত...।

(গ) কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন: জাওয়াবে কসম হলো ১২ নাম্বার আয়াত। সুতরাং কসম বাক্যের অর্থ হবে: তারকাযুক্ত আকাশ, কিয়ামত দিবস, জুমুয়ার দিন এবং আরাফার দিনের শপথ, নিশ্চয় আল্লাহর পাকড়াও বড় মারাত্মক।

(ঘ) আবার কেউ কেউ বলেছেন: জাওয়াবে কসম হলো দশ নাম্বার আয়াত। সুতরাং কসম বাক্যের অর্থ হবে: তারকাযুক্ত আকাশ, কিয়ামত দিবস, জুমুয়ার দিন এবং আরাফার দিনের শপথ, অবশ্যই যারা মুমিন নর-নারীদের উপর অত্যাচার করেছে, অতঃপর তাওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব এবং আরো রয়েছে আগুনে পোড়ানোর ভয়ানক শাস্তি।

(তাফসীর আল-কুরতুবী: ১৯/২৮৬) ।

তবে অধিকাংশ তাফসীরকারকগণ প্রথম মতটিকে গ্রহণ করেছেন। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। ইমাম যমাখশারী (র.) বলেন: অত্র সূরার প্রথম তিনটি আয়াতে আকাশ, কিয়ামত, জুমুয়া এবং আরাফার দিনের শপথ করে (৪-৭) নাম্বার আয়াতে পূর্ববর্তী যুগের মুমিনদের উপর তৎকালীন কাফির-মোশরিকদের নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) সহ তার উম্মতকে জানিয়ে দিলেন যে, কাফেররা অত্যাচার শুধু তোমাদের উপর করছে তা নয়, বরং পূর্ববর্তী যুগেও ঈমানদারদের উপর সীমাহীন অত্যাচার চালিয়েছিল। তারা এ অত্যাচারে ধৈর্য ধারণ করে রক্ত এমনকি জীবন দিয়েছে, তবুও ঈমান থেকে ফিরে আসেনি। তোমাদেরও উচিৎ তাদের মতো ধৈর্য ধারণ করে ঈমানের উপর অটল থাকা। (*তাফসীর কাশ্শাফ*: ৪/৭২৯) ।

২। চার নাম্বার আয়াতে গর্তের অধিপতিদেরকে লা’নত করার কারণ হলো: তারা যমীনে গর্ত খনন করে আগুন জ্বালিয়ে তাতে নিরপরাধ মুমিনদেরকে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিল। শুধু তাই নয়, আগুন মুমিনদেরকে জ্বালাচ্ছিল আর তারা পাশে বসে আনন্দ-উল্লাস করতেছিল। তারা এতটা নির্মম, পৈশাচিক এবং অমানবিক ছিল যে, তারা ৭০ হাজার নিরপরাধ মুমিনকে পুড়িয়ে মারলো, অথচ বিবেগ তাদের মনুষ্যত্বকে একটু জাগ্রত করতে পারেনি। (*তাফসীর মাওয়ূয়ী*: ১০/৯২)।

৩। চার নাম্বার আয়াতে ‘গর্তের অধিপতি’ শব্দটি ব্যাপকার্থে এসেছে। এর দ্বারা বুঝা যায় কিয়ামত পর্যন্ত যারা মুমিনদেরকে পুড়িয়ে হত্যা করবে অথবা যে কোন পদ্ধতিতে তাদেরকে কষ্ট দিবে সকলেই আল্লাহ তায়ালার অভিশাপের আওতায় পড়বে। (*তাফসীর মওযূয়ী*, মোস্তফা মুসলিম: ১০/৯২)।

৪। অত্র সূরার (৮-৯) নাম্বার আয়াত থেকে বুঝা যায় মুমিনদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার কারণ হলো: আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমানকে কাফিররা অপছন্দ করেছিল। পাপের মধ্যে ডুবে থাকার কারণে তাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যাওয়ায় সঠিক কাজটি তাদের কাছে দোষের মনে হয়েছিল। ফলে তাদেরকে ঈমান থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রথমে আগুনে পুড়িয়ে মারার ভয় দেখিয়েছিল। যারা ভয়ে ঈমান থেকে ফিরে এসেছে, তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছিল। অপরদিকে যারা আগুনকে তোয়াক্কা না করে ঈমানের উপর অটল ছিল, তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিল। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/১৬১)।

৫। উল্লেখিত আয়াতাবলীর মৌলিক শিক্ষা হলো: আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদেরকে ম্যাসেজ দিয়েছেন যে, যারা হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাদের উপর জেল-যুলম, অত্যাচার-নির্যাতন, হামলা-মামলা, গালিগালাজ ইত্যাদি আসবেই। এ অবস্থায় ধৈর্য হারা হয়ে হক্ব পথ বর্জন করে দাওয়াতী কাজ ছেড়ে দেওয়া যাবে না। বরং সুকৌশলে অত্যাচারী গোষ্ঠীকে ‘হক্ব’ বুঝাতে হবে। এ ব্যাপারে আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ" (الترمذي: ٢١٣٤، ابن ماجة: ٤٠١١، أبو داود: ٤٣٤٤).

অর্থাৎ: “সবচেয়ে বড় জিহাদ হলো যালিম শাসকের সামনে সত্য তুলে ধরা” (তিরমিযী: ২১৩৪, ইবনু মাজাহ: ৪০১১, আবু দাউদ: ৪৩৪৪)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন: হাদীসটি একটিমাত্র সনদে বর্ণিত হয়েছে। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে ‘সহীহ’ বলেছেন। এছাড়াও আহমাদ শাকির, আরনাউত এবং মোহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাক্বী সহ সকল মুহাক্কিক ‘সহীহ’ বলেছেন।

আয়াতাবলীর আমল:

(ক) যোহর এবং আসরের সালাতে সূরা বুরূজ এবং সূরা তারিক্ব পাঠ করা।

(খ) কোরআনে বর্ণিত পূর্ববর্তী যুগে মুমিনদের উপর শত্রুদের অত্যাচারের ইতিহাস পড়ে হক্বের উপর অটল থেকে দাওয়াতী কাজে ধৈর্য ধারণের শিক্ষা গ্রহণ করা।

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ
(١٠) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ
(١١)﴾ [سورة البروج: ١٠-١١].

আয়াতাবলীর আলোচ্যবিষয়: আখিরাতে মুমিনের পুরস্কার এবং কাফিরের তিরস্কার।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১০	নিশ্চয়	যারা	কষ্ট দেয়	মুমিন নর-নারীকে,	অতঃপর	তাওবা করে না,	তাদের জন্য
	إِنَّ	الَّذِينَ	فَتَنُوا	الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ	ثُمَّ	لَمْ يَتُوبُوا	فَلَهُمْ

জাহান্নামের আযাব রয়েছে,	তাদের জন্য আরো রয়েছে	আগুনে দগ্ধ হওয়ার আযাব।	১১
عَذَابُ جَهَنَّمَ	وَلَهُمْ	عَذَابُ الْحَرِيقِ	

নিশ্চয়	যারা	ঈমান গ্রহণ করে	এবং আমলে সালিহ করে,	তাদের জন্য রয়েছে (এমন) জান্নাত
إِنَّ	الَّذِينَ	آمَنُوا	وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ	لَهُمْ جَنَّاتٌ

যার তলদেশে প্রবাহমান রয়েছে	নহরসমূহ।	এটাই	বিরাট সফলতা।
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا	الْأَنْهَارُ	ذَلِكَ	الْفَوْزُ الْكَبِيرُ

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

নিশ্চয় যে সকল কাফিররা মুমিন নর-নারীকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার পর তাওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে আসেনি, তারা দুনিয়াতে যেমন আগুনে পোড়ানোর মতো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পেয়েছে, তেমনিভাবে আখিরাতেও রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। দুনিয়ায় আগুনে পোড়ানোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাওয়ার অর্থ হলো: তারা যখন গর্ত খনন করে অগুন জ্বালিয়ে মুমিনদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করতেছিল, তখন গর্তের আগুন আশেপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে, তার পাশে বসে যে সকল কাফের নের্তৃবৃন্দ উল্লাস করতেছিল তারাও আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়েছিল। অপরদিকে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎআমল করেছে, তাদের জন্য নয়নাভিরাম অট্টালিকা এবং সুজলা-সুফলা গাছপালা সজ্জিত এমন সুন্দর জান্নাত রয়েছে যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। এটাই তাদের জন্য মহা সফলতা। (*আইসার*: ৫/৫৪৯, *আল-মোন্তাখাব*: ৮৯৭, *আল-মোয়াস্সার*: ১/৫৯০)।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الَّذِينَ فَتَنُوا﴾ ‘যারা কষ্ট দিয়েছিল’, অত্র আয়াতাংশে ‘যারা’ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে তিনটি মত পাওয়া যায়: (ক) গর্তের অধিপতিগণকে বুঝানো হয়েছে, যারা মুমিনদেরকে আগুনে পুড়ে হত্যা করেছিল। (খ) মক্কার কাফির-মুশরিকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা সাহাবীদেরকে নির্যাতন করতো। (*আল-তাফসীর আল-ওয়াসীত*: ১৫/৩৪৭-৩৪৮)।

(গ) পূর্ববর্তী যুগে যারা মুমিনদেরকে নির্যাতন করেছে এবং ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত যারা করবে সবাইকে ব্যাপকভাবে বুঝানো হয়েছে। প্রথম দুইটি মত খাস করার স্বপক্ষে কোন দলীল না থাকার কারণে ইমাম রাযী (র.) তৃতীয় মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (*আল-তাফসীর আল-কাবীর*: ৩১/১১৩)।

উল্লেখিত আয়াতাবলীর সাথে পূর্বের আয়াতাবলীর সম্পর্ক:

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আসহাবুল উখদুদ বা গর্তের অধিপতিদের ঘটনা এবং তারা মুমিনদের উপর যে নির্মম নির্যাতন চালিয়েছিল তা বর্ণনার পর অত্র আয়াতদ্বয়ে আখেরাতে ঐ সকল অত্যাচারী কাফেরদের ভয়াবহ পরিণতি এবং অত্যাচারিত মুমিনদের পুরস্কার বর্ণনা করেছেন। (*আল-মুনীর*: ৩০/১৬২) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। যারা মুমিনদেরকে পুড়িয়ে হত্যা করার মতো সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ করেছে, তাদের ব্যাপারে দশ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে "তাওবা না করলে আখেরাতে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে"। সুতরাং বুঝা যায় মানুষ যত বড় অপরাধ করুক না কেন, তাওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে আসলে তার সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (*আল-মুনীর*: ৩০/১৬২) । এক ব্যক্তি জীবনে কোন দিন একটি ভালো কাজ তো করেইনি বরং ১০০ জন আল্লাহর বান্দাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাওবার জন্য উদগ্রীব হয়ে এক আলেমের দিকে ছুটে যাচ্ছিল। ঐ আলেমের কাছে পৌছার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (বুখারী: ৩৪৭০, মুসলিম: ২৭৬৬) ।
তাওবা সম্পর্কে অসংখ্য কোরআনের আয়াত এবং হাদীস রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কোরআনের একটি আয়াতে মুমিনদেরকে গুনাহের পরে তাওবা করার নির্দেশ দিয়ে তাওবাকে সফলতার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন:

﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [سورة النور: ٣١].

অর্থাৎ: "হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দরবারে তাওবা করে ফিরে আসো, নিশ্চয় তোমরা সফল হবে" (*সূরা নূর*: ৩১) ।
যারা গুনাহের পরে তাওবা করবে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমার সুসংবাদ রয়েছে:

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [سورة آل عمران: ٨٩].

অর্থাৎ: "তবে যারা গুনাহের পরে তাওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু"। (*সূরা আলে-ইমরান*: ৮৯) । একই অর্থে আল্লাহ তায়ালা সূরা বাক্বারা এর ১৬০, সূরা নিসা এর ১৪৬, সূরা মায়িদা এর ৩৪ এবং সূরা নূর এর ৫ নাম্বার আয়াতে আলোচনা করেছেন।
আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার তাওবায় সবচেয়ে বেশী খুশি হন, যেমন একটি হাদীসে এসেছে, আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ، مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ، إِذَا وَجَدَهَا" (صحيح مسلم: ٢٦٧٥).

অর্থাৎ: "কোন ব্যক্তি মরুভূমিতে বাহণ হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়ার পর এক পর্যায় বাহণ পেয়ে সে যে পরিমাণ খুশি হয়, তোমাদের কারো তাওবাতে আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশী খুশি হন"। (*সহীহ মুসলিম*: ২৬৭৫) ।
রাসূলুল্লাহ (সা.) আগিলা-পিছিলা ভুল-ত্রুটির অগ্রীম ক্ষমা পাওয়ার পরও আমাদেরকে তাওবার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য প্রতিদিন ৭০ বারের বেশী আল্লাহর কাছে তাওবা করতেন:

"وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً" (صحيح البخاري: ٦٣٠٧).

অর্থাৎ: "আল্লাহ কসম, আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে ৭০ বারের বেশী তাওবা-ইস্তেগফার করি" (*সহীহ বুখারী*: ৬৩০৭) ।

গুনাহ থেকে তাওবা করার সুযোগ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য উম্মুক্ত রাখা হয়েছে, এটা ইসলামের সৌন্দর্যাবলীর অন্যতম একটি সৌন্দর্য। এ সম্পর্কে ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ، فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ، مَرَّةٍ" (صحيح مسلم: ٢٧٠٢).

অর্থাৎ: "হে মানবজাতি তাওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে আসো, নিশ্চয় আমি প্রতিদিন একশত বার তাওবা করি" (*সহীহ মুসলিম*: ২৭০২) । অত্র হাদীসে সকল মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে।

এখানে উহ্য একটি প্রশ্ন হতে পারে আমরা কিভাবে তাওবা করবো? এ প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ নিজেই কোরআনে কারীমে দিয়েছেন: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا تُوْبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا﴾ [سورة التحريم: ٨].

অর্থাৎ: "হে মুমিনগণ! তোমরা তাওবা নাসুহা করে আমি আল্লাহর দিকে ফিরে এসো" (সূরা তাহরীম: ৮) । ইমাম ক্বালবী (র.) বলেন: যে ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত নিয়ম বা শর্তের আলোকে তাওবা করবে, তার তাওবা 'তাওবা নাসুহা' হিসেবে গণ্য হবে, যা আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন:

(ক) সংশ্লিষ্ট গুনাহের কাজটিকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা।
(খ) কৃত গুনাহের কারণে লজ্জিত হওয়া।
(গ) ভবিষ্যতে পুনরায় ঐ গুনাহে লিপ্ত হবে না, এ মর্মে অঙ্গীকার করা।
(ঘ) মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট গুনাহ হলে তা হক্বদারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া।

(*তাফসীর আল-কুরতুবী*: ১৮/১৯৮) ।

এভাবে তাওবা করার মাধ্যমে তাওবাকারী যদি কবীরা গুনাহ থেকে তাওবা করে থাকে, তাহলে সে পুতপবিত্র হয়ে যাবে। যেমন: আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ" (سنن ابن ماجة: ٤٢٥٠).

অর্থাৎ: "গুনাহ থেকে তাওবাকারী নিস্পাপ" (সুনানে ইবনু মাজাহ: ৪২৫০) । শায়খ আলবানী (র.) হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন।

মানুষের তাওবা কবুল হলে তার ভিতর কিছু লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, লক্ষণগুলো হলো: (ক) তাওবাকারী তাওবার পরে ভালো হয়ে যাবে, (খ) সৎআমলের পরিমান বেড়ে যাবে, (গ) সৎসঙ্গ তার কাছে প্রিয় হয়ে ওঠবে, (ঘ) খারাপ কাজের প্রতি অনিহা চলে আসবে, (ঙ) ভালো কাজের প্রতি আকৃষ্ট হবে। (আল-দুরার আল-সুন্নিয়্যাহ পেইজ থেকে) ।

উল্লেখ্য যে, কবীরা ঐ সকল গুনাহকে বলা হয় যার ব্যাপারে কোরান-হাদীসে আখেরাতে শাস্তির হুশিয়ারী রয়েছে এবং দুনিয়ায় শরয়ী হদ নির্ধারণ আছে। আর তাওবা কবীরা গুনাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অপরদিকে ছোটখাটো ভুল-ত্রুটি বা সগীরা গুনাহগুলো ইবাদত-বন্দেগী, দান-সদকা, অন্যের উপকার ইত্যাদি ভালো কাজের দ্বারা মিটে যায়। যেমন: আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [سورة هود: ١١٤].

অর্থাৎ: "অবশ্যই মানুষের ভালো কাজসমূহ তাদের মন্দ কাজসমূহকে মিটিয়ে দেয়, যারা আল্লাহকে স্মরণ করে তাদের জন্য এটা উপদেশ" (সূরা হুদ: ১১৪)। ড. ওহাবা জুহাইলী (র.) বলেন: অত্র আয়াতে 'হাসানাত' দ্বারা সালাত সহ অন্যান্য ভালো কাজ এবং 'সাইয়েয়াত' দ্বারা গুনাহ সগীরাকে বুঝানো হয়েছে। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ১২/১৭০) ।

২। দশ নাম্বার আয়াতের শেষাংশে গর্তের অধিপতিদের শাস্তির বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা প্রথমে বলেছেন: ‘তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে’ ঠিক পরের অংশেই আবার বলেছেন ‘তাদের জন্য আগুনে পোড়ানোর শাস্তি রয়েছে’। অথচ ‘জাহান্নামের শাস্তি’ এবং ‘আগুনে পোড়ানোর শাস্তি’ একই জিনিস, তাহলে কেন জাহান্নামের শাস্তির পরে আবার আগুনে পোড়ানোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে? এ ব্যাপারে কয়েকটি মত পাওয়া যায়:

(ক) ‘জাহান্নামের শাস্তি’ উল্লেখের পর ‘আগুনে পোড়ানোর শাস্তি’ তাকীদ বা নিশ্চিতকরণের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে।

(খ) ‘জাহান্নামের শাস্তি’ দ্বারা জাহান্নামের সাধারণ শাস্তিকে বুঝানো হয়েছে এবং ‘আগুনে পোড়ানোর শাস্তি’ দ্বারা বুঝানো হয়েছে বিশেষ শাস্তিকে। প্রথম শাস্তি তাদের কুফরীর কারণে এবং দ্বিতীয় শাস্তি মুমিনদের উপর নির্যাতন ও আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার কারণে দেওয়া হবে। এ অর্থে দুইটি শাস্তিই আখেরাতে সংগঠিত হবে।

(গ) ‘জাহান্নামের শাস্তি’ দ্বারা আখিরাতের শাস্তিকে বুঝানো হয়েছে এবং ‘আগুনে পোড়ানোর শাস্তি’ দ্বারা দুনিয়ার শাস্তিকে বুঝানো হয়েছে। দুনিয়ায় আগুনে পোড়ানোর শাস্তি পাওয়ার অর্থ হলো: তারা যখন গর্ত খনন করে অগুন জ্বালিয়ে মুমিনদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করতেছিল, তখন গর্তের আগুন আশেপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে, তার পাশে বসে যে সকল কাফের নের্তৃবৃন্দ উল্লাস করতেছিল তারাও আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়েছিল। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/১৬২) ।

(ঘ) ইমাম কুরতুবী (র.) তার তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, জাহান্নাম যেমন একটি দোযখের নাম তেমনিভাবে আল-হারীক্বও একটি দোযখের নাম। অর্থাৎ: তাদেরকে দুই দোযখের শাস্তি প্রদান করা হবে। (*তাফসীর আল-কুরতুবী*: ১৯/২৯৫) ।

৩। দশ নাম্বার আয়াতে অত্যাচারী কাফিরদের শাস্তির বর্ণনা প্রদানের পর অত্র আয়াত তথা এগার নাম্বার আয়াতে যারা কাফেরদের অত্যাচারকে পরোয়া না করে ঈমান ও সৎআমলের উপর অটল ছিল তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা দুইটি পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। (ক) জান্নাত এবং (খ) আল্লাহর সন্তুষ্টি। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

৪। এগার নাম্বার আয়াতে একটি ফিকহী মাসয়ালার সমাধান রয়েছে। আর তা হলো: ‘মুস্তাকরাহ’ (যাকে খারাপ কাজে বাধ্য করা হয়) এর জন্য ‘আযিমাত’ অথবা ‘রুখসাত’ গ্রহণের মাসয়ালায় ‘রুখসাত’ গ্রহণের চেয়ে ‘আযিমাত’ এর উপর অটল থাকা উত্তম। কারণ, আসহাবুল উখদুদ এর ঘটনায় হত্যার ভয় দেখিয়ে কুফরী করতে বাধ্য করা হয়েছিল। কেউ ঈমান ত্যাগ করে কুফরীকে গ্রহণ করলে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল অন্যথায় গর্তে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে কেউ কৌশল অবলম্বন করে জীবন বাঁচাতে স্বল্প সময়ের জন্য কুফরী গ্রহণ করলে জায়েজ ছিল। তবে যারা এ সুযোগ গ্রহণ না করে ঈমানের উপর অটল রয়েছিল তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা জান্নাত ও তাঁর সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন। (তাফসীর আল-মুনীর: ৩০/১৬৪) ।

আয়াতাবলীর আমল:

(ক) কারো উপর যুলম করা থেকে বিরত থাকা।

(খ) শত নির্যাতনকে উপেক্ষা করে ঈমানের উপর অটল থাকা।

﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (١٢) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (١٣) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (١٤) ذُو
الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (١٥) فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (١٦) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (١٧) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ
(١٨) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (١٩) وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (٢٠) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ
(٢١) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (٢٢)﴾ [سورة البروج: ١٢-٢٢].

আয়াতাবলীর আলোচ্যবিষয়:

আল্লাহর ক্ষমতা এবং পূর্ব যুগের কাফির ধংসের ইতিহাস ও শিক্ষা।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১২	নিশ্চয়	তোমার রবের পাকড়াও	বড়ই কঠিন।	১৩	তিনিই	অস্তিত্ব দান করেন
	إِنَّ	بَطْشَ رَبِّكَ	لَشَدِيدٌ		إِنَّهُ هُوَ	يُبْدِئُ

এবং পুনরাবর্তন ঘটান।	১৪	আর তিনিই	ক্ষমাশীল	প্রেমময়।	১৫	আরশের অধিপতি,
وَيُعِيدُ		وَهُوَ	الْغَفُورُ	الْوَدُودُ		ذُو الْعَرْشِ

মহান।	১৬	তিনি তাই করেন,	যা তিনি চান।	১৭	তোমার কাছে কি পৌঁছেছে
الْمَجِيدُ		فَعَّالٌ	لِمَا يُرِيدُ		هَلْ أَتَاكَ

সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত?	১৮	ফের'আউন এবং সামুদের।	১৯	বরং	যারা	কাফির,
حَدِيثُ الْجُنُودِ		فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ		بَلِ	الَّذِينَ	كَفَرُوا

তারা মিথ্যারোপে লিপ্ত।	২০	আর আল্লাহ	তাদের অলক্ষ্যে	তাদেরকে পরিবেষ্টনকারী।
فِي تَكْذِيبٍ		وَاللَّهُ	مِنْ وَرَائِهِمْ	مُحِيطٌ

২১	বরং	তা	সম্মানিত কোরআন।	২২	যা লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ।
	بَلْ	هُوَ	قُرْآنٌ مَجِيدٌ		فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

গর্তের অধিপতিদের অত্যাচারী কর্মকান্ড ও তাদের ভয়াবহ পরিণতি বর্ণনার পর আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সমসাময়ীক মক্কার কাফের-মুশরিক যারা মুমিনদের উপর যুলম করেছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা মুমিনদের উপর নির্যাতন করবে তাদের সাবাইকে শতর্ক করে বলেন: হে আল্লাহ নবী! তাদেরকে আপনার রবের ক্ষমতা জানিয়ে দিন:

(ক) তাঁর পাকড়াও বড়ই মারাত্মক।

(খ) কেবল তিনিই সৃষ্টির অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরাবর্তন ঘটান।

(গ) যারা তাঁর কাছে ক্ষমা চায় ও তাওবা করে, তাদের প্রতি তিনি ক্ষমাশীল।

(ঘ) যারা তাকে ভালো বাসে এবং অনুসরণ করে, তাদের প্রতি তিনি প্রেমময়।
(ঙ) তিনি আরশের মালিক এবং মহান।
(চ) তিনি যা চান কেবল তাই করেন, কারো সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন হয় না।
হে নবী! আপনার কাছে কি ফেরআউন এবং সামুদ জাতির সৈন্যবাহিনীর সংবাদ পৌঁছেছে? তারা তাদের নবী-রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো এবং তাদের উপর নির্যাতন করতো, ফলে আল্লাহ তায়ালা ফেরআউন সম্প্রদায়কে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে মেরেছেন এবং সামুদ জাতিকে প্রচন্ড ভূমিকম্প দিয়ে ধ্বংস করেছেন। ওদের চেয়ে বরং আপনার কাওমের কাফির-মুশরিকদের মিথ্যারোপের ভাষা আরো মারাত্মক। তারা কোরানকে কখনও কবিতা, কখনও যাদু এবং কখনও পুরনো দিনের গল্পকথা বলে অপবাদ দিচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে শান্তনা পূর্বক তাদের ভ্রান্ত দাবীর জওয়াবে বলেন: হে আল্লাহর নবী! তাদের কথা সঠিক নয়, বরং কোরআন এমন এক কিতাব যা লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ রয়েছে, এটা কবিতা নয় এবং পুরনো দিনের কল্পকাহিনীও নয়। সুতরাং আপনি তাদের কথায় কর্নপাত না করে কোরআন দিয়ে মানবজাতিকে আহবান করতে থাকুন। (*আল-মোয়াস্সার*: ১/৫৯০, *আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫৫১, *আল-মুনীর*: ৩০/১৬৬-১৬৮) ।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ 'বরং কাফিররা', আয়াতাংশে 'কাফির' দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সমসাময়িক কোরাইশ গোত্রের কাফের-মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা তাকে গালিগালাজ করতো এবং কোরআনকে আল্লাহর বাণী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করতো। (*তাফসীর নাসাফী*: ৩/৬২৫, *তাফসীর আল-কুরতুবী*: ১৯/২৯৭) ।
﴿هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ﴾ 'তিনি অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরাবর্তন ঘটান', এ আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে ইমাম মাওরদী (র.) পাঁচটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। (*তাফসীর মাওরদী*: ৬/২৪২-২৪৩) । তবে অধিকাংশ তাফসীরকারক দুইটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছেন:
(ক) আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির সূচনা করেছেন এবং তিনি মৃত্যুর পর তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করে হাশরের ময়দানে বিচারের কাঠগড়ায় দাড় করাবেন।
(খ) আল্লাহ অত্যাচারী কাফির-মুশরিকদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতে শাস্তি দিবেন। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/১৬৬-১৬৭) ।
ইমাম তাবারী (র.) দ্বিতীয় মতটিকে প্রধান্য দিয়েছেন। (তাফসীর কুরতুবী: (১৯/২৯৬) ।

উল্লেখিত আয়াতাবলীর সাথে পূর্বের আয়াতাবলীর সম্পর্ক:

পূর্বের আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়ালা গর্তের অধিপতিদের মধ্যে যারা তাওবা না করে মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তির দুঃসংবাদ এবং মুমিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আর উল্লেখিত আয়াতসমূহে মক্কার কোরাইশ গোত্রের কাফের-মুশরিক এবং

কিয়ামত পর্যন্ত যুগে যুগে যারা নবী-রাসূল এবং মুমিনদের সাথে অসদাচরণ করবে তাদেরকে আল্লাহর ক্ষমতা উল্লেখপূর্বক সতর্ক করা হয়েছে। (*আল-মুনীর*: ৩০/১৬৬) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। আল্লাহ তায়ালা (১২-১৫) নাম্বার আয়াতে তাঁর পাঁচটি গুণ বর্ণনা করেছেন, যেমন: (ক) তাঁর পাকড়াও বড়ই মারাত্মক, (খ) কেবল তিনিই সৃষ্টির অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরাবর্তন ঘটান, (গ) যারা তাঁর কাছে ক্ষমা চায় ও তাওবা করে, তাদের প্রতি তিনি ক্ষমাশীল, (ঘ) যারা তাকে ভালো বাসে ও আনুগত্য করে, তাদের প্রতি তিনি প্রেমময় এবং (ঙ) তিনি আরশের মালিক এবং সুমহান। এ গুণাবলী তাঁর ক্ষমতার প্রমাণ বহণ করে।

আর ১৬ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে: "তিনি যা চান কেবল তাই করেন, কারো সাথে কোন পরামর্শ করার প্রয়োজন হয় না", এটা এমন একটি গুণ যার বহিঃপ্রকাশ তখনই সম্ভব যখন কারো মধ্যে প্রথম পাঁচটি গুণ পরিলক্ষিত হবে। আর এ গুণাবলী কেবল আল্লাহর মধ্যেই পরিলক্ষিত হওয়া সম্ভব। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা নিজের ইচ্ছার বাহিরে কিছু করেন না এবং যা করেন তা কেউ ঠেকাতে পারে না।

পরের দুইটি আয়াত অর্থাৎ (১৭-১৮) নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তাঁর ক্ষমতার উদাহরণ দিয়েছেন যে, পৃথিবীর সবচেয়ে পরাক্রমশালী বাদশা ফেরআউন কে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে মারলেন এবং সবচেয়ে শক্তিধর জাতি 'সামুদ' কে মাটি চাপা দিয়ে শেষ করে দিলেন। এ অবস্থায় তারা এতটা অসহায় ছিল যে উফ বলার মতো সুযোগটিও পায়নি। (*তাফসীর মওজুয়ী*, ১০/৯৫-৯৬) ।

২। আল্লাহ তায়ালা (১৯-২০) নাম্বার আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সমসাময়িক মক্কার কাফির-মুশরিক এবং বর্তমান যুগের ইসলাম বিদ্বেষী কাফির-ফাসিক যারা আসহাবুল উখদুদ, ফেরআউন এবং সামুদ জাতি সহ পূর্ব যুগের ইসলাম বিদ্বেষীদের ধ্বংসের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ তো করেই না, বরং কোরানকে অস্বীকার করছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বদা চক্রান্ত করে বেড়াচ্ছে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অত্র আয়াতদ্বয়ে বর্তমান যুগের ইসলামের দুশমনকে নমরুদ, ফেরআউন এবং সামুদ জাতির চেয়ে বড় অপরাধী আখ্যা দেওয়া হয়েছে; কারণ বর্তমান যুগের ইসলাম বিদ্বেষীরা পূর্ব যুগের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নাই। আর পূর্ব যুগের ইসলাম বিদ্বেষী, যেমন: নমরুদ, ফেরআউন, সামুদ ইত্যাদি জাতির পূর্বে এমন কোন ইতিহাস সংগঠিত হয়নি যা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

আল্লাহ তায়ালা বর্তমান যুগের ইসলামের দুশমন এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা ইসলামের বিরুদ্ধে দুশমনি করবে তাদের সকলকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তিনি তাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে জানেন, তারা তাওবা করে ইসলামের পথে ফিরে না আসলে যথাসময়ে তাদের উপরও ধ্বংসের অবলীলা এসে উপস্থিত হয়ে যাবে। (*তাফসীর মওজুয়ী*: ১০/৯৬) ।

৩। অত্র সূরার সর্বশেষ দুইটি আয়াত তথা (২১-২২) নাম্বার আয়াতে মক্কার কাফির-মুশরিক কোরআনকে কখনও যাদুবিদ্যা, কখনও কবিতা এবং কখনও পুরনো দিনের কল্পকাহিনী বলে অপবাদ দিতো। আল্লাহ তায়ালা তাদের এ বানোয়াট কথাবার্তার যৌক্তিক জবাব দেওয়ার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, কোরআন সম্পর্কে তাদের কথা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন, বরং কোরআন

হলো আল্লাহ তায়ালার চিরন্তন বাণী, যা লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি নিজেই এ কোরআনকে সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন, কিয়ামত পর্যন্ত কেউ তা বিকৃত করতে পারবে না। (*আল-তাফসীর আল-কাবীর*, রাযী: ৩১/১১৬) ।

৪। অত্র আয়াতাবলীর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে শান্তনা দিয়েছেন এবং সাহস যোগিয়েছেন যে, যারা মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিরুদ্ধাচারণ করে, তারা যদি তাওবা করে সঠিক পথে ফিরে না আসে, তাহলে তাদের পরিণতি ফেরআউন ও সামূদ জাতির মতো ভয়াবহ হবে। (আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন) ।

আয়াতাবলীর আমল:

(ক) আল্লাহ তায়ালা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এ কথা বিশ্বাস করা।

(খ) কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত আসমানী কিতাব এ কথা বিশ্বাস করা।

(গ) কোরআন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তার উত্তরসূরী কোরানের ধারক-বাহক আলেম-ওলামাদের অনুসরণ করা। তাদের বিরুদ্ধে কোন ধরণের স্বড়যন্ত্রে লিপ্ত না হওয়া।

(سُورة الطَّارِق)

সূরা তারিক্ব এর পরিচয়:

সূরার নাম:
তাফসীরকারকদের থেকে অত্র সূরার দুইটি নাম পাওয়া যায়: (ক) সূরা আল-তারিক্ব এবং (খ) কিছু হাদীস এবং তাফসীর গ্রন্থে এ সূরাটির আরেকটি নাম বর্ণিত হয়েছে: "ওয়াস সামায়ি ওয়াত তারিক্ব"। (*আল-তাফসীর আল-ওয়াসীত*, মোহাম্মদ তানতাভী: ১৫/৩৫১) ।

আলোচ্যবিষয়: মানুষের আমল সংরক্ষিত এবং আল-কোরআন হক্ব-বাতিলের চূড়ান্ত পার্থক্যকারী।

সূরার ফযিলত:
অত্র সূরাটি মুফাস্সালাত এর অন্তভুক্ত, আর মুফাস্সালাত সূরাগুলোকে কোরআনের অন্তর বলা হয়। যেমন: ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন:
(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].
অর্থাৎ: "প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, আর কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্সাল সূরাগুলো"।
(*সুনানে দারিমী*, ৩৪২০) ।
আরো একটি হাদীসে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে মুফাস্সালাত সূরাগুলো ইতিপূর্বে কোন নবী-রাসূলকে প্রদান করা হয়নি। যেমন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةَ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].
অর্থাৎ: "আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিষিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিষিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি"। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪) ।
হাদীসে মুফাস্সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।
মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ৮৬তম সূরা।

অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ৩৫তম সূরা, যা 'সূরা বালাদ' এর পরে এবং 'সূরা ক্বমার' এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।
অবতীর্ণের স্থান: সকল তাফসীরকারক একমত যে, অত্র সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, সূরা মাক্কিয়্যাহ। (*বিতাকাত আল-তারীফ*, ২৯৮) ।
আয়াত সংখ্যা: ১৭টি।
অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: এ সূরাটি অবতীর্ণের একটি প্রেক্ষাপট পাওয়া যায়, যা সূরার ব্যাখ্যায় আসবে, ইনশাআল্লাহ।

﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (٢) النَّجْمُ الثَّاقِبُ (٣) إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا
عَلَيْهَا حَافِظٌ (٤) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (٦) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ
الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (٧) إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (٨) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (٩) فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا
نَاصِرٍ (١٠)﴾ [سورة الطارق:١-١٠].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়:

কিয়ামতে পেশ করার মানুষের আমল ফেরেশতা দ্বারা সংরক্ষিত।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১	শপথ আকাশের	এবং রাতে আগমনকারীর।	২	তুমি কি জানো	রাতে আগমনকারী কি?	
	وَالسَّمَاءِ	وَالطَّارِقِ		وَمَا أَدْرَاكَ	مَا الطَّارِقُ	
৩	তা হলো: উজ্জ্বল নক্ষত্র।	৪	প্রত্যেক জীবের জন্য	একজন সংরক্ষক রয়েছে।	৫	সুতরাং
	النَّجْمُ الثَّاقِبُ		إِنْ كُلُّ نَفْسٍ	لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ		فَـ
মানুষের ভেবে দেখা উচিৎ	তাকে কি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।	৬	তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে			
لِيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ	مِمَّ خُلِقَ		خُلِقَ			
দ্রুতবেগে নির্গত পানি থেকে।	৭	যা বের হয়	মেরুদন্ড এবং বুকের হাঁড়ের মধ্য থেকে।	৮		
مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ		يَخْرُجُ	مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ			
নিশ্চয় তিনি	তাকে ফিরিয়ে আনতে	সক্ষম।	৯	যে দিন	পরীক্ষা করা হবে	গোপন বিষয়াদি।
إِنَّهُ	عَلَى رَجْعِهِ	لَقَادِرٌ		يَوْمَ	تُبْلَى	السَّرَائِرُ
১০	সুতরাং তার থাকবে না	কোন শক্তি	এবং কোন সাহায্যকারী।			
	فَمَا لَهُ	مِنْ قُوَّةٍ	وَلَا نَاصِرٍ			

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

আল্লাহ তায়ালা আকাশ এবং রাতে উদীয়মান তারকার কসম করে পাঠকের কাছে রাতে উদীয়মান তারকাটির পরিচয় জানতে চাওয়ার পর তিনি নিজেই ঐ তারাকার পরিচয় দিয়ে বলেন: তা হলো উজ্জ্বল নক্ষত্র। কসমের বিষয়বস্তু উল্লেখপূর্বক আল্লাহ তায়ালা বলেন: নিশ্চয় প্রত্যেক সৃষ্টিকে সংরক্ষণ করতে একজন করে ফেরেশতা সংরক্ষণকারী নিয়োজিত রয়েছে, যে তাকে প্রত্যেক ক্ষতিকারক বিষয় থেকে রক্ষার পাশাপাশি কিয়ামতের দিন হিসাব গ্রহণের জন্য তার কৃতকর্মকে সংরক্ষিত রাখে।

অতএব, পুনরুত্থাণ দিবস অস্বীকারকারীকে একটু ভেবে দেখা উচিৎ তাকে মেরুদন্ড ও বুকের হাঁড়ের মধ্য থেকে দ্রুতবেগে বের হওয়া এক ফোটা পানি থেকে কত সহজে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রথমবার সৃষ্টির তুলনায় দ্বিতীয়বার কিয়ামতের ময়দানে বিচার ব্যবস্থার জন্য সৃষ্টি করা তো আরো সহজ যা

করতে তিনি সক্ষম। সে দিন মানুষের কোন শক্তি এবং সাহায্যকারী থাকবে না, যার সহযোগিতায় সে নিজেকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে। (*আল-তাফসীর আল-মোয়াস্সার: ১/৫৯১*)।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾ 'উজ্জ্বল নক্ষত্র', অধিকাংশ তাফসীরকারকদের মতে, আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সুরাইয়্যা নামক সাতটি উজ্জ্বল তারকার সমহার (*তাফসীর গরীব আল-কোরআন*, কাওয়ারী: ৩/৮৬), যা বাংলা ভাষাতে সপ্তর্ষিমন্ডল হিসেবে পরিচিত।

হাসান এবং ক্বতাদাহ (র.) বলেন: সকল তারকাকে ব্যাপকভাবে বুঝানো হয়েছে; কারণ আয়াতে রাতে যা উদয় হয় সকলের কথা বলা হয়েছে। ইমাম জুহাইলী (র.) দ্বিতীয় মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (আল-মুনীর: ৩০/১৭৬)।

﴿حَافِظٌ﴾ 'সংরক্ষণকারী', অধিকাংশ তাফসীরকারকদের মতে, অত্র আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সংরক্ষণকারী ফেরেশতা। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫৫২)।

কোন কোন তাফসীরকারকের মতে, আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে; কারণ তিনিই ফেরেশতার মাধ্যমে সংরক্ষণ করেন।

প্রথম মতের স্বপক্ষে একাধিক আয়াত, যেমন: সূরা আল-আনয়াম এর ৬১, সূরা ইনফিতার এর (১০-১১) এবং সূরা ক্বফ এর (১৭-১৮) নাম্বার আয়াত থাকার কারণে, এ মতটি গ্রহণযোগ্য। (আল-মুনীর: ৩০/১৭৬)।

অত্র সূরার সাথে পূর্ববর্তী সূরার সম্পর্ক:

আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী সূরা তথা সূরা আল-বুরুজ এর শেষের আয়াতে লাওহে মাহফুজ নিয়ে কথা বলেছেন এবং অত্র সূরা তথা সূরা তারিক্ব এর প্রথম আয়াতে আকাশ এবং উজ্জ্বল নক্ষত্রের কসম করে মানুষের আমল সংরক্ষিত রাখার বিষয়ে কথ বলেছেন। এ দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক খুবই স্পষ্ট; কারণ লাওহে মাহফুজের সংরক্ষণ আকাশ সংরক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত। অনুরূপভাবে লাওহে মাহফুজ যেমন আল্লাহর কুদরাতের বহিঃপ্রকাশ, তেমনিভাবে মানুষের আমল সংরক্ষণ করাও আল্লাহর কুদরাতের বহিঃপ্রকাশ। (*তাফসীর আল-ওয়াসিত*: ১৫/৪৯৬)।

অত্র সূরার সাথে পরবর্তী সূরার সম্পর্ক:

অত্র সূরা তথা সূরা তারিক এর শেষাংশ এবং পরবর্তী সূরা তথা সূরা আ'লা এর প্রথমাংশের দিকে তাকালে সূরা দুইটিকে একই সূরা মনে হয়। যেমন: সূরা তারিক এর শেষাংশে বলা হয়েছে "সুতরাং কাফেরদেরকে একটু সময়ের জন্য অবকাশ দাও যাতে আমি তাদেরকে মঝা বুঝাতে পারি"। আর পরবর্তী সূরা আ'লাতে কেমন যেন কাফেরদেরকে শাস্তি প্রদানের জন্য অবকাশ দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে তাসবীহ পাঠের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (*নাযমু আল-দুরার*, আল-বাক্বাভী, ২১/৩৮৮)।

পাঁচ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: পাঁচ নাম্বার আয়াতটি আবুল আসাদ্দ বিন কিলাদাহ নামক কাফির সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। বিস্তারিত বর্ণনা হলো: আবুল আসাদ্দ একদিন একটি চামড়ার উপর দাড়িয়ে কোরাইশ গোত্রকে সম্বোধন করে বললো: হে কোরাইশ! যে ব্যক্তি আমাকে এ চামড়ার উপর থেকে সড়াতে পারবে তার জন্য এত এত পুরষ্কার রয়েছে। অতঃপর বললো: নিশ্চয় মোহাম্মদ ধারণা করে যে জাহান্নামে উনিশ জন দায়িত্বশীল ফেরেশতা রয়েছে। জেনে রেখো, আমি একাই তাদের দশ জনকে প্রতিহত করার জন্য যথেষ্ট আর বাকী নয় জনকে তোমরা প্রতিহত করবে। তখন আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াত অবতীর্ণ করে তাকে জানিয়ে দিলেন দাম্ভিকতা বর্জন করে তোমার একটু ভেবে দেখা উচিৎ যে তোমাকে কোন জিনিস থেকে তৈরি করা হয়েছে। (*আসবাব আল-নুযুল*, সুয়ূতী: ৩৫৬) ।

সূরায় কসমের ব্যাখ্যা:

মানুষের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা জায়েজ নেই। আর আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে ধরাবাধা কোন নিয়ম নেই। তিনি সাধারণত যে বিষয়ে কথা বলতে চান তার সাথে সম্পর্কিত কোন বস্তুর কসম করেন। অত্র সূরায় আল্লাহ তায়ালা মহাকাশ এবং সপ্তর্ষিমন্ডল তারকার কসম করে "প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য একজন সংরক্ষণকারী ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছে" এ বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। একটি কসম বাক্যের তিনটি বিষয় থাকতে হয়: (ক) হরফে কসম, (খ) কসম বা যে জিনিসের কসম করা হয় এবং (গ) জাওয়াবে কসম বা কসমের পর যে বিষয় কথা বলা হয়। অত্র সূরায় কসমের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

- হরফে কসম: ওয়াও (আরবী হরফ)।
- কসম: মহাকাশ এবং সপ্তর্ষিমন্ডল তারকা।
- জাওয়াবে কসম: প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য একজন সংরক্ষণকারী ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছে। (*তিবইয়ান ফি আকসাম আল-কোরআন*, ইবনু জাওজিয়্যাহ: ৬৩-৬৪) ।

এখানে কসম এবং জাওয়াবে কসমের মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট; কারণ আল্লাহ তায়ালা সবচেয়ে আশ্চর্যন্বিত এবং বিশালাকার সৃষ্টির কসম করে প্রত্যেক সৃষ্টির সাথে একজন সরক্ষণকারী ফেরেশতা থাকে, সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। অত্র সূরার প্রথম চার আয়াত থেকে বুঝা যায় মানবজাতি সহ প্রত্যেক সৃষ্টিকে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাদের গোপন-প্রকাশ্য সকল কৃতকর্মকে হাশরের ময়দানে পেশ করার জন্য সংরক্ষণ করেন। অত্র আয়াতে কসম করে উপস্থাপন করার মাধ্যমে বিষয়টিকে অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এছাড়াও সূরা আনআম এর (৬১) নাম্বার আয়াতে, সূরা ইনফিতার এর (১০-১১) নাম্বার আয়াতে এবং সূরা ক্বফ এর (১৭-১৮) নাম্বার আয়াতে এ বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। (*আল-মুনীর: ৩০/১৭৯*) ।

২। অত্র সূরার (৫-৮) নাম্বার আয়াতে হাশরের ময়দানে বিচার প্রক্রিয়ার জন্য মানবজাতি সহ সকল সৃষ্টিকে পুনর্জীবিত করা আল্লাহ তায়ালার জন্য সম্ভব, এর স্বপক্ষে যৌক্তিক দলীল পেশ করা হয়েছে। পুনরুত্থান দিবসকে যারা অস্বীকার করে তারা কখনও বলে: আমরা মরার পরে হাড্ডিতে পরিণত হয়ে পঁচে গেলেও কি পুনরায় উত্থিত হবো? কখনও বলে: আমরা মরে মাটির সাথে মিশে যাবো অথবা হাড্ডি হয়ে যাবো, এর পরেও কি আমাদেরকে আবার পুনরায় উত্থিত করা হবে? আবার কখনও বলে: আমাদের পিতৃপুরুষদেরকেও কি পুনরায় জীবিত করা হবে? এ ধরণের নানা প্রশ্নের বান ছুড়ে মারে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দিকে। আল্লাহ তায়ালা কোরআনের বিভিন্ন জায়গাতে এ সকল প্রশ্নের যৌক্তিক উত্তর দিয়েছেন। অত্র সূরার (৫-৮) নাম্বার আয়াতেও তাদের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে নিজেদের দেহের দিকে তাকিয়ে একটু ভাবতে বলেছেন, যা পুরুষের মেরুদন্ড থেকে দ্রুতবেগে বের হওয়া এক ফোটা বীজ্র এবং নারীর বুকের হাঁড় থেকে দ্রুতবেগে বের হওয়া এক ফোটা শুক্রাণুর মিশ্রণে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেই সত্ত্বা কোন ধরণের পূর্ব নমুনা ছাড়া প্রথমবার এত সুন্দর আকৃতিতে মানুষকে সৃষ্টি করতে পেরেছেন, সেই সত্ত্বা অবশ্যই পুনরায় কিয়ামতের ময়দানে বিচার ব্যবস্থার জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করতে পারবেন। (*আল-মুনির: ৩০/১৭৯*)।

৩। হাশরের ময়দানে মানুষের সকল কৃতকর্ম যখন প্রকাশ করে দেওয়া হবে, তখন তাদের অসহায়ত্বের চিত্র কেমন হবে তার বর্ণনা অত্র সূরার (৯-১০) নাম্বার আয়াতে রয়েছে। সেদিন মানুষের নিজস্ব কোন শক্তি থাকবে না, যা দিয়ে সে শাস্তিকে প্রতিহত করতে পারবে এবং সে এমন কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী পাবে না, যার সাহায্য ও সুপারিশ পেয়ে সে নিজেকে শাস্তি থেকে মুক্ত করতে পারবে।

৪। এ সূরার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো: একজন দায়ী বা শিক্ষক তার বক্তৃতা, দারস্, আলোচনা এবং কথা বলার সময় কোন কঠিন শব্দ বা জটিল বিষয় আসলে তা শ্রোতার জন্য ব্যাখ্যা করে দেওয়া। যেমনটা আল্লাহ তায়ালা অত্র সূরার প্রথম আয়াতে 'তারিক্ব' শব্দের শপথ করার পর পাঠকের বুঝার সুবিধার জন্য উক্ত শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

আয়াতাবলীর আমল:

(ক) দারস্ বা আলোচনার কঠিন শব্দগুলোকে শ্রোতার জন্য ব্যাখ্যা করে দেওয়া।

(খ) প্রত্যেক মানুষকে তাকে সৃষ্টির রহস্য নিয়ে গবেষণা করা।

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (١١) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (١٢) إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (١٣) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (١٤) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا (١٦) فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (١٧)﴾ [سورة الطارق: ١١-١٢].

আয়াতাবলীর আলোচ্যবিষয়: আল-কোরআন হক্ব-বাতিলের চূড়ান্ত পার্থক্যকারী।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১১	বৃষ্টিবর্ষণকারী আকাশের শপথ।	১২	শপথ বিদীর্ণ যমীনের।	১৩	নিশ্চয় তা (কোরআন)	
	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ		وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ		إِنَّهُ	
ফয়সালাকারী বাণী।	১৪	তা নয়	অনর্থক কিছু।	১৫	নিশ্চয় তারা	ভিষণ চক্রান্ত করে।
لَقَوْلٌ فَصْلٌ		وَمَا هُوَ	بِالْهَزْلِ		إِنَّهُمْ	يَكِيدُونَ كَيْدًا
১৬	আর আমিও ভিষণ কৌশল অবলম্বন করছি।	১৭	অতএব অবকাশ দাও	কাফিরদেরকে,		
	وَأَكِيدُ كَيْدًا		فَمَهِّلِ	الْكَافِرِينَ		
তাদেরকে অবকাশ দাও	কিছু সময়ের।					
أَمْهِلْهُمْ	رُوَيْدًا					

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

আল্লাহ তায়ালা বৃষ্টিবর্ষণকারী আকাশ এবং বিদীর্ন যমীনের শপথ করে বলেছেন: অবশ্যই কোরআন সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী বাণী। এটা খেল-তামাশা এবং হাসি-ঠাট্টার বস্তু নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) যে সত্য দ্বীন নিয়ে এসেছেন তা ব্যর্থ করার জন্য মক্কার কাফির-মুশরিকরা ষড়যন্ত্র করে এবং তাকে ধোকা ও প্রতারণা দেয়। আর তার সামনে এমন কথাবার্তা বলে, যা তাদের অন্তরের বিপরীত। আমিও তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে উদাসীন নয়, অচিরেই আমি তাদের চক্রান্তের যথাযোগ্য শাস্তি প্রদান করবো। হে আল্লাহর নবী! তুমি তাদের জন্য তড়িঘড়ি শাস্তির প্রার্থণা করো না; বরং তাদেরকে কিছুকাল অবকাশ দাও। আমি তাদেরকে ক্রমে ক্রমে এমন ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা তা জানতেও পারবে না। আর আমিও তাদেরকে অবকাশ দিব, নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। (আল-মোন্তাখাব: ৮৯৯, আল-তাফসীর আল-মোয়াস্সার: ১/৫৯১)।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿إِنَّهُ﴾ 'নিশ্চয় তা', অত্র আয়াতাংশের 'সর্বনাম' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'আল-কোরআনুল কারীম'। (*তাফসীর গরীব আল-কুরআন*, কাওয়ারী: ১৩/৮৬)।

﴿وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ 'আমিও কৌশল অবলম্বন করি', অত্র আয়াতের অর্থ হলো: আমি তাদের চক্রান্তের জন্য তাদেরকে যথাযোগ্য শাস্তি দেই। (*গরীব আল-কোরআন*, ইবনু কুতাইবাহ: ৪৪৯)।

﴿إِنَّهُمْ﴾ 'নিশ্চয় তারা', অত্র আয়াতাংশে 'তারা' দ্বারা উদ্দেশ্য মক্কার কাফির-মুশরিক, যারা সর্বদা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো। (*আল-মুনীর:* ৩০/১৮০) ।

উল্লেখিত আয়াতাবলীর সাথে পূর্বের আয়াতাবলীর সম্পর্ক:

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে প্রথম বার যেমনিভাবে খুব সহজে সৃষ্টি করেছেন, তেমনিভাবে দ্বিতীয় বারও তাদেরকে পুনর্জীবিত করে হাশরের ময়দানে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে সক্ষম, এ কথা পূর্বের আয়াতসমূহে প্রমাণ করার পর অত্র আয়াতসমূহে একমাত্র কোরআনই হলো সত্য-মিথ্যার চূড়ান্ত পার্থক্যকারী বাণী এ কথা ঘোষণার পাশাপাশি যারা কোরআনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে তাদের ভয়াবহ পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে। (*আল-মুনীর*: ৩০/১৮১) ।

আয়াতাবলীর কসমের ব্যাখ্যা:

মানুষের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা জায়েজ নেই। আর আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে ধরাবাধা কোন নিয়ম নেই। তিনি সাধারণত যে বিষয়ে কথা বলতে চান তার সাথে সম্পর্কিত কোন বস্তুর কসম করেন। অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশ এবং বিদীর্ণ যমীনের কসম করে দুইটি বিষয়ের ঘোষণা দিয়েছেন:
(ক) একমাত্র কোরআন হলো হক্ব-বাতিলের পার্থক্যকারী বাণী।
(খ) যারা কোরআনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে তাদের জন্য ভয়বহ পরিণতি অপেক্ষা করছে।
উল্লেখ্য যে, একটি কসম বাক্যের তিনটি অংশ থাকতে হয়: (ক) হরফে কসম, (খ) কসম বা যে জিনিসের কসম করা হয় এবং (গ) জাওয়াবে কসম বা কসমের পর যে বিষয় কথা বলা হয়। অত্র আয়াতে বিদ্যমান কসমের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

- হরফে কসম: ওয়াও (আরবী হরফ)।
- কসম: বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশ এবং বিদীর্ণ যমীন।
- জাওয়াবে কসম: একমাত্র কোরআন হলো হক্ব-বাতিলের পার্থক্যকারী বাণী এবং যারা কোরআনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে তাদের জন্য ভয়বহ পরিণতি অপেক্ষা করছে।

(*তিবইয়ান ফি আকসাম আল-কোরআন*, ইবনু জাওজিয়্যাহ: ৬৪) ।

এখানে কসম এবং জাওয়াবে কসমের মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট; কারণ আল্লাহ তায়ালা আকাশ এবং যমীনের কসম করে কোরআনের তাৎপর্য এবং এর সাথে বিরুদ্ধাচরণকারীদের পরিণতির বর্ণনা দিয়েছেন। আর এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, কোরআন সর্বদা আসমান, যমীন, এ দুইয়ের অন্তর্নিহীত বিষয় এবং যমীনের উপরে ও আকাশের নিচে বিদ্যমান মানুষ নিয়ে কথা বলে। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। কোরআন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মোহাম্মদ (সা.) এর উপর নাযিলকৃত এক জীবন্ত মোজেজা, যা মানবজাতির জন্য সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী মানদন্ড হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত

অপরিবর্তনীয় অবস্থায় হিদায়েতের আলো ছড়াতে থাকবে। যেমন: আলী (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ. فَقُلْتُ: مَا المَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ المَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ [الجن: ٢]، مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ". (رواه الترمذي: ٢٩٠٦).

অর্থাৎ: সাবধান! ফিতনা ঘনীভূত। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল ফিতনা থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? তিনি বললেন: আল্লাহর কিতাব। কারণ...

(ক) এতে তোমাদের পূর্বে যা ছিল তার ইতিহাস, পরে যা আসবে তার ভবিষ্যাৎবাণী এবং চলমান বিষয়ের সমাধান রয়েছে।

(খ) এটি সত্য-মিথ্যার পার্থক্যসৃষ্টিকারী চিরন্তন বাণী, কোন খেল-তামাশার বস্তু নয়।

(গ) দাম্ভিকতার কারণে তা ছেড়ে দিলে শাস্তি পাবে এবং এর বাহিরে হেদায়েত তালাশ করলে পথভ্রষ্ট হবে।

(ঘ) এটি আল্লাহর মজবুত রজ্জু, প্রজ্ঞাময় উপদেশ এবং সরল-সঠিক পথ।

(ঙ) কোরআন এমন বাণী যা কারো ভিতর থাকলে সে সৎপথ থেকে কখনও বিচ্যুত হবে না এবং তার জিহ্বার পদস্খলন ঘটবে না।

(চ) পন্ডিতরা এ বাণী অধ্যায়ন করলে কোন দিন পরিতৃপ্ত হবে না, বরং যত পড়বে ততই তা পড়ার আগ্রহ বাড়তে থাকবে, বারবার পড়ার কারণে একটু বিরক্ত হবে না।

(ছ) এ কোরআনের বিস্ময় কখনও শেষ হবে না, এ জন্য এ বাণী শুনে জিনরা বিরক্ত তো হয়নি, বরং সমস্বরে বলেছিলো: "আমরা একটি বিস্ময়কর কোরআন শুনেছি, যা সৎপথ দেখায়" (সূরা জিন:২)।

(জ) যে ব্যক্তি কোরআন দিয়ে কথা বলে, সে সত্য বলে।

(ঝ) যে ব্যক্তি কোরআন অনুযায়ী কাজ করে, সে পুরস্কৃত হবে।

(ঞ) যে ব্যক্তি কোরআন দ্বারা রায় দিবে অথবা দেশ শাসন করবে, সে ন্যায়পরায়ণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

(ট) যে ব্যক্তি কোরআনের দিকে আহ্বান করে, সে সৎপথের দিকে আহ্বান করে।

(সুনান আল-তিরমিযী: ২৯০৬) । ইমাম তিরমিযী বলেছেন: হাদীসটি একটি মাত্র বর্ণনায় পাওয়া যায়। শায়খ আলবানী (র.) বলেন: হাদীসটি যয়ীফ। মূলত: সনদে 'হারিস' নামক রাভী অপরিচিত হওয়ার কারণে হাদীসটি 'যয়ীফ ইয়াসীর' বা হালকা দূর্বল হয়েছে।

২। অত্র সূরার (১৫-১৬) নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের চির শত্রু মক্কার কাফের-মুশরিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তারা মোহাম্মদ (সা.) এর সাথে শত্রুতাপূর্বক তার

দাওয়াতী কাজ এবং কোরআন শিক্ষাকে বন্ধ করার জন্য ষড়যন্ত্র করতো। কখনও তারা মোহাম্মদ (সা.) কে হত্যা করার পরিকল্পনা করতো, কখনও তাকে পাগল, যাদুকর, কবি ইত্যাদি বলে গালি দিতো, আবার কখনও কোরআনকে পুরনো দিনের গল্পকথা বলে আখ্যা দিতো। ১৬ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ তায়ালা তাদের এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। কারো বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা আল্লাহ তায়ালার শান নয়। এ জন্য সকল মুফাসসির ‘আল্লাহ ষড়যন্ত্র করেন’ এর দুইটি ব্যাখ্যা করেছেন:

(ক) কাফের-মুশরিকের ষড়যন্ত্রের জবাবে আল্লাহ তায়ালা কৌশল অবলম্বন করেন। ফলে, তাদের অজান্তে এ চক্রান্তের জালে তারা নিজেরাই আটকিয়ে পড়ে।

(খ) আল্লাহ তায়ালা তাদের এ ষড়যন্ত্রের কারণে শাস্তি দিবেন। এ শাস্তি কখনও তিনি দুনিয়াতে প্রদান করেন, আবার কখনও আখিরাতের জন্য জমা করে রাখেন।

(*ফাতহুল ক্বাদীর*, শাওকানী: ৫/৫১১) ।

৪। সূরার ১৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে ষড়যন্ত্রকারী কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করে কিছু সময়ের জন্য তাদেরকে অবকাশ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এটা হলো ইলাহী প্রজ্ঞা। সুতরাং অত্র আয়াতের মূল শিক্ষা হলো: শত্রুদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণে তাড়াহুড়া না করে একটু অপেক্ষা করা। এর মাধ্যমে দুইটি উপকার হয়:

(ক) বিলম্বের কারণে শত্রু পক্ষ তাওবার সুযোগ পায়।

(খ) তাওবা নসীবে না থাকলে আরো বেশী পাপে জড়িয়ে পড়ার কারণে চুড়ান্তভাবে অপরাধীর তালিকায় নাম উঠে যায়, ফলে তার জন্য আর অজুহাত পেশ করার সুযোগ থাকে না। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

আয়াতাবলীর আমল:

(ক) কোরআন-সুন্নাহ কে জীবনের একমাত্র গাইডেন্স হিসেবে গ্রহণ করা।

(খ) শত্রুদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে তড়িঘড়ি না করে তাদেরকে একটু অবকাশ দেওয়া।

(سُورة الأعْلى)

সূরা আ'লা এর পরিচয়:

সূরার নাম:
তাফসীরকারকদের থেকে অত্র সূরার দুইটি নাম পাওয়া যায়: (ক) সূরা আ'লা এবং (খ) সূরা সাব্বিহ। (*রূহুল মায়ানী*, ১৫/৩১৩, *নাযমুদ দুরার*, ২১/৩৮৮)।
আলোচ্যবিষয়: আল্লাহর ক্ষমতা ও পবিত্রতার বর্ণনা এবং যিকরের উপকারিতা।

সূরার ফযিলত:
(ক) সূরা আ'লা এবং সূরা গাশিয়া জুমুয়াহ এবং ঈদের সালাতে তেলাওয়াত করা। যেমন: একটি হাদীসে এসেছে:

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ بِ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وَ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾، وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَيَقْرَأُ بِهِمَا" [سنن النسائي: ١٥٦٨].

অর্থাৎ: নুমান ইবনু বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ (সা.) দুই ঈদের সালাতে এবং জুমুয়ার সালাতে সূরা আ'লা এবং সূরা আল-গাশিয়াহ তেলাওয়াত করতেন। কখনও ঈদ ও জুমুয়ার সালাত একই দিনে হলে, দুই সালাতেই এই দুই সূরা পড়তেন" (*সুনান আল-নাসাই*, ১৫৬৮)।
(খ) সূরা আ'লা, সূরা কাফিরূন এবং সূরা ইখলাস বিতর সালাতে তেলাওয়াত করা। যেমন: একটি হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وَ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. (سنن النسائي: ١٧٣١).

অর্থাৎ: আব্দুর রহমান ইবনু আবজা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বিতরের সালাতে "সাব্বিহিসমা রাব্বিকার আ'লা", "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" তিলাওয়াত করতেন। (*সুনান আল-নিসাই*, ১৭৩১, সহীহ হাদীস)।
(গ) এ সূরার প্রথম চার আয়াত সাজদায় পাঠ করা, যেমন: একটি হাদীসে ওকবা (রা.) বলেন:

عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: ٧٤] قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١] قَالَ: اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ. (سنن الدارمي: ١٣٤٤).

অর্থাৎ: ওকবা ইবনু আমির (রা.) বলেন: সূরা ওয়াকিয়ার শেষ আয়াত অবতীর্ণ হলে তিনি আমাদেরকে বললেন: এ আয়াত তোমরা রুকুতে পাঠ করো। অতঃপর সূরা আ'লা অবতীর্ণ হলে তিনি আমাদেরকে বললেন: তোমরা এ সূরাটিকে সাজদারত অবস্থায় পাঠ করো" (*ইবনু মাজাহ*, ৮৮৭, হাদীস সহীহ)।

(ঘ) অত্র সূরাটি মুফাস্‌সালাত এর অন্তভুক্ত, আর মুফাস্‌সালাত সূরাগুলোকে কোরআনের অন্তর বলা হয়। যেমন: ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন:

(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].

অর্থাৎ: "প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, আর কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্‌সাল সূরাগুলো"।

(*সুনানে দারিমী*, ৩৪২০) ।

আরো একটি হাদীসে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে মুফাস্‌সালাত সূরাগুলো ইতিপূর্বে কোন নবী-রাসূলকে প্রদান করা হয়নি। যেমন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةِ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].

অর্থাৎ: "আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিষিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিষিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্‌সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি"। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪) ।

হাদীসে মুফাস্‌সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

(ঙ) এছাড়াও অত্র সূরা মুসাব্বিহাত এর অন্তভুক্ত। মোট সাতটি সূরাকে মুসাব্বিহাত বলা হয়, যেমন: সূরা ইসরা, সূরা আল-হাদীদ, সূরা হাশ্‌র, সূরা সাফ, সূরা জুমুয়াহ, সূরা তাগাবুন এবং সূরা আ'লা। রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্র সাতটি সূরা ঘুমানোর পূর্বে পাঠ করতেন। যেমন ইরবাজ ইবনু সারিয়াহ থেকে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে:

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ وَيَقُولُ: إِنَّ فِيهِنَّ آيَةً خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ (سنن الترمذي: ٢٩٢١).

অর্থাৎ: "রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘুমানোর পূর্বে মুসাব্বিহাত পড়তেন এবং তিনি বলতেন: এর মধ্যে এমন একটি আয়াত রয়েছে যা এক হাজার আয়াতের চেয়ে উত্তম" (সুনান আল-তিরমিযী, ২৯২১, হাসান) ।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ৮৭তম সূরা।

অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ৭ম সূরা, যা 'সূরা তাকভীর' এর পরে এবং 'সূরা লাইল' এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

অবতীর্ণের স্থান: অধিকাংশ তাফসীরকারকদের মতে, অত্র সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, সূরা মাক্কিয়্যাহ। (*বিতাকাত আল-তারীফ*, ৩০১) ।

আয়াত সংখ্যা: ১৯টি।

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: এ সূরাটি অবতীর্ণের একটি প্রেক্ষাপট পাওয়া যায়, যা সূরার ব্যাখ্যায় আসবে, ইনশাআল্লাহ।

﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (٤) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (٥) سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (٦) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (٧) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى (٨)﴾ [سورة الأعلى: ١-٨].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়: আল্লাহর সার্বভৌমিত্ব ও রাসূলুল্লাহকে কোরআন মুখস্থকরণ।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১	(হে নবী!) তুমি তাসবীহ পাঠ করো	তোমার সুমহান রবের নামে।	২	যিনি সৃষ্টি করেন,
	سَبِّحِ	اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى		الَّذِي خَلَقَ
অতঃপর সুসম করেন।	৩	এবং যিনি	তকদীর নির্ধারণ করেন	অতঃপর পথ দেখিয়ে দেন।
فَسَوَّى		وَالَّذِي	قَدَّرَ	فَهَدَى
৪	এবং যিনি	(চারণ-ভূমিতে) তৃণাদি উদগত করেন।	৫	তারপর তা পরিণত করেন
	وَالَّذِي	أَخْرَجَ الْمَرْعَى		فَجَعَلَهُ
কালো শুকনো খড়-কুটায়।	৬	অচিরেই আমি তোমাকে পাঠ করাবো	ফলে তুমি তা ভুলবে না।	
غُثَاءً أَحْوَى		سَنُقْرِئُكَ	فَلَا تَنْسَى	
৭	আল্লাহ যা চান তা ব্যতিত;	নিশ্চয় তিনি জানেন,	যা প্রকাশ্য	এবং যা গোপন থাকে।
	إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ	إِنَّهُ يَعْلَمُ	الْجَهْرَ	وَمَا يَخْفَى
৮	আর আমি তোমার জন্য সহজ করে দিবো	কল্যান কাজকে।		
	وَنُيَسِّرُكَ	لِلْيُسْرَى		

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সকল ধরণের শেরক এবং তাঁর সাথে বেমানান এমন গুণাবলী থেকে পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: হে নবী! তুমি তোমার সুমহান রবের পবিত্রতায় তাসবীহ পাঠ করো, যিনি তিনটি গুণের কারণে সকলের উপর সুমহান হয়েছেন:

(ক) তিনি সবকিছু সৃষ্টি করে সুবিন্যস্ত করেছেন।

(খ) তিনি সবকিছুর তকদীর নির্ধারণ করে জীবন পথ চলার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।

(গ) তিনি যমীনে গাছের চারা উদগত করে তা শুকনো কালো খড়কুটায় পরিণত করেন।

হে নবী! তুমি কোরআন কিভাবে মুখস্থ রাখবে এটা নিয়ে ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি অচিরেই তোমাকে এমনভাবে কোরআন পড়াবো, ফলে তা আর ভুলবে না। কিন্তু আমি যদি মানব কল্যানে কোন আয়াতকে রহিত করে দিতে চাই, সেক্ষেত্রে কোন আয়াতকে তোমার স্মৃতিশক্তি থেকে মুছে দিলে আলাদা কথা। এ কাজ তাঁর জন্য সম্ভব, কারণ তিনি প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সব বিষয়ে জ্ঞান রাখেন। হে নবী! আমি তোমার জন্য ইসলামী শরীয়াহকে বুঝা খুবই সহজ করে দিবো। (*আল-মোয়াস্সার*, ১/৫৯১, *আইসার*, ৫/৫৫৬-৫৫৭) ।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿غُثَاءً﴾ শব্দটির অর্থ হলো: শুকনো এবং ﴿أَحْوَىٰ﴾ শব্দের অর্থ: কালো। (*গরীব আল-কোরআন* ইবনু কুতাইবাহ, ৪৫০) ।

﴿لِلْيُسْرَىٰ﴾ 'কল্যান কাজ', আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে দুইটি মত পাওয়া যায়:

(ক) আবু বকর আল-জাজ্বায়িরী (র.) বলেন: এর দ্বারা ইসলামী শরীয়াহকে বুঝানো হয়েছে।
(খ) ওয়াহাবা আল-জুহাইলী (র.) বলেন: এর দ্বারা অহীর সংরক্ষণকে বুঝানো হয়েছে। যা পূর্বের আয়াত থেকে বুঝা যায়। (*আইসার*, ৫/৫৫৬, *আল-মুনীর*, ৩০/১৮৮) ।

সূরা আ'লা এর সাথে পূর্বের সূরার সম্পর্ক:

পূর্বের সূরা তথা সূরা তারিক এর শেষাংশ এবং অত্র সূরা তথা সূরা আ'লা এর প্রথমাংশের দিকে তাকালে সূরা দুইটিকে একই সূরা মনে হয়। যেমন: সূরা তারিক এর শেষাংশে বলা হয়েছে "সুতরাং কাফেরদেরকে একটু সময়ের জন্য অবকাশ দাও যাতে আমি তাদেরকে মঝা বুঝাতে পারি"। আর অত্র সূরা তথা সূরা আ'লাতে কেমন যেন কাফেরদেরকে শাস্তি প্রদানের জন্য অবকাশ দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে তাসবীহ পাঠের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (*নাযমু আল-দুরার*, আল-বাক্বাভী, ২১/৩৮৮) ।

সূরা আ'লার সাথে পরের সূরার সম্পর্ক:

অত্র সূরা তথা সূরা আ'লাতে ইহকালের চেয়ে পরকাল উত্তম এ কথার প্রমাণ রয়েছে। আর পরবর্তী সূরা তথা সূরা গাশিয়াতে আল্লাহ তায়ালা আখেরাতের একটি উজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরেছেন, যেখানে এক শ্রেনীর মানুষ সৌভাগ্যবান হিসেবে স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং আরেক শ্রেনী ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে স্থায়ী জাহান্নামে যাবে। সুতরাং উভয় সূরার মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট। (*তাফসীর মওজুয়ী*, মোস্তফা মুসলিম, ১০/১১৬) ।

ছয় নাম্বার আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: জিব্রাইল যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে অহী নিয়ে আসতেন, তখন জিব্রাইল (আ.) তার থেকে প্রস্থান নিতে না নিতেই তিনি ভুলে যাওয়ার ভয়ে কোরআন তেলাওয়াত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যেতেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা অত্র সূরার ছয় নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করেন। (*আসবাব আল-নুযূল*, সুয়ূতী, ৩৫৭, এ বর্ণনাটি দুর্বল) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। অত্র সূরার (২-৫) নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালার ৩টি গুণ বা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে, যা তাঁর কামালিয়াতের প্রমাণ বহণ করে:

(ক) তিনি সবকিছু সৃষ্টি করে সুবিন্যস্ত করেছেন।
(খ) তিনি সবকিছুর তকদীর নির্ধারণ করে জীবন পথ চলার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।

(গ) তিনি যমীনে গাছের চারা উদগত করে একপর্যায় তা শুকনো কালো খড়কুটায় পরিণত করেন। (*আল-মুনীর*, ৩০/১৯৩)।

২। সুমহান আল্লাহ তায়ালাকে যথাসাধ্য সম্মান প্রদর্শন করা এবং সকল প্রকার অপূর্ণাঙ্গ ও তাঁর শানে বেমানান এমন গুণ থেকে তাঁকে পবিত্রতা ঘোষণা করা সকল মানুষের উপর ওয়াজিব। বিষয়টি মানুষের ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে এর গুরুত্ব অনেক বেশী। আল্লাহ তায়ালাকে সম্মান প্রদর্শনের সাথে ভালোবাসা, ভয় এবং আশা নিহিত থাকবে, যেখানে লৌকিকতার বিন্দুমাত্র রেশ থাকবে না। আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসতে গিয়ে যেন তাঁকে তুচ্ছজ্ঞান করা না হয় সে দিকে খেয়াল রাখাও জরুরী। যেমন: আমাদের দেশে যিক্‌রের নামে প্রচলিত কিছু কার্যক্রম, যেখানে আল্লাহর শানে যায় না এমন কিছু শব্দ চয়ণ করে নাচানাচি আর ফালাফালিতে সবাই মেতে উঠে। এছাড়াও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার নামে এমন কিছু সঙ্গীত রচনা করা হয়, যার শব্দ চয়ন শুনলে মনে হয় গার্ল বা বয় ফ্রেন্ডকে নিয়ে কোন সঙ্গীত লেখা হয়েছে। এগুলো আল্লাহর সাথে রীতিমতো বেআদবীর শামীল, যার মাধ্যমে একজন মানুষ ঈমান হারা হয়ে যেতে পারে। তাহলে এখন প্রশ্ন হলো: বান্দা কিভাবে আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ঘোষণা, সম্মান প্রদর্শন, ভালোবাসা, ভয় এবং আশা প্রকাশের রিএক্ট করবে? এ বিষয়ে কিছু কথা এখানে তুলে ধরা হলো:

(ক) আল্লাহ তায়ালাকে পবিত্রতা ঘোষণার পদ্ধতি:

আল্লাহ তায়ালাকে পবিত্রতা ঘোষণার ৩টি পদ্ধতি রয়েছে:

(i) আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের ব্যাপারে কোরআনে যা বলেছেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) সহীহ সুন্নাহে যা বর্ণনা করেছেন তা কোনরুপ বিকৃতিকরণ, নিষ্ক্রিয়করণ, আকার প্রদান এবং উপমা প্রদান ছাড়া হুবহু যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেভাবে বিশ্বাস করা। যেমন: কোরানে এসেছে,

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ [سورة الشورى:١١].

অর্থাৎ: "তিনি আসমানসমূহ এবং যমীনের সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য যুগল সৃষ্টি করেছেন, তিনি পশুদের মাঝেও জোড়া সৃষ্টি করেছেন, এভাবেই তিনি সেখানে তোমাদের বংশ বিস্তার করেন, সৃষ্টিজগতের কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা" (সূরা শুরা, ১১)। (*আক্বীদা ওয়াসাতিয়্যাহ*, ইবনু তাইমিয়াহ)।

এ সম্পর্কে ইমাম মালিক (র.) এর প্রশিদ্ধ একটি কথা রয়েছে, যা সকল আলেমের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে: "অদৃশ্য বিষয়টি জ্ঞাত, তার ধরণ অজ্ঞাত, এর প্রতি বিশ্বাস করা ওয়াজিব এবং তা সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদআত"।

(ii) আল্লাহর প্রতিটি গুণকে পূর্নাঙ্গ গুণ হিসেবে বিশ্বাস করার পাশাপাশি সৃষ্টি জগতের অপূর্ণাঙ্গ, ত্রুটিযুক্ত এবং খুবই সীমিত গুণ থেকে আল্লাহ তায়ালাকে পুতপবিত্র ঘোষণা করা। যেমন: আল্লাহ তায়ালার শুনা, দেখা, জানা ইত্যাদির অর্থ হলো: তিনি একই সময়ে আদি অন্ত শুনেন, দেখেন এবং জানেন এ কথা বিশ্বাস করার পাশাপাশি সন্তান গ্রহণ করা, অন্যের

সহযোগিতার মুখোপেক্ষী হওয়া, কারো কাছে হেরে যাওয়া ইত্যাদি সৃষ্টি জগতের অপূর্ণাঙ্গ গুণ থেকে আল্লাহ তায়ালাকে পুতপবিত্র ঘোষণা করা।

পবিত্র কোরআনের অসংখ্য আয়াত রয়েছে, যেখানে আল্লাহ তায়ালার গুণের পরিপূর্ণতা বুঝাতে সরাসরি 'কামাল' শব্দটি উল্লেখ না থাকলেও তাঁর গুণের পরিপূর্ণতার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। এর স্বপক্ষে দলীল নিম্নরূপ:

(ক) আল্লাহ তায়ালা কোরআনে কারীমে নিজেকে এমন কিছু নামে ভুষিত করেছেন, তা যেমন তাঁর গুণের কামালিয়্যাত বা পূর্ণতার প্রমাণ বহণ করে তেমনিভাবে অপূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিপূর্ণ গুণ থেকে তাঁর পুতপবিত্র থাকার ইঙ্গিত বহণ করে। যেমন: আল-কুদ্দুস, আল-সালাম (সূরা হাশর, ২৩), আল-সামাদ (সূরা ইখলাস) এবং আল-হামীদ (সূরা ফাতির, ১৫) ।

(খ) আল্লাহ তায়ালা কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে তাঁর বান্দাকে তাসবীহ পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন, যার অর্থ হলো: "সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে আল্লাহকে পুতপবিত্র ঘোষণা করা"। যেমন: মুসাব্বিহাত সূরাসমূহ এবং সূরা সাফ্‌ফাত এর (১৮০-১৮২) নাম্বার আয়াত। এছাড়াও পবিত্র কোরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালার কামালিয়্যাতের বর্ণনা রয়েছে।

(iii) 'আল্লাহ তায়ালা যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পুতপবিত্র' এ কথা অন্তরে বিশ্বাস করে মুখে স্বীকৃতি প্রদান করা। যেমন: ইমাম জুহাইলী (র.) তার তাফসীর গ্রন্থে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম যখন সূরা আ'লা এর প্রথম আয়াত তেলাওয়াত করতেন বা শুনতেন, তখন তারা 'সুবহানা রাব্বি আল-আ'লা' পড়তেন। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/১৯২) । মানুষকে তাসবীহ বা আল্লাহর পুতপবিত্রতার ঘোষণা শিক্ষা দেওয়ার জন্যে সালাতের রুকুতে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম' এবং সাজদায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' পাঠ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(খ) আল্লাহ তায়ালাকে সম্মান প্রদর্শনের পদ্ধতি:

বান্দার উপর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো আল্লাহ তায়ালার মর্যাদাকে অনুধাবন করে তাদানুযায়ী সম্মান প্রদান করা। সকল নবী-রাসূলের আগমণ ঘটেছিলো তাদের সম্প্রদায়কে আল্লাহর পরিচয় ও তাঁর মর্যাদা শিক্ষা দেওয়ার জন্য। যেমন: নূহ (আ.) তার কাওমকে বলেছিলেন:

﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ [سورة نوح، ١٣].

অর্থাৎ: "কি হলো তোমাদের! তোমরা কেন আল্লাহকে যথার্থ সম্মান দিচ্ছো না?" (সূরা নূহ, ১৩)। আল্লাহর মর্যাদা বুঝে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করা হলো ইবাদতের ভিত্তি। আর আল্লাহর মর্যাদা বুঝার অন্যতম উপায় হলো নিজ এবং সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা। মানুষ যখন আল্লাহর পরিচয় ও তাঁর মর্যাদার কথা ভুলে যায়, তখন সে শিরক কাজে জড়িয়ে পড়ে। যেমন: আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ * مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [سورة الحج: ٧٣-٧٤].

অর্থাৎ: "হে মানুষ! তোমাদের উদ্দেশ্যে উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে খেয়াল করে শুনো; তোমরা যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকো, তারাতো কখনও ক্ষুদ্র একটি মাছি তৈরি করে দেখাতে পারবে না, যদিও এ কাজের জন্য তারা সকলে একত্র হয়। এমনকি একটি মাছি যদি তাদের থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়, তারা তাও উদ্ধার করে আনতে ব্যর্থ হবে। কতো দুর্বল যারা সাহায্য প্রার্থণা করে এবং যাদের কাছে সাহায্য প্রার্থণা করে। আসলে তারা আল্লাহ তায়ালাকে মূল্যায়নই করতে পারেনি, যেভাবে মূল্যায়ন করা উচিৎ ছিলো, আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই পরাক্রমশালী" (সূরা হাজ্জ, ৭৩-৭৪) । সুতরাং আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায় যে, দুনিয়াতে শান্তি এবং আখেরাতে মুক্তি পেতে হলে আল্লাহ তায়ালাকে সম্মান প্রদর্শন ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের পদ্ধতি নিম্নরূপ:

(i) আল্লাহ তায়ালার প্রতি সম্মান প্রদর্শন সূচক বাক্য মুখে উচ্চারণ করা। যেমন: 'আল্লাহু আকবার' বা আল্লাহ মহান, এ জাতীয় শব্দ সর্বদা মুখে উচ্চারণ করা। আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে তাঁর প্রতি এ প্রকার সম্মান প্রদর্শন পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য আযানে, সালাতে এবং হজ্জের মধ্যে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করার নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন।

(ii) আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের ব্যাপারে কোরআনে যা বলেছেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) সহীহ সুন্নাহে যা বর্ণনা করেছেন তা কোনরূপ বিকৃতিকরণ, নিষ্ক্রিয়করণ, আকার প্রদান এবং উপমা প্রদান ছাড়া হুবহু যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেভাবে বিশ্বাস করা। (*সূরা শুরা*, ১১)

(iii) আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় নেয়ামত স্মরণ করে শুকরিয়া স্বরূপ তাঁর বিধান মেনে নেয়া। (*সূরা আল-নাহল*, ১৮) ।

(iv) গবেষণার সাথে কোরআন তেলাওয়াত করা। (*সূরা নিসা*, ৮২/ *সূরা মোহাম্মাদ*, ২৪) ।

(v) সৃষ্টিজগত নিয়ে গবেষণাপূর্বক আল্লাহর ক্ষমতা অনুধাবন করা। (*আলে ইমরান*, ১৯০-১৯১) ।

(vi) রাসূলুল্লাহ (সা.) সহ সকল নবী-রাসূলের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা। (*সূরা বাক্বারা*, ২৮৫, *সূরা আল-ফাত্‌হ*, ৯) ।

(গ) **আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসার পদ্ধতি:**

একজন মানুষের জন্য আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসার গুরুত্ব অনেক। কারণ, তাঁর ভালোবাসা এবং সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা পেতে হলে তাঁকে প্রথমে সঠিক পদ্ধতিতে ভালোবাসতে হবে। আল্লাহকে না ভালোবেসে তাঁর থেকে ভালোবাসার আশা করা এক ধরণের মুর্খতা, এ সম্পর্কে একটি হাদীস এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (قَالَ اللَّهُ: إِذَا أَحَبَّ عَبْدِى لِقَائِى أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِى كَرِهْتُ لِقَاءَهُ) [صحيح البخاري: ٧٥٠٤].

অর্থাৎ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "আল্লাহ তায়ালা বলেন: আমার বান্দা আমার সাক্ষাত পছন্দ করলে, আমিও তার সাক্ষাত পছন্দ করি। আর সে আমরা সাক্ষাত অপছন্দ করলে, আমিও তার সাক্ষাত অপছন্দ করি"। (*সহীহ আল-বুখারী*, ৭৫০৪) । তাহলে আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসার সঠিক পদ্ধতি কি? এ সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

(i) আল্লাহ তায়ালাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসা, এ সম্পর্কে কোরআনে এসেছে:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [سورة البقرة: ١٦٥]

অর্থাৎ; “আর যারা ঈমানদার, তাদের সর্বাধিক পরিমাণে ভালোবাসা থাকবে আল্লাহ তায়ালার জন্য” (সূরা বাক্বারা, ১৬৫) ।

(ii) সকল কাজে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে অনুসরণ করা, এ সম্পর্কে কোরআনে এসেছে:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [سورة آل عمران: ٣١].

অর্থাৎ: “হে রাসূল! তুমি বলো, তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসতে চাও, তাহলে আমাকে অনুসরণ করে চলো। ফলে, আল্লাহ তায়ালাও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহরাশি মাফ করে দিবেন। আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়াবান” (সূরা আলে ইমরান, ৩১) ।

(iii) ফরজ ইবাদতের পাশাপাশি নফল ইবাদত-বন্দেগী করা, হাদীসে কুদসীতে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم –: "إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ" (صحيح البخاري: ٦٥٠٢).

অর্থাৎ: “আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: আল্লাহ তায়ালা বলেন: “যে আমার বান্দার সাথে সত্রুতা পোষণ করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা শুধু ফরজ ইবাদত পালন করার মাধ্যমে আমার কাছে প্রিয় হয়নি, বরং আমার বান্দা আমার ভালোবাসা অর্জন করেছে নফল এবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে” (সহীহ আল-বুখারী, ৬৫০২) ।

(iv) সর্বদা আল্লাহ প্রদত্ব সীমারেখার ভিতরে থাকা, সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) তিনটি বিষয়কে ঈমানের স্বাদ পাওয়ার মানদন্ড বানিয়েছেন। ৩য় নাম্বার হলো: কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মত অপছন্দ করে। (*সহীহ আল-বুখারী*, ১৬)।

(v) আল্লাহকে ভালোবাসা, যারা আল্লাহকে ভালোবাসেন তাদেরকে ভালোবাসা এবং এমন আমলকে ভালোবাসা, যা তাঁর ভালোবাসার দিকে পৌঁছে দেয়। অনুরুপভাবে তাদের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা। নিম্নের দোয়াটি রাসূলুল্লাহ (সা.) তার উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: " كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ أَحَبَّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ" [سنن الترمذي: ٣٤٩٠].

অর্থাৎ: আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: দাউদ (আ.) আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন “হে আল্লাহ! তোমার ভালোবাসা চাই, যারা তোমাকে ভালোবাসে তাদের ভালোবাসা চাই এবং এমন আমলের ভালোবাসা চাই, যা তোমার ভালোবাসার দিকে পৌঁছে দিবে”। (*সুনান আল-তিরমিযী*, ৩৪৯০) ।

একজন বান্দা উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে আল্লাহকে ভালো বাসতে থাকলে তিনি এক পর্যায়ে তাকে ভালোবাসতে শুরু করেন। আল্লাহ তায়ালা যখন কাউকে ভালোবাসেন, তখন তার মধ্যে নিম্নের নিদর্শনসমূহ পরিলক্ষিত হয়।

(ক) সাধারণ মানুষের কাছে সম্মানের পাত্র হয়ে উঠে, এ সম্পর্কে একটি হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: "إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ العَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحْبِبْهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي الأَرْضِ" [متفق عليه، البخاري: ٣٢٠٩].

অর্থাৎ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি জিবরীল (আ.) কে ডেকে বলেন: নিশ্চয় আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, কাজেই তুমিও তাকে ভালোবাসো। তখন জিবরীল (আ.)ও তাকে ভালোবাসেন এবং জিবরীল আকাশের অধিবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন। কাজেই তোমরা তাকে ভালোবাসো। তখন আকাশের অধিবাসী তাকে ভালোবাসতে থাকে। অতঃপর পৃথিবীতেও তাকে সম্মানিত করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়”। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, সহীহ আল-বুখারী, ৩২০৯) ।

(খ) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের বাহিরে কোন কাজ তার কাছে ভালো লাগে না, হাদীসে কুদসীতে এসেছে:

"فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا" [صحيح البخاري: ٦٥٠٢].

অর্থাৎ: “অতঃপর আমি যখন তাকে ভালোবাসতে শুরু করি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে; আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে; আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। (*সহীহ আল-বুখারী*, ৬৫০২) ।

(গ) তার সকল দোয়া আল্লাহ কবুল করে নেন, একই হাদীসের শেষাংশে এসেছে:

"وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ" [صحيح البخاري: ٦٥٠٢].

অর্থাৎ: “সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, তবে নিশ্চয়ই তাকে আমি তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রর্থণা করে, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দান করি। আমি কোন কাজ করতে চাইলে তা করতে দ্বিধা করি না, যতটা দ্বিধা করি মু’মিন বান্দার প্রাণ নিতে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তার বেঁচে থাকাকে অপছন্দ করি” (*সহীহ আল-বুখারী*, ৬৫০২) ।

(ঘ) তার জীবনে বেশীবেশী বিপদ-আপদ আসে, আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"إِنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ" [الترمذي: ٢٣٩٦].

অর্থাৎ: "নিশ্চয় বড় বিপদের সাথে রয়েছে বড় পুরষ্কার। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা যখন কোন কাওমকে ভালো বাসেন, তখন তাদেরকে বিপদ-আপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। সুতরাং তাতে যারা সন্তুষ্ট থাকবে তাদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে এবং যারা ক্রোধ হবে তাদের জন্য আল্লাহর ক্রোধ রয়েছে" (সুনান আল-তিরমিযী, ২৩৯৬)।

(ঙ) সে আল্লাহর পথে চলতে কারো কুৎসারটনাকে ভয় পায় না, যেমন আল্লাহ বলেন:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [سورة المائدة: ٥٤].

অর্থাৎ: "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যদি কেউ তার দ্বীন থেকে মোরতাদ হয়ে যায়, তাহলে তার জায়গায় আল্লাহ তায়ালা এমন সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন যাদের তিনি ভালোবাসবেন, তারাও তাকে ভালোবাসবে, তারা হবে মু'মিনদের প্রতি কোমল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে, কোন নিন্দুকের নিন্দাকে তারা ভয় করবে না। মূলত এটা হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তাকেই তিনি তা দান করেন, আল্লাহ তায়ালা প্রাচর্যময় ও প্রজ্ঞাময়" (সূরা মায়িদা, ৫৪)।

(ঘ) আল্লাহকে ভয় এবং তাঁর কাছে আশা করার পদ্ধতি:

আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করা ঈমানের অন্যতম একটি অংশ। তিনি চান একজন মুমিন দুনিয়ার সবকিছু বাদ দিয়ে কেবল তাঁকে ভয় করবে। কিন্তু শয়তান সর্বদা মানুষকে বিভিন্ন জিনিসের ভয় দেখিয়ে আল্লাহর ভয় থেকে দুরে সরিয়ে রাখতে চায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [سورة آل عمران: ١٧٥].

অর্থাৎ: "এই হচ্ছে তোমাদের প্ররোচনাদানকারী শয়তান, সে তার অনুসারীদেরকে ভয় দেখায়। হে মুমিনগণ! তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো" (*সূরা আলে-ইমরান*, ১৭৫)। এছাড়াও পবিত্র কোরআনের সূরা মায়িদা এর ৪৪ এবং সূরা আ'রাফ এর ৯৯ নাম্বার আয়াতে তাঁকে ভয় করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহকে ভয় করার পাশাপাশি তাঁর থেকে আশা পোষণ করাও ঈমানের দাবী। কারণ, আল্লাহ তায়ালা দুষ্কৃতিকারীদেরকে জাহান্নামের যান্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন, ঠিক তার বিপরীতে নেক্কার বান্দাকে জান্নাতের চিরস্থায়ী শান্তি প্রদান করার মাধ্যমে পুরস্কৃত করবেন। এজন্য আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদানকারী এবং জাহান্নাম থেকে ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, (বাক্বারা: ১১৯, সাবা: ২৮, ফুসসিলাত: ৪)। পূর্বের সকল নবী-রাসূল নিজেদের মধ্যে আল্লাহর ভয় ও আশা লালন করতেন এবং তাদের উম্মতকে এ দিকে দাওয়াত দিতেন।

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ [سورة الأنبياء: ٩٠].

অর্থাৎ: "নিশ্চয় তারা সকলেই সৎকাজে প্রতিযোগিতা করতো, তারা আমাকে আশা ও ভীতির সাথে ডাকতো এবং তারা সকলে ছিলো আমার অনুগত বান্দা" (সূরা আল-আম্বিয়া: ৯০)।

উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, একজন মানুষ সর্বদা আল্লাহর শাস্তির ভয়ে হারাম বিষয়গুলো বর্জন করবে এবং তাঁর পক্ষ থেকে পুরস্কার লাভের আশায় হালাল বিষয়গুলো পালন করবে। এজন্য বলা হয়: "ঈমানের অবস্থান ভয় ও আশার মধ্যখানে"। (আল্লাহ ভালো জানেন)।

৩। অত্র সূরার (৬–৮) নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দুইটি সুসংবাদ দিয়েছেন:
(ক) তিনি জিবরীল (আ.) থেকে যা শুনবেন তা আর ভুলবেন না। তবে আল্লাহ যদি কোন আয়াতকে ভুলিয়ে দিতে চান তা ভিন্ন কথা।
(খ) ইসলামী শরীয়ার জ্ঞান বুঝা ও পালন করা তার জন্য সহজ করা হয়েছে। (*আল-মুনীর*, ৩০/১৯৩) ।
৪। ছয় ও সাত নাম্বার আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মহান শিক্ষক আল্লাহ তায়ালা তাকে কিভাবে শিক্ষা দিবেন তা বর্ণনার পর তাঁর জ্ঞানের বর্ণনা দিয়েছেন। এ থেকে বুঝা যায় কাউকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার জন্য তার যোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে। (আল্লাহ ভালো জানেন)।

উল্লেখিত আয়াতাবলী এবং সূরার আমল:

(ক) আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান এ কথা বিশ্বাস করা।
(খ) অত্র সূরার প্রথম আয়াত তেলাওয়াত করে অথবা শুনে "সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা" পাঠ করা।
(গ) অত্র সূরার প্রথম আয়াত সাজদায় পাঠ করা।

﴿فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى (٩) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى (١٠) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (١١) الَّذِي
يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (١٢) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (١٣) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ
اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (١٦) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (١٧) إِنَّ هَذَا
لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (١٩)﴾ [سورة الأعلى: ٩-١٩].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়:

উপদেশ প্রদান, আত্মশুদ্ধি এবং দুনিয়ার উপর আখেরাতের প্রাধান্য।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

৯	অতঃপর উপদেশ দাও	যদি	উপদেশ ফলপ্রসু হয়।	১০	সেই উপদেশ গ্রহণ করবে	যে
	فَذَكِّرْ	إِنْ	نَفَعَتِ الذِّكْرَى		سَيَذَّكَّرُ	مَنْ

যে (আল্লাহকে) ভয় করে।	১১	আর তা উপেক্ষা করবে	হতভাগারাই।	১২	যে প্রবেশ করবে
يَخْشَى		وَيَتَجَنَّبُهَا	الْأَشْقَى		الَّذِي يَصْلَى

মহা অগ্নিতে।	১৩	অতঃপর	সে সেখানে মরবেও না	এবং বাঁচবেও না।	১৪	অবশ্যই
النَّارَ الْكُبْرَى		ثُمَّ	لَا يَمُوتُ فِيهَا	وَلَا يَحْيَى		قَدْ

সে সাফল্য লাভ করবে,	যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে।	১৫	এবং স্মরণ করে	তার রবের নাম
أَفْلَحَ	مَنْ تَزَكَّى		وَذَكَرَ	اسْمَ رَبِّهِ

অতঃপর সালাত আদায় করে।	১৬	বরং	তোমরা প্রাধান্য দিয়ে থাকো	পার্থিব জীবনকে।
فَصَلَّى		بَلْ	تُؤْثِرُونَ	الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

১৭	অথচ আখিরাত	সর্বোত্তম	এবং স্থায়ী।	১৮	নিশ্চয়	এটা আছে	পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে।
	وَالْآخِرَةُ	خَيْرٌ	وَأَبْقَى		إِنَّ	هَذَا	لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى

১৯	ইব্রাহীম এবং মূসার সহীফাসমূহে।
	صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

সুতরাং হে আল্লাহর নবী! আপনি আপনার কওমকে কোরআন দিয়ে নসীহত করুন এবং তাদেরকে কল্যানের দিকে আহবান করুন। আর আপনি যখন তাদেরকে নসীহত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন কিন্তু তাদের থেকে কোন ইতিবাচক সারা পান না, তখন কেবল তাদেরকে নসিহত করুন যারা নসীহত গ্রহণ করবে বলে মনে করেন এবং যাদেরকে মনে হবে উপদেশ গ্রহণ

করবে না, তাদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে নিজেকে অযথা কষ্ট দিবেন না। আপনার উপদেশ ঐ সমস্ত লোকেরা গ্রহণ করবে, যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় রয়েছে। আর এ ধরণের নসীহতের মাধ্যমে তাদের মধ্যে আল্লাহ-ভীতি ও নিজেদের সংস্কারপ্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাবে।

অপরদিকে হতভাগা ব্যক্তি আপনার নসিহত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। সে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে। সেখানে সে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে মৃত্যুবরণ করবে না এবং স্বাচ্ছন্দ্যে বাঁচতেও পারবে না। আর কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে সফলকাম হবে সে ব্যক্তি, যার মধ্যে নিম্নের তিনটি গুণ পাওয়া যাবে:

(ক) শিরক, কুফর এবং সকল অসৎচরিত্র থেকে আত্মাকে পবিত্র রাখা।

(খ) সর্বাবস্থায় আল্লাহর নাম অন্তরে স্মরণ এবং মুখে উচ্চারণ করা।

(গ) আল্লাহকে স্মরণের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ সালাত সহ অন্যান্য ইবাদত প্রতিষ্ঠা করা।

হে মানবজাতি! আফশোষ তোমাদের জন্য, তোমরা উল্লেখিত সফলতার গুণে গুণান্বিত না হয়ে ক্ষণিকের এ দুনিয়ার ভোগসমগ্রীকে আখিরাতের স্থায়ী নেয়ামতের উপর প্রাধান্য দিয়ে চলছো। অথচ আখিরাত দুনিয়ার চেয়ে উত্তম; কারণ এ দুনিয়ার জীবন চোখের পলকেই শেষ হয়ে যাবে আর আখিরাতের জীবন শুরু হয়ে আর শেষ হবে না। ইব্রাহীম (আ.) এর উপর অবতীর্ণ হওয়া দশ সহীফা এবং তাওরাতের বাহিরে মুসা (আ.) এর উপর অবতীর্ণ হওয়া দশ সহীফাতে এ বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে। (*আল-মোয়াস্সার: ১/৫৯১-৫৯২, আইসার: ৫/৫৫৬-৫৫৯, আল-মুনীর: ৩০/১৯৪, ইহসানুল বায়ান: ১০৭৮*) ।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿تَزَكَّى﴾ 'যে পবিত্র হয়', আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে দুইটি মত পাওয়া যায়:

(ক) ইমাম রাযী সহ একদল তাফসীরকারক মনে করেন, এখানে পবিত্রতা দ্বারা আত্মাকে যাবতীয় কুফরী, শির্ক এবং অসৎচরিত্র থেকে পবিত্র রাখাকে বুঝানো হয়েছে। (*আল-তাফসীর আল-কাবীর*, ফখরুদ্দীন আল-রাযী: ৩১/১৩৫) ।

(খ) আরেকদল তাফসীরকারক মনে করেন, আয়াতে সদাক্বাতুল ফিত্র কে বুঝানো হয়েছে।

ইমাম শাওকানী (র.) দুইটি মতের মধ্যে প্রথম মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি কারণ হিসেবে উল্ল্যেখ করেছেন যে, সূরা আ'লা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে আর সদকাতুল ফিত্র এবং ঈদের সালাতের প্রচলন মদীনা জীবনে শুরু হয়েছে। সুতরাং আয়াতে আত্মশুদ্ধিকে বুঝানো হয়েছে। (*ফাতহুল ক্বাদীর*, শাওকানী: ৫/৫১৬) ।

﴿هَٰذَا﴾ 'এই', অত্র আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে অনেক মত পাওয়া যায়, তবে ইমাম তবারী এবং ইবনু কাসীর (র.) এর কাছে গ্রহণযোগ্য মত হলো: 'এই' অত্র আয়াতাংশ দ্বারা সূরা আ'লা এর (১৪-১৭) নাম্বার আয়াতের মর্মকে বুঝানো হয়েছে। (*ইবনু কাসীর: ৮/৩৮৩, আল-মুনীর: ৩০/১৯৫*) ।

﴿الصُّحُفِ الْأُولَىٰ﴾ 'পূর্ববতী সহীফাসমূহ' দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ সম্পর্কে দুইটি মত পাওয়া যায়:

(ক) হাসান বসরী (র.) বলেন: কোরআনের পূর্বের সকল আসমানী কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। (*তাফসীর আল-কুরতুবী*, ২০/২৪) ।

(খ) ইব্রাহীম (আ.) এর উপর অবতীর্ণ হওয়া দশটি সহীফা এবং তাওরাতের বাহিরে মূসা (আ.) এর উপর অবতীর্ণ হওয়া দশটি সহীফাকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, ১৮ নাম্বার আয়াতে "সুহুফি উলা" বলার পর ১৯ নাম্বার আয়াতে এ শব্দের ব্যাখ্যা করা করা হয়েছে।
এখানে দ্বিতীয় মতটি প্রাধান্য পাবে; কারন ইবনু কাসীর (র.) তার তাফসীরে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস নিয়ে এসেছেন, সেখানে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: (১৮–১৯) নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: "এ সবকিছুর বর্ণনা ইব্রাহীম এবং মূসা (আ.) এর সহীফায় রয়েছে"। (*ইবনু কাসীর*: ৮/৩৮৩) ।
﴿صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ﴾ "ইব্রাহীম এবং মূসা (আ.) এর সহীফা", অত্র আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য মত হলো: "ইব্রাহীম (আ.) এর উপর অবতীর্ণ হওয়া দশটি সহীফা এবং তাওরাতের বাহিরে মূসা (আ.) এর উপর অবতীর্ণ হওয়া দশটি সহীফাকে বুঝানো হয়েছে"। (*আল-মুনীর:* ৩০/১৯৯) । আসমানী কিতাব সম্পর্কে আবু জর গিফারী (রা.) এর প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: "ইব্রাহীম (আ.) আর উপর দশটি সহীফা এবং তাওরাতের বাহিরে মূসা (আ.) এর উপর দশটি সহীফা অবতীর্ণ করা হয়েছে"। (*সহীহ ইবনু হিব্বান:* ৩৬১) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। সূরা আ'লা এর শেষের ১১টি আয়াতে তিনটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে:
(ক) উপদেশ প্রদান: আল্লাহ তায়ালা নয় নাম্বার আয়াতের প্রথমাংশে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন মানবজাতিকে কোরআন দ্বারা উপদেশ প্রদান করতে। একই আয়াতের শেষাংশে তিনি বলেছেন: "যদি উপদেশ প্রদান তাদের জন্য উপকারী হয়"। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা যায় উপদেশ প্রদানের জন্য শর্ত হলো উপদেশটি ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা থাকা। এখন একটি উহ্য প্রশ্ন হতে পারে, কারো মধ্যে উপদেশ গ্রহণের মনোভাব পরিলক্ষিত হলেই কেবল তাকে উপদেশ প্রদান করা যাবে অন্যাথায় উপদেশ দেওয়া যাবে না। এ কথা কি ঠিক আছে? এ প্রশ্নের উত্তরে তাফসীরকারকদের থেকে দুইটি মত পাওয়া যায়:
(ক) ইমাম জুহাইলী (র.) বলেন: এখানে প্রকৃত অর্থে শর্তারোপ করা হয়নি। মূলত: কাফের-মোশরেকদেরকে কালেমার দাওয়াত দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বারবার তাদের কুৎসা, গাল-মন্দ এবং অত্যাচারের স্বীকার হতে হয়েছে। এর মাধ্যমে তিনি উপদেশ প্রদানের দায়িত্ব পালনের প্রথম ধাপ পূর্ণ করেছেন। চুড়ান্ত পর্যায় আল্লাহ তায়ালা তাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যদি আপনি মনে করেন তারা আপনাকে কোন ক্ষতি না করে উপদেশ গ্রহণ করবে তাহলে তাদেরকে উপদেশ প্রদানের কাজ চালিয়ে যান। (আল-মুনীর: ৩০/১৯৪) ।
(খ) ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন: আয়াতে 'ইন/যদি' শর্তের শব্দটি 'কদ/অবশ্যই' অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ: সুতরাং "আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, উপদেশ অবশ্যই উপকারে আসবে"। (তাফসীরে কুরতুবী: ২০/২০) ।
সুতরাং বুঝা গেল উপদেশ প্রদান উপকারে আসুক বা না আসুক, সর্বাবস্থায় তা চালিয়ে যেতে হবে। তবে বিশেষ কোন পরিস্থিতির স্বীকার হলে, উপদেশ কাজে আসবে কিনা তা বিবেচনায় রেখে উপদেশ প্রদান করতে হবে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, কারা কোরানের উপদেশ গ্রহণ করে এবং কারা তা বর্জণ করে? এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তায়ালা (১০-১১) নাম্বার আয়াতে বলেছেন: যারা আল্লাহকে ভয় করে কেবল তারা উপদেশ গ্রহণ করে অপরদিকে যারা তাঁকে ভয় করে না এমন হতভাগারা তা বর্জণ করে।

এখানে আরেকটি উহ্য প্রশ্ন হতে পারে, যারা কোরআনের উপদেশ বর্জণ করে, ক্বিয়ামতের দিন তাদের পরিণতি কি হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে (১২-১৩) নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন: তারা জাহান্নামের লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে, অতঃপর সেখানে তারা মরার মাধ্যমে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাবে না এবং স্বাচ্ছন্দ্যে বাঁচবেও না।

সুতরাং এক কথায় বলা যায় যে, সর্বাবস্থায় কোরআনের উপদেশ প্রদান করা ওয়াজিব। এ উপদেশ কেবল মোত্তাকীগণ গ্রহণ করে আর হতভাগারা তা বর্জণ করে। আর যারা তা বর্জণ করে তারা জাহান্নামী।

(খ) আখেরাতে সফলতা অর্জন: আল্লাহ তায়ালা (১৪-১৫) নাম্বার আয়াতে আখেরাতে সফলতা অর্জণের জন্য তিনটি গুণ বর্ণনা করেছেন: (i) আত্মশুদ্ধি, (ii) আল্লাহর স্মরণ এবং (iii) সালাত পালন। নিম্নে এ তিন প্রকার গুণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হলো:

(i) আত্মশুদ্ধি: অত্র সূরার ১৪ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে, যারা নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ রাখবে তারা আখিরাতে সফল হবে। এখন প্রশ্ন হলো কে আত্মাকে পরিশুদ্ধ রাখে আল্লাহ তায়ালা নাকি মানুষ নিজেই?

এ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের পূর্বে একটি ছোট ভূমিকা দরকার, তা হলো: দার্শনিকগণ মনে করেন, মানুষ যখন জন্ম নেয় তখন তাদের অন্তর আয়না এর মত পরিষ্কার থাকে এবং বালেগ হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থায় থাকে। প্রাপ্তবয়স্কে উপণিত হওয়ার পর গুনাহের কাজ করলে প্রতিটি গুনাহের জন্য অন্তরের উপর একটি কালো দাগ পরে যায়। ফলে গুণাহের পরিমাণ বেশী হলে অন্তর কলুষিত হয়ে কদর্য হয়ে যায়। অপরদিকে ভালো কাজ করলে অন্তর পরিষ্কার থাকে। দুএকটি গুনাহ হয়ে গেলে দুএকটি কালো দাগ পরে যায় এবং পরবতীতে সৎআমল করলে কালো দাগ দুর হয়ে যায়। এখন মূল উত্তরে ফিরে যাওয়া যাক, মূলত একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই মানুষের সৎআমল, যিকর-অযকার, তাওবা-ইস্তেগফার ইত্যাদির আলোকে তাদের অন্তরকে পরিষ্কার রাখেন এবং কদর্য হয়ে গেলে তা পরিচ্ছন্ন করে দেন, যা দুনিয়ার কোন মানুষ করতে পারে না। কারণ তিঁনি হলেন অন্তর্যামী, তিনি অন্তরের ভেদ সম্পর্কে জানেন। যেমনটা সূরা শামস্ এর নয় নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে। এছাড়াও এ ব্যাপারে কোরআনের অন্য আয়াতে এসেছে:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ [سورة النساء: ٤٩].

অর্থাৎ: "হে নবী! তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করে? বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে পবিত্র করেন। আর তাদেরকে সুতা পরিমাণও যুলম করা হয় না"। (সূরা নিসা, ৪৯) । অন্য একটি আয়াতে দেখতে পাই, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [سورة النجم: ٣٢].

অর্থাৎ: "যারা ছোটখাটো দোষ-ত্রুটি ছাড়া বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে, নিশ্চয় তোমার রব ক্ষমার ব্যাপারে উদার; তিনি তখন থেকেই তোমাদের ব্যাপারে ভালোভাবে জানেন যখন তিনি তোমাদেরকে এ পৃথিবী থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা ছিলে মাতৃগর্ভে। সুতরাং তোমরা নিজেদেরকে পূতপবিত্র মনে কর না, তিনিই তোমাদের তাকওয়ার ব্যাপারে ভালো জানেন" (*সূরা নাজম*, ৩২)। একটি হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর কাছে অন্তর পবিত্র রাখার জন্য দোয়া করতেন:

(اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا) [صحيح مسلم: ٢٧٢٢].

অর্থাৎ: "হে আল্লাহ! আমার অন্তরে তাকওয়া ঢেলে দাও এবং তাকে পরিশুদ্ধ করে দাও, আপনিই উত্তম পরিশুদ্ধকারী, আপনিই তার মালিক" (*সহীহ মুসলিম*, ২৭২২) ।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের আলোকে বলা যায় বান্দার সৎআমল এবং যিক্‌র-আযকারের আলোকে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে পারেন। মানুষের প্রসংশা এবং কোন শায়খ বা পীর ফায়েজ-তাওজ্জুহ প্রদানের মাধ্যমে কারো আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে পারেন না। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

এখন একটি প্রশ্ন হতে পারে মানুষ কি কাজ করলে আল্লাহ তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেন?

কোরআন-সুন্নাহের আলোকে বুঝা যায়, মানুষ নিম্নের কাজগুলো ইখলাসের সাথে পালন করলে আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দেন:

(ক) শিরক, কুফর এবং বিদআত থেকে বিরত থেকে ঈমান গ্রহণপূর্বক আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক আদিষ্ট বিষয়গুলো পালন করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বর্জন করা। সূরা বাক্বারা এর ১২৯ নাম্বার আয়াত, সূরা আলে ইমরান এর ১৬৪ নাম্বার আয়াত এবং সূরা জুমুয়াহ এর ২ নাম্বার আয়াতে 'রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে সৎপথের আদেশ দিবেন এবং অসৎ পথ থেকে নিষেধ করবেন। (*তাফসীরে ইবনু কাসীর*, ২/১৫৮) ।

(খ) বেশী বেশী আল্লাহর যিক্‌র। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু আমর থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةً، أو صقالة، وَإِنَّ سِقَالَةَ، أو صقالة الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللهِ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ) [صحيح الترغيب والترهيب للألباني: ١٤٩٥، شعب الإيمان للبيهقي: ٥١٩].

অর্থাৎ: "প্রত্যেক জিনিস পরিষ্কার করার যন্ত্র আছে, আর অন্তর ছাফ করার যন্ত্র হলো: আল্লাহর যিক্‌র। আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে আল্লাহর যিক্‌র এর চেয়ে অধিক কার্যকারী আর কোন জিনিস নেই" (*সহীহ আল-তারগীব*, আলবানী, ১৪৯৫/ *শুয়াবুল ঈমান*, আল-বায়হাক্বী, ৫১৯) । অত্র হাদীসকে ইমাম আলবানী (রহ.) 'সহীহ লিগাইরিহি' বলেছেন।

এছাড়াও আরো কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলোকে ওলামায়ে কিরাম অন্তর পরিশুদ্ধ করার মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন:
(ক) জুহদ বা আখেরাতের পথে বাধা হয় এমন বিষয়কে এড়িয়ে চলা।
(খ) শুদ্ধ বা দলীলভিত্তিক জ্ঞান ও আমল।
(গ) দিনের বিশেষ কোন সময়ে দুনিয়ার সকল কিছু থেকে আলাদা হয়ে আল্লাহর ধ্যানে থেকে আত্মসমালোচনা করা।
উল্লেখ্য যে, কোরআনের ভাষ্যানুযায়ী মানুষের অন্তর তিন প্রকার, যেমন: (ক) নাফ্‌স মোতমায়েন্না, যা সৎআমল ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করে না, এটা জান্নাতী আত্মা। (খ) নাফ্‌স লাউয়্যামাহ, যা সৎআমলের পাশাপাশি শয়তানে কুমন্ত্রনায় বদআমলে নিমজ্জিত হলেও আবার তাওবা করে নিজেকে শোধরিয়ে নেয়। এটা সম্ভাবনার জায়গায় হয়তো জান্নাতী না হয় জাহান্নামী। (গ) নাফ্‌স আম্মারাহ, যা বদআমল ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করে না, এটা জাহান্নামী আত্মা। এ বিষয় জানার মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে পরিমাফ করতে পারবো আমরা কোন ধরণের আত্মা বহণ করে আছি। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।
(ii) আল্লাহর স্মরণ: আখিরাতে মুক্তি পাওয়ার জন্য দ্বিতীয় আমল হলো: আল্লাহর স্মরণ। এর ফযিলত অপরিসীম। যিক্‌রের বৈঠক ফেরেশতা দ্বারা বেষ্টন, রহমত দ্বারা আচ্ছাদন, স্মরণকারীর উপর প্রশান্তি বর্ষণ এবং আল্লাহ কর্তৃক তাঁর নিকটস্থ ফেরেশতাদের সাথে তাদের সম্পর্কে কথন সহ অনেক তাৎপর্য রয়েছে। যেমন: সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে এসেছে:
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عنه-، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ" (صحيح مسلم: ٢٧٠٠).
অর্থাৎ: আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “একটি দল আল্লাহর স্মরণে বসলে ফেরেশতা তাদেরকে ঘিরে রাখে, তাদেরকে রহমত আচ্ছাদিত করে ফেলে, তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ তাঁর নিকটস্থ ফেরেশতাদের সাথে তাদের প্রশংসা করেন” (*সহীহ মুসলিম*: ২৭০০) ।
এছাড়াও অন্তরকে প্রশান্ত রাখতে এবং তাকে পরিশুদ্ধ করতে যিক্‌রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [سورة الرعد: ٢٨].
অর্থাৎ: “ঈমানদারদের অন্তর আল্লাহর যিক্‌র এ প্রশান্ত হয়, জেনে রেখো, একমাত্র আল্লাহর যিক্‌রই মানুষের অন্তরসমূহকে প্রশান্ত করে” (সূরা র’দ: ২৭) । শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাক্বী তে একটি প্রশিদ্ধ হাদীস রয়েছে, যা আত্মশুদ্ধি অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।
আল্লাহ তায়ালা কোরআনের অসংখ্য আয়াতে তাঁর বান্দাকে যিক্‌র করার নির্দেশ দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হলো: আল্লাহকে আমরা কিভাবে স্মরণ করবো? কোরআন এবং সহীহ সুন্নাহের আলোকে আল্লাহকে স্মরণ করার পদ্ধতি নিম্নে তুলে ধরা হলো:
(ক) ব্যাপকার্থে আল্লাহর যিক্‌র: সকল প্রকার ইবাদত-বন্দেগী এবং নেকআমল যখন একান্তভাবে আল্লাহর জন্য করা হয়, তখন তা ব্যাপকার্থে আল্লাহর স্মরণ হিসেবে ধর্তব্য হয়। যেমন: সালাত কায়েম, সিয়াম সাধন, যাকাত প্রদান, কোরআন তেলাওয়াত, তাসবীহ-

তাহলীল, তাওবা-ইস্তেগফার, অন্যের উপকার, ভালো কাজের নির্দেশ ও খারাপ কাজ থেকে নিষেধ প্রদান, সৃষ্টিজগৎ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা ইত্যাদি সকল কাজই আল্লাহর যিক্‌র। কারণ, এ সকল কাজ আল্লাহর স্মরণে পালন করা হয়। এ সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (র.) বলেন: "আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্তর যা কল্পনা করে, জিহ্বা যা বলে এবং অঙ্গপ্রতঙ্গ যা করে সবই আল্লাহর যিক্‌র এর অন্তর্ভুক্ত"। (*মাজমুউল ফাতাওয়া*, ইবনু তাইমিয়াহ, ১০/৬৬১) ।

(খ) বিশেষার্থে আল্লাহর যিক্‌র: আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক কোরআনে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে সহীহ সুন্নাহে আল্লাহর যিক্‌র করার জন্য যে শব্দ বা বাক্য বর্ণিত হয়েছে তা আন্তরিকভাবে উচ্চারণ করা বিশেষার্থে আল্লাহর যিক্‌র এর অন্তর্ভুক্ত। কোরআন এবং সহীহ সুন্নাহে আল্লাহর যিক্‌র এর জন্য যে বাক্য এসেছে তার বাহিরে অন্য কোন বাক্য বা শব্দ রচনা করে আল্লাহর স্মরণে পাঠ করা হলে তাকে ব্যাপকার্থে যিক্‌র বলা হলেও বিশেষার্থে যিক্‌র বলা যাবে না। এ প্রকার যিক্‌র এর দুইটি অবস্থা রয়েছে:

প্রথমত: সময়, স্থান এবং অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত, যেমন: সকাল-সন্ধার যিক্‌র, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরের যিক্‌র, ঘুমাতে যাওয়া ও ঘুম থেকে ওঠার যিক্‌র, খাবার শুরু ও শেষের যিক্‌র, মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার যিক্‌র ইত্যাদি। এ ধরনের যিক্‌র রাসূলুল্লাহ (সা.) যে সময়/ স্থান/ অবস্থায় যে বাক্য ব্যবহার করে যেভাবে পালন করেছেন আমাদেরকেও ঠিক সেভাবে পালন করতে হবে। অন্যথায় তা যিক্‌র হিসেবে গণ্য হবে না। এ প্রকার যিক্‌র সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য হিসনুল মুসলিম এবং আযকার লিন নাওয়াভী কিতাবের সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত: সময়, স্থান এবং অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত নয়, যেমন: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর যিক্‌র, কোরআন তেলাওয়াত, তাওবা-ইস্তেগফার, তাসবীহ-তাহলীল, তাকবীর ধ্বনী, একত্ববাদের ঘোষণা, কোরআনে বর্ণিত আযকার পাঠ, যিক্‌র এর মাজলিস ইত্যাদি। এ প্রকার যিক্‌র এর সমর্থনে কোরআন-সুন্নাহে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে। যেমন কোরআনের একটি আয়াতে এসেছে:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [سورة الأحزاب: ٤١].

অর্থাৎ: "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে বেশী-বেশী স্মরণ করো" (সূরা আহযাব: ৪১) । সূরা নিসা এর ১০৩ নাম্বার আয়াতে এসেছে:

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [سورة النساء: ١٠٣].

অর্থাৎ: "অতঃপর তোমরা যখন সালাত শেষ করে নিবে, তখন দাড়িয়ে, বসে এবং শোয়া অবস্থায় আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করবে। এরপর যখন পুরোপুরি স্বস্তি বোধ করবে, তখন সালাত আদায় করবে। অবশ্যই সালাত ঈমানদারদের উপর সুনির্দিষ্ট সময়ের সাথেই ফরয করা হয়েছে" (সূরা নিসা: ১০৩) । অনুরূপ অর্থে সূরা আলে ইমরান এর ১৯১ নাম্বারে একটি আয়াত এসেছে। অত্র আয়াতে মুমিনদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আল্লাহকে বেশী-বেশী স্মরণ করতে। প্রায় সকল তাফসীর গ্রন্থে 'বেশী-বেশী' এর ব্যাখ্যা করেছেন 'সর্বদা' শব্দ দিয়ে।

এছাড়া সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে দেখতে পাই রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বদা আল্লাহর যিক্‌র করতেন। আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন:

"كَانَ النَّبِيُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ" (صحيح مسلم: ٣٧٣).

অর্থাৎ: "রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বদা আল্লাহর যিক্‌র করতেন" (সহীহ মুসলিম: ৩৭৩) ।

অপরদিকে যারা আল্লাহকে কম সময়ে স্মরণ করে তাদেরকে সূরা নিসা এর ১৪২ নাম্বার আয়াতে মুনাফিক বলা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল আল্লাহর যিকরের যে বাক্যগুলো শরিয়াত কোন সময়/ স্থান/ অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করেনি, তা সর্বদা অন্তরে লালন পূর্বক মুখে উচ্চারণ করতে হবে।

(iii) সালাত পালন: আখিরাতে মুক্তির জন্য তৃতীয় আমল হলো: সালাত কায়েম করা। এটা ইসলামের পাঁচটি রুকনের দ্বিতীয় রুকন। এর গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং ফযিলত সম্পর্কে কোরআন এবং সহীহ সুন্নাহে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে, যা দ্বীনের স্তম্ভ, জান্নাতের চাবি, বান্দা ও রবের মধ্যে সেতুবন্ধনকারী ইত্যাদি সহ অসংখ্য তাৎপর্য বহণ করে।

(গ) দুনিয়ার উপর আখেরাতের প্রাধান্য: অত্র সূরার (১৬–১৯) নাম্বার আয়াতে দুনিয়াদার মানুষকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রধান্য দিয়ে থাকো, অথচ আখিরাত দুনিয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ইমাম ফখরুদ্দীন আল–রাযী (র.) তিন দিক থেকে দুনিয়ার উপর আখিরাতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন:

(i) আখিরাত মানুষের জন্য আত্মিক এবং দৈহিক দুই প্রকার প্রশান্তি অথবা শাস্তিকে স্থায়ীভাবে নিশ্চিত করে। অপরদিকে দুনিয়া এমনটি নয়, তা মানুষকে শুধু দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য অথবা সমস্যাকে স্বল্প সময়ের জন্য প্রদান করে থাকে।

(ii) আখিরাতের সুখ–শান্তি অত্যন্ত বির্ভেজাল হবে, তাতে কোন ধরণের বিরক্তি বা অস্বস্তির ছোয়া থাকবে না। অপরদিকে দুনিয়ার সুখ–সাচ্ছন্দ্য অস্বস্তি, বিরক্তি, পেরেশানী এবং ভয়–ভীতির সাথে মিশ্রিত থাকে।

(iii) আখিরাতের জীবন স্থায়ী, যা শুরু হয়ে আর শেষ হবে না। অপরদিকে এ দুনিয়ার জীবন ক্ষণিকের জন্য, যা মৃত্যু নামক বাহণ এসে এক নিমিষেই এ দুনিয়ার যাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে মানুষকে আখিরাতের জীবনে নিয়ে যায়। (*আল–তাফসীর আল–কাবীর*: ৩১/১৩৭) ।

২। যারা আখিরাতের জীবন বিসর্জন দিয়ে দুনিয়ার মোহে মত্ত আছে, তাদের জন্য অত্র আয়াতে শিক্ষা রয়েছে। আজকের সমাজের অধিকাংশ মানুষ দুনিয়াদার হয়ে গেছে। সকলে দুনিয়ার পিছনে ছুটছে। সর্বত্র শোনা যায় শুধু আরো চাই ধ্বনি। যার একটি বাড়ি আছে সে দ্বিতীয় আরেকটি বাড়ির তালাশে ছুটছে, আর যার দুটি আছে সে তৃতীয়টির জন্য অনৈতিক কাজে জড়াচ্ছে। এমনকি এক জায়গায় কয়েকজন একত্র হলে দ্বীন চর্চার পরিবর্তে দুনিয়া চর্চাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। কার কত সম্পদ আছে তা নিয়ে দাম্ভিকতার প্রতিযোগিতা। শুধু তাই নয়, আজকাল মানুষ আখিরাত চর্চা করে দুনিয়া পাওয়ার জন্য। অথচ নিয়ম ছিলো দুনিয়ার

সকল কাজ হবে আখিরাত পাওয়ার লক্ষ্যে। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, যাদেরকে দ্বীনদার আলেম, আল্লাহর পথের দায়ী এবং পীর-মাশায়েখ বলে মনে করি তাদের মধ্যেও একই দৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ রকম একটা পরিস্থিতি কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে আসবে, তা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) চৌদ্দশত বছর পূর্বে তার সাহাবাদেরকে সতর্ক করে গেছেন। সহীহ বুখারীতে উক্ববা ইবনু আমির (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا" (صحيح البخاري: ١٣٤٤).

অর্থাৎ: “আল্লাহর কসম! তোমরা আমার পরে শির্‌ক করবে এ ব্যাপারে যা আশঙ্কা করি, তার চেয়ে বেশী আশঙ্কা করি যে তোমরা পার্থিব সম্পদ লাভে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে”। (*সহীহ বুখারী:* ১৩৪৪) । সুতরাং সতর্ক থাকতে হবে দুনিয়ার মোহ যেন আমাদেরকে স্পর্শ করতে না পারে। হালাল পন্থায় আল্লাহ যে পরিমান সম্পদ দান করেন, তাতে পরিতুষ্ট থেকে এ ক্ষণিকের দুনিয়ার প্রয়োজন মিটিয়ে আখেরাতের পথে পাড়ি জমানোই একজন মুমিনের লক্ষ হওয়া উচিৎ। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

৩। অত্র সূরার শেষের দুই আয়াত থেকে বুঝা যায়, সকল নবী-রাসূলগণের আক্বীদা, ইবাদত, আখলাক, শরীয়াহ এবং মুয়ামালাত একই ছিল। শুধু সময় এবং অবস্থার ভিন্নতার কারণে কিছু পার্থক্য ছিল। আর আল্লাহ তায়ালা এর পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছেন মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ হওয়া ইসলামী শরীয়ার মাধ্যমে। (*তাফসীর আল-মুনীর:* ৩০/২০১) ।

৪। মোট ১০৪টি আসমানী কিতাব। আদম (আ.) এর উপর এসেছে ১০টি সহীফা, শীশ (আ.) এর উপর ৫০টি সহীফা, ইদ্রীস (আ.) এর উপর ৩০টি সহীফা, ইব্রাহীম (আ.) এর উপর ১০টি সহীফা এবং তাওরাত, ইনজীল, যাবুর ও কোরআন। (*ইরশাদুল উকুল*, আবু সাউদ: ৯/১৪৭) ।

৫। অত্র আয়াতসমূহে সমাজ সংশোধন এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইঙ্গিত রয়েছে। সমাজে অশান্তির মূল কারণ হলো: দুনিয়া, সম্পদ এবং ক্ষমতার লোভ। সমাজের মানুষ যখন দুনিয়ার উপর আখিরাতের জীবনকে প্রধান্য দিয়ে আখিরাত ভিত্তিক জীবন গড়বে, তখন এ ক্ষণিকের দুনিয়ায়ার প্রাচুর্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং ক্ষমতার লোভ থেকে সে আস্তে আস্তে আখিরাতের দিকে ঝুকে পড়বে। সমাজের সকল মানুষ যখন আখিরাতমুখী হবে, তখন ক্ষমতা গ্রহণের জন্য কাউকে পাওয়া যাবে না, বরং সমাজ যাকে নেতৃত্বের আসনে বসাবে, সে সকলের কল্যানের পথে কাজ করে যাবে। ফলে দুনিয়া অর্জনের প্রতিযোগিতা কমে আসবে এবং সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

উল্লেখিত আয়াতাবলী এবং সূরার আমল:

(ক) আখিরাতে মুক্তির জন্য তিনটি কাজ করা: (ক) আত্মশুদ্ধি, (খ) আল্লাহর স্মরণ এবং (গ) সালাত কায়েম।

(খ) জুমা ও ঈদের সালাতের ১ম রাকআতে ‘আ’লা’ এবং ২য় রাকাআতে ‘গাশিয়া’ পাঠ করা।

(গ) বিতর সালাতের ১ম রাকআতে সূরা ‘আ’লা’, ২য় রাকআতে সূরা ‘কাফিরূন’ এবং ৩য় রাকআতে সূরা ‘ইখলাস’ তেলাওয়াত করা।

(سُورة الغاشية)

সূরা আল-গাশিয়াহ এর পরিচয়:

সূরার নাম:
তাফসীরকারকদের থেকে অত্র সূরার একটি মাত্র নাম পাওয়া যায়। (*তাফসীর মাওজূয়ী*, ১০/১১৫) ।
আলোচ্যবিষয়: পুনরুত্থান দিবস সত্য হওয়ার প্রমাণ।

সূরার ফযিলত: সূরা গাশিয়াহ এবং সূরা আ'লা জুমুয়ার সালাতে এবং ঈদের সালাতে তেলাওয়াত করা। যেমন: একটি হাদীসে এসেছে:

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَيَقْرَأُ بِهِمَا" [سنن النسائي: ١٥٦٨].

অর্থাৎ: নুমান ইবনু বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ (সা.) দুই ঈদের সালাতে এবং জুমুয়ার সালাতে সূরা আ'লা এবং সূরা আল-গাশিয়াহ তেলাওয়াত করতেন। কখনও ঈদ ও জুমুয়ার সালাত একই দিনে হলে, দুই সালাতেই এই দুই সূরা পড়তেন" (*সুনান আল-নাসাই*, ১৫৬৮) ।
এছাড়াও অত্র সূরাটি মুফাস্‌সালাত এর অন্তভূক্ত, আর মুফাস্‌সালাত সূরাগুলোকে কোরআনের অন্তর বলা হয়। যেমন: ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন:
(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].
অর্থাৎ: "প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, আর কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্‌সাল সূরাগুলো"।
(*সুনানে দারিমী*, ৩৪২০) ।
আরো একটি হাদীসে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে মুফাস্‌সালাত সূরাগুলো ইতিপূর্বে কোন নবী-রাসূলকে প্রদান করা হয়নি। যেমন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةِ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشاميين: ٢٧٣٤].
অর্থাৎ: "আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিষিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিষিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্‌সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি"। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪) ।
হাদীসে মুফাস্‌সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা কৃফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ৮৮তম সূরা।

অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ৬৬তম সূরা, যা 'সূরা যারিয়াত' এর পরে এবং 'সূরা কাহ্‌ফ' এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

অবতীর্ণের স্থান: সকল তাফসীরকারকদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে, অত্র সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, সূরা মাক্কিয়্যাহ। (*বিতাকাত আল-তারীফ*, ৩০৪) ।

আয়াত সংখ্যা: ২৬টি।

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: এ সূরাটি অবতীর্ণের একটি প্রেক্ষাপট পাওয়া যায়, যা সূরার ব্যাখ্যায় আসবে, ইনশাআল্লাহ।

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (٢) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (٣) تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً
(٤) تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ (٥) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (٦) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ
(٧)۞ [سورة الغاشية: ١-٧].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়: কিয়ামতের ভয়াবহতা এবং জাহান্নামীদের অবস্থা।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১	(হে নবী!) তোমার কাছে কি এসেছে	কিয়ামতের সংবাদ?	২	অনেক চেহারা	সেদিন	
	هَلْ أَتَاكَ	حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ		وُجُوهٌ	يَوْمَئِذٍ	
লাঞ্ছিত হবে।	৩	(তারা হবে) কর্মক্লান্ত,	পরিশ্রান্ত।	৪	তারা প্রবেশ করবে	জ্বলন্ত আগুনে।
خَاشِعَةٌ		عَامِلَةٌ	نَاصِبَةٌ		تَصْلَى	نَارًا حَامِيَةً
৫	(তাদেরকে) পানি পান করানো হবে	ফুটান্ত ঝর্ণা থেকে।	৬	তাদের জন্য থাকবে না		
	تُسْقَى	مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ		لَيْسَ لَهُمْ		
কোন খাবার	কাঁটাবিশিষ্ট গাছ ব্যতীত।	৭	যা পুষ্ট করবে না	এবং ক্ষুধা নিবারণ করবে না।		
طَعَامٌ	إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ		لَا يُسْمِنُ	وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ		

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

হে আল্লাহর নবী! তোমার কাছে কি কিয়ামতের সংবাদ এসেছে, যার ভয়াবহতা মানুষকে গ্রাস করবে। সেদিন কাফেররা লাঞ্ছিত, কর্মক্লান্ত এবং পরিশ্রান্ত হবে। তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। তাদেরকে ফুটান্ত ঝর্ণা থেকে গরম পানি পান করানো হবে। তাদের জন্য কাঁটাবিশিষ্ট গাছ ব্যতীত কোন খাদ্য থাকবে না। যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না। (*আল-মুন্তাখাব*, ৯০২, *আল-মোয়াস্সার*, ১/৫৯২, *আইসার*, ৫/৫৬১) ।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿وُجُوهٌ﴾ 'চেহারাসমূহ', এর দ্বারা তার সাথীকে বুঝানো হয়েছে। এখানে কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/২০৫) ।

﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ﴾ 'কর্মক্লান্ত পরিশ্রান্ত', দ্বারা দুইটি উদ্দেশ্য হতে পারে:

(ক) জাহান্নামের শাস্তির কারণে কর্মক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হবে।

(খ) দুনিয়াতে আমল করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ: দুনিয়াতে তারা অনেক আমল করেছে। কিন্তু তা বাতিল ধর্ম ও বিদআত ভিত্তিক হওয়ার কারণে তা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে পারেনি। (*তাফসীর গরীব আল-কোরআন*, আল-কাওয়ারী, ৩/৮৮) ।

﴿ضَرِيعٍ﴾ 'কাটাযুক্ত গাছ', এটা সৌদিআরবে উৎপাদিত এক প্রকার গাছ, যা স্বাধে অতি তিক্ত এবং বদমজাদার। অপরিক্ক বা কাচা অবস্থায় তাকে 'শিবরিক' বলে এবং শুকিয়ে গেলে বলা হয় 'দরী'।

যতক্ষণ কাচা থাকে উট তা ভক্ষণ করে, শুকিয়ে গেলে উট তা ভক্ষণ করতে সক্ষম হয় না, কারণ তা বিষ এ পরিণত হয়। এটা জাহান্নামীদের প্রধান খাদ্য হবে, যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/২০৪) ।

সূরা গাশিয়ার সাথে পূর্বের সূরার সম্পর্ক:

পূর্বের সূরা তথা সূরা আ'লা এ ইহকালের চেয়ে পরকাল উত্তম এ কথার প্রমাণ রয়েছে। আর অত্র সূরা তথা সূরা গাশিয়াতে আল্লাহ তায়ালা আখেরাতের একটি উজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরেছেন যে সেখানে এক শ্রেনীর মানুষ সৌভাগ্যবান হবে ও আরেক শ্রেনী ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং একদল স্থায়ী জান্নাতে যাবে ও আরেকদল স্থায়ী জাহান্নামে যাবে। সুতরাং উভয় সূরার মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট। (*তাফসীর মওজুয়ী*, মোস্তফা মুসলিম, ১০/১১৬) ।

সূরা গাশিয়ার সাথে পরের সূরার সম্পর্ক:

অত্র সূরা তথা সূরা গাশিয়াতে আল্লাহ তায়ালা অপরাধী কাফের-মুশরিক সহ সকল সৃষ্টি তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে কৃতকর্মের হিসাব দিবে এ কথা বর্ণনার মাধ্যমে কাফেরদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। আর পরবর্তী সূরা তথা সূরা ফাজ্‌র এ কয়েকটি মহান বিষয়ে কসম করার মাধ্যমে তাদের থেকে হিসাব গ্রহণের চিত্র বর্ণনা করেছেন, যা দুনিয়া থেকেই শুরু হয়েছে। (*আল-নাযম আল-দুরার*, বাক্বায়ী, ৮/৪১৩) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। অত্র সূরায় 'গাশিয়াহ' দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ সম্পর্কে ফখরুদ্দীন রাজী (র.) থেকে তিনটি মত পাওয়া যায়:

(ক) 'গাশিয়াহ বা আচ্ছন্নকারী' কিয়ামতের একটি নাম, কারণ এ দিনের ভয়াবহতা সবকিছুকে মুহূর্তের মধ্যে আচ্ছন্ন করে ফেলবে।

(খ) 'গাশিয়াহ' হলো: জাহান্নাম। কারণ জাহান্নাম তার অধিবাসীকে গ্রাস করে ফেলবে (সূরা ইব্রাহীম, ৫০/ সূরা আরাফ, ৪১) ।

(গ) 'গাশিয়াহ' হলো: জাহান্নামের অধিবাসী।

ফখরুদ্দীন রাযী (র.) প্রথম মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (*আল-তাফসীর আল-কাবীর*, ৩১/১৩৮) । এছাড়াও পবিত্র কোরআনে দেখা যায় বিশটির বেশী কিয়ামতের নাম বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে নিম্নের নামগুলো এক বার করে বর্ণিত হয়েছে:

আল-গাশিয়া বা আচ্ছন্নকারী (সূরা আল-গাশিয়া, ১), আল-ক্বারিয়াহ (সূরা আল-ক্বারিয়াহ, ১), আল-হাক্কাহ (সূরা আল-হাক্কাহ, ১), তাম্মাতুল কুবরা বা বড় বিপদ (সূরা নাযিয়াত, ৩৪), আল-স্যাখ্খাহ বা চিৎকার, (সূরা আবাসা, ৩৩), ইয়াওমুল ওয়াইদ (সূরা ক্বাফ, ২০), ইয়াওমুল মাওউদ (সূরা বুরূজ, ২), ইয়াওমুল হাসরা, (সূরা মারয়াম, ৩৯), ইয়াওমুত তানাদ (সূরা গাফির, ৩২), ইয়াওমুত তালাক্ব (সূরা গাফির, ১৫), ইয়াওমুত তাগাবুন (সূরা তাগাবুন, ৯) এবং ইয়াওমুল খুলূদ (সূরা ক্বাফ, ৩৪)।

এবং নিম্নের নামসমূহ একাধিক বার বর্ণিত হয়েছে:

ইয়াওমুল ক্বিয়ামাহ (সূরা ঝুমার, ১৫), আল-ইয়াওমু আল-আখির (সূরা তওবা, ১৮), আল-সাআহ (সূরা রূম, ৫৫), ইয়াওমুল বা'সি (সূরা রূম, ৫৬), ইয়াওমুল ফাসলি (সূরা সাফ্‌ফাত, ২১), ইয়াওমুদ দ্বীন (সূরা সাফ্‌ফাত, ২০), ইয়াওমুল জাময়ি (সূরা শুরা, ৭), আল-আজিফা, (সূরা গাফির, ১৮) এবং ইয়াওমুল হিসাব (সূরা গাফির, ২৭) ।

২। অত্র সূরার পাঁচ নাম্বার আয়াতে জাহান্নামীদের পানীয় কি হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আলোচনা করেছেন। মূলত: কোন প্রাণী যখন তৃষ্ণার্থ হয় তখন সে ঠান্ডা অথবা যা গরম নয়, এমন পানি পান করে তার তৃষ্ণা মিটায়, কারণ তৃষ্ণা প্রাণীর ভিতরের এক ধরণের গরম অবস্থা, যা গরম পানি পানের মাধ্যমে দুর হয় না, বরং তা তৃষ্ণাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু আখেরাতে জাহান্নামীরা আগুনের প্রচন্ড তাপে তৃষ্ণার্থ হয়ে যখন পানি চাইবে, তখন তাদের শাস্তির তীব্রতা বাড়ানোর জন্য গরম, দুর্গন্ধযুক্ত এবং বিশ্রী রঙ্গের পানি দেওয়া হবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামীদের পাঁচ প্রকার পানীয় এর বর্ণনা করেছেন:
(ক) 'আইনুন আনিয়াহ' বা প্রচন্ড গরম ঝর্ণার পানি, এ সম্পর্কে অত্র সূরার পাঁচ নাম্বার আয়াতে বর্ণনা রয়েছে।
(খ) 'হামীম' ফুটান্ত পানি, এ প্রকার পানি দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশের সময় জাহান্নামীদেরকে আপ্যায়ন করানো হবে। যেমন কোরানে এসেছে:

﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ - فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ﴾ [سورة الواقعة: ٩٢-٩٣].

অর্থাৎ: "আর যদি সে হয় আল্লাহকে অস্বীকারকারী মিথ্যাবাদী পথভ্রষ্ট দলের, তাহলে তাকে 'হামীম' বা ফুটান্ত পানি দ্বারা আপ্যায়ণ করা হবে" (সূরা ওয়াক্বিয়া, ৯২-৯৩) ।
এবং এটা জাহান্নামের সাধারণ পানীয় হিসেবে ব্যবহার হবে। যেমন কোরআনে এসেছে:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ [سورة الأنعام: ٧٠].

অর্থাৎ: "এরাই হচ্ছে সে মানুষ, যাদের নিজেদের গুনাহ অর্জনের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে, আল্লাহকে অস্বীকার করার কারণে তাদের জন্য থাকবে ফুটান্ত পানি ও যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি" (সূরা আনয়াম, ৭০) ।
'হামীম' বা ফুটান্ত পানি পান করলে জাহান্নামীদের নাড়িভুঁড়ি কেটে পায়খানার রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। যেমন কোরআনে এসেছে:

﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ [سورة محمد: ١٥].

অর্থাৎ: "এবং তাদেরকে ফুটান্ত পানি পান করানো হবে, ফলে তাদের নাড়িভুঁড়ি কেটে যাবে" (সূরা মোহাম্মাদ, ১৫) ।
আবার কখনও হামীম বা ফুটান্ত পানির বৃষ্টি হবে, জাহান্নামীরা আনন্দ চিত্তে পান করা শুরু করবে, কিন্তু পান করার সাথে সাথে পানি প্রচন্ড গরম ও বিষাক্ত হওয়ার কারণে মুহুর্তেই তাদের নাড়িভুঁড়ি গলে পিছনের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাবে (সূরা আল-হাজ্জ, ২০/ সুনান আল-তিরমিযী, ২৫৮২)।

(গ) 'গাস্‌সাক্ব' বা জাহান্নামের নর্দমার পানি, ইমাম ক্বতাদা (র.) বলেন: গাস্‌সাক্ব দ্বারা জাহান্নামীদের পোড়া শরীরের উচ্ছিষ্ট পানি, রক্ত, পুজ, বমী এবং যিনাকারীদের লজ্জাস্থানের ময়লা যে নর্দমা দিয়ে বের হয় তাকে বুঝানো হয়েছে। জাহান্নামীরা যখন তৃষ্ণার্ত হয়ে পানি চাইবে, তখন এ নর্দমা থেকে তাদেরকে পানি দেওয়া হবে। যেমন: কোরআনে এসেছে:

﴿هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ﴾ [سورة ص: ٥٧].

অর্থাৎ: "এ হচ্ছে কাফেরদের পরিণতি, অতএব তারা তা আস্বাদন করুক, আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ" (সূরা সোয়াদ, ৫৭) । গাস্‌সাক্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "গাস্‌সাক্বের এক বালতি পানি দুনিয়াতে ছুরে মারা হলে এ পৃথিবী বসবাস অনুপোযুক্ত হয়ে যেত" (*মুসনাদে আহমাদ*, ১১৭৮৬) ।

(ঘ) 'সদীদ' বা জাহান্নামের তলদেশের নর্দমার পানি, এ প্রকার পানি অনেকটা গাস্‌সাকের মতো হলেও তার চেয়ে বেশী বিষাক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত। এটাও জাহান্নামীদের পানীয় হিসেবে ব্যবহার হবে। যেমন: কোরআনে এসেছে:

﴿مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ﴾ [سورة إبراهيم: ١٦].

অর্থাৎ: "তার পিছনেই রয়েছে জাহান্নাম, সেখানে গলিত পুঁজ জাতীয় পানি পান করানো হবে" (সূরা ইব্রাহীম, ১৬) ।

এ প্রকার পানি পান করার সাথে সাথে তাদের নাড়িভুঁড়ি গলে পায়খানার রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যাবে (মুসনাদে আহমাদ, ২২২৮৫)।

(ঙ) 'আল-মুহল' বা ফুটান্ত গলিত সীসা, জাহান্নামীরা পানীয় চাইলে দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতারা তাদেরকে সীসা গলিত পানীয় দিবে, পান করার সাথে সাথে তাদের চেহারা পুড়ে যাবে। যেমন: কোরআনে এসেছে:

﴿...إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [سورة الكهف: ٢٩].

অর্থাৎ: "আমি এ অস্বীকারকারী যালেমদের জন্য এমন এক আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার পরিধি তাদের পুরোপুরিই পরিবেষ্টন করে রাখবে। যখন তারা পানির জন্য ফরিয়াদ করতে, তখন এমন এক গলিত সীসার মতো পানীয় তাদের দেওয়া হবে, যা তাদের সমস্ত মুখমন্ডল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিবে। কি ভিষণ হবে সে পানীয় আর কি নিকৃষ্ট হবে তাদের আশ্রয়ের স্থানটি" (সূরা কাহাফ, ২৯) ।

৩। অত্র সূরার ছয় এবং সাত নাম্বার আয়াতে জাহান্নামীদের খাবার কি হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আলোচনা করেছেন। জাহান্নামীরা যখন ক্ষুধার্ত হবে, তখন ক্ষুধা মিটানোর জন্য খাবার খুঁজবে। অতঃপর তাদেরকে এমন খাবার প্রদান করা হবে, যা তাদের ক্ষুধা তো নিবারণ করবেই না রবং ক্ষুধার কষ্ট আরো বাড়িয়ে দিবে। পবিত্র কোরানে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামীদের জন্য চার প্রকার খাবারের বর্ণনা দিয়েছেন:

(ক) দরী বা কাটাযুক্ত বিষাক্ত গাছ, এ গাছটি সৌদিআরবে উৎপাদন হয়, যা স্বাধে অতি তিক্ত এবং বদমজাদার। অপরিপক্ক বা কাচা অবস্থায় তাকে ‘শিবরিক’ বলে এবং শুকিয়ে গেলে বলা হয় ‘দরী’। যতক্ষণ কাচা থাকে উট তা ভক্ষণ করে, শুকিয়ে গেলে উট তা ভক্ষণ করতে সক্ষম হয় না, কারণ তা বিষ এ পরিণত হয়। এটা জাহান্নামীদের প্রধান খাদ্য হবে, যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/২০৪) । জাহান্নামীদের এ প্রকার খাবারের বর্ণনা অত্র সূরার (৬-৭) নাম্বার আয়াতে রয়েছে।

(খ) যাক্কুম, এটা এক প্রকার গাছ, যা জাহান্নামের নর্দমায় ময়লা আবর্জনার মধ্যে জন্মায় এবং আগুন ও ময়লা খেয়ে বড় হয়। তার ফলগুলো দেখতে শয়তানের মাথার মত। এটা আগুন ছাড়া বাঁচতে পারে না। তা দেখতে খুবই কুৎসিত ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়। যেমন: আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (٦٤) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (٦٥)﴾ [سورة الصافات: 64-65].

অর্থাৎ: “মুলত: তা হচ্ছে এমন একটি গাছ, যা জাহান্নামের তলদেশ থেকে উদগত হয়। তার ফলগুলো এমন বিশ্রী হবে, তা বুঝি একেকটা শয়তানের মাথা” (সূরা সাফ্‌ফাত, ৬৪-৬৫) ।

এটা এমন জাহান্নামীদের খাবার হবে, যারা দুনিয়াতে অন্যের প্রতি অত্যাচার করতো। যখন তারা এ খাবারটি খাবে, তখন তাদের পেটের নাড়িভুঁড়ি টগবগ করতে থাকবে, যেমনিভাবে জ্বলন্ত চুলার উপর রাখা পাত্রের পানি টগবগ করে থাকে। যেমন: কোরআনে এসেছে:

﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (٦٢) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (٦٣)﴾ [سورة الصافات: ٦٢-٦٣].

অর্থাৎ: “জান্নাতীদের জন্য মেহমানদারী ভালো নাকি আযাবের যাক্কুম বৃক্ষ ভালো? নিশ্চয় আমি যাক্কুমকে যালিমদের জন্য বিপদস্বরূপ বানিয়ে রেখেছি” (সূরা সফ্‌ফাত, ৬২-৬৩) ।

অপর একটি আয়াতে এসেছে, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ - طَعَامُ الْأَثِيمِ - كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ - كَغَلْيِ الْحَمِيمِ﴾ [سورة الدخان: ٤٣-٤٦].

অর্থাৎ: “নিশ্চয় জাহান্নামে যাক্কুম নামের একটি গাছ আছে। তা হবে পাপীদের জন্য সেখানকার খাদ্য। গলিত তামার মতো তা পেটের ভিতর ফুটতে থাকবে। তা হবে ফুটান্ত গরম পানির মতো” (সূরা দুখান, ৪৩-৪৬) ।

যাক্কুম গাছটি এতই কুৎসিত ও দুর্গন্ধযুক্ত যে তার একটি টুকরা পৃথিবীতে ফেলা হলে তা মানুষের জন্য বসবাস অনুপোযোগী হয়ে যেত। যেমন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"لو أن قطرةً قطِرَتْ من الزَّقّوم في الأرض لأمَرَّتْ على أهل الدنيا معيشتهم، فكيف بمن هو طعامه، وليس له طعام غيره"

(مسند أحمد، ٣١٣٦).

অর্থাৎ: “যাক্কুমের একটি টুকরা যদি পৃথিবীতে ফেলা হতো, তাহলে সেখানে বসবাস করা পৃথিবীবাসীর উপর অসম্ভব হয়ে যেত। সুতরাং যাদের খাদ্য হবে যাক্কুম, তাদের অবস্থা কেমন হবে?! অথচ তাদের জন্য যাক্কুম ছাড়া কোন খাবারই থাকবে না” (মুসনাদে আহমাদ, ৩১৩৬) ।

(গ) গিসলীন, এটা ঐ সকল জাহান্নামীদের খাবার হবে, যারা সরল পথকে বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া পথে চলতো। এটা এমন খাবার, যা অত্যন্ত গরম, দুর্গন্ধযুক্ত এবং পচা হবে। যেমন কোরআনে এসেছে:

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ (٣٦) لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ (٣٧)﴾ [سورة الحاقة: ٣٦-٣٧].

অর্থাৎ: “ক্ষতনিসৃত পুঁজ ছাড়া কোনো খাবার এখানে থাকবে না। একান্ত অপরাধী ব্যক্তিরা ছাড়া কেউই তা খাবে না” (সূরা হাক্কাহ, ৩৬–৩৭)।

(ঘ) যাা গুস্‌সাহ, এটাও জাহান্নামীদের এক প্রকার খাবার, যা গলায় আটকিয়ে যাবে। বাহিরে বের করতে পারবে না এবং ভিতরেও গিলতে পারবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন:

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا (١٢) وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا (١٣)﴾ [سورة المزمل: ١٢-١٣].

অর্থাৎ: “তাদের পাকড়াও করার জন্য অবশ্যই আমার কাছে আছে শেকল এবং শাস্তি দেওয়ার জন্য আছে জাহান্নাম। আরো আছে গলায় আটকে যাবে এমন খাবার এবং যন্ত্রণা দিবে এমন ধরণের আযাব” (সূরা মোজ্জাম্মেল, ১২–১৩)।

৪। ওয়াহাবা আল–জুহইলী (র.) বলেন: পাপীদের স্তর অনুযায়ী জাহান্নামেরও সাতটি স্তর বা দরজা হবে। কোন স্তরের পানীয় হবে আইনুন আনিয়াহ, কোন স্তরের পানীয় হবে গাস্‌সাক, কোন স্তরের পানীয় হবে সদীদ আবার কোন স্তরের পানীয় হবে মুহল। অনুরূপভাবে খাবারের মানও জাহান্নামের ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾ [سورة الحجر: ٤٤].

অর্থাৎ: “জাহান্নামের সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেকটি দরজার জন্যে থাকবে এক একটা নির্দিষ্ট অংশ” (সূরা হিজ্‌র, ৪৪)।

আয়াতাবলীর আমল:

সমাজের প্রতিটি মানুষের উচিৎ কিয়ামতের ভয়াবহ চিত্র এবং আখেরাতে কাফেরদের করুন অবস্থাকে সর্বদা স্মরণ করে আখেরাত ভিত্তিক জীবন যাপন করা। আল্লাহ তায়ালা মূলত এ উদ্দেশ্যেই পবিত্র কোরআনের প্রতি পেইজে এবং প্রতি বাক্যে আখেরাতের আলোচনা করেছেন। এর মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, কারণ একজন মানুষ যখন নিজের ভসিষ্যত পরিণতির কথা ভাবে, তখন সে নীতি নৈতিকতা বিরোধী কোন কাজ করতে পারে না।

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (٨) لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ (٩) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (١٠) لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً
(١١) فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ (١٢) فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (١٣) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (١٤) وَنَمَارِقُ
مَصْفُوفَةٌ (١٥) وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (١٦)﴾ [سورة الغاشية: ٨-١٦].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়: কিয়ামতে জান্নাত বাসীদের অবস্থা।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

<table>
<tr><td rowspan="2">৮</td><td>(পক্ষান্তরে) অনেক মুখমন্ডল হবে</td><td>সেদিন</td><td>আনন্দোজ্জ্বল।</td><td rowspan="2">৯</td><td>তাদের চেষ্টা সাধনার জন্য</td></tr>
<tr><td>وُجُوهٌ</td><td>يَوْمَئِذٍ</td><td>نَاعِمَةٌ</td><td>لِسَعْيِهَا</td></tr>
<tr><td>(সেদিন) ভীষণ খুশী হবে।</td><td rowspan="2">১০</td><td>(তারা থাকবে) সমুন্নত জান্নাতে।</td><td rowspan="2">১১</td><td>তারা শুনবে না</td><td>সেখানে</td></tr>
<tr><td>رَاضِيَةٌ</td><td>فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ</td><td>لَا تَسْمَعُ</td><td>فِيهَا</td></tr>
<tr><td>অসার বাক্য।</td><td rowspan="2">১২</td><td>সেখানে রয়েছে</td><td>প্রবাহমান ঝর্ণাধারা।</td><td rowspan="2">১৩</td><td>সেখানে (আরো) রয়েছে</td></tr>
<tr><td>لَاغِيَةً</td><td>فِيهَا</td><td>عَيْنٌ جَارِيَةٌ</td><td>فِيهَا</td></tr>
<tr><td>উঁচু উঁচু বহু খাট-পালঙ্ক।</td><td rowspan="2">১৪</td><td>এবং প্রস্তুত পান পাত্রসমূহ।</td><td rowspan="2">১৫</td><td>এবং সারি সারি বালিশসমূহ।</td></tr>
<tr><td>سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ</td><td>وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ</td><td>وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">১৬</td><td>এবং বিছানো গালিচাসমূহ।</td></tr>
<tr><td>وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ</td></tr>
</table>

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

আট নাম্বার আয়াত থেকে জান্নাতীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। কিয়ামতের দিন মুমিনদের চেহারা উজ্জ্বল হবে। তারা দুনিয়াতে হক্ব তথা সরল পথে চলতে গিয়ে যে চেষ্টা সাধনা করেছে এবং যুলম নির্যাতনের স্বীকার হয়েছে তার বিনিময়ে এখানে তারা সমুন্নত জান্নাত পেয়ে ভীষণ খুশী হবে। এ জান্নাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো:

(ক) জান্নাত উচু এলাকায় অবস্থিত আছে।
(খ) সেখানে জান্নাতীরা অনার্থক বেহুদা কোন কথাবার্তা শুনবে না।
(গ) সেখানে রয়েছে সদা প্রবাহমান ঝর্ণাধারা।
(ঘ) সেখানে রয়েছে উঁচু উঁচু বহু খাট-পালঙ্ক।
(ঙ) সেখানে জান্নাতীদের সামনে পান পাত্রসমূহ প্রস্তুত থাকবে।
(চ) সেখানে বিশ্রামের জন্য সারি সারি বালিশ রয়েছে।
(ছ) সেখানে বসার জায়গাগুলোতে বিভিন্ন ধরণের গালিচা বিছানো রয়েছে।

(*আল-মুন্তাখাব*, ৯০২, *আল-মোয়াস্সার*, ১/৫৯২, *আইসার*, ৫/৫৬১)।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿رَاضِيَةٌ﴾ ‘খুশী হয়ে যাবে’, এ আয়াতাংশের দুইটি ব্যাখ্যা হতে পারে:

(ক) যখন তারা তাদের দুনিয়ার চেষ্টা সাধনার জন্য সফল হবে, তখন তারা তাদের কর্মের প্রশংসা করবে। যেমন: কেউ যখন কোন কাজ করার দরুন পুরষ্কৃত হয়, তখন সে খুশীতে ঐ কাজের প্রশংসা করে।

(খ) যখন তারা দুনিয়ার চেষ্টা সাধনার সাওয়াব দেখবে, তখন তারা খুশী হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি অধিক গ্রহণযোগ্য। (*আল-তাফসীর আল-কাবীর*, আল-রাজী, ৩১/১৪১) ।

﴿لَاغِيَةً﴾ ‘বেহুদা’, এ আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে কয়েকটি মত পাওয়া যায়, নির্ভরযোগ্য মত হলো: জান্নাত অনার্থক কথাবার্তা এবং কাজকর্ম থেকে পূতপবিত্র, কারণ তা আল্লাহর নিকটবর্তী একটি মহা সম্মানিত স্থান। আর অনার্থক কাজকর্ম ও কথাবার্তা এ রকম স্থানের শানের বিপরীত। যেমন দুনিয়াতে শিক্ষিত ও সভ্য মহলে অসালীন ও গেয়ো কথাবার্তা মানায় না। (*আল-তাফসীর আল-কাবীর*, আল-রাজী, ৩১/১৪২) ।

﴿سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ﴾ ‘উঁচু খাট-পালাঙ্ক’, ইমাম রাজী (র.) বলেন: খাট-পালাঙ্কগুলো এমন উঁচু স্থানে সাজানো হবে যাতে জান্নাতী সেখানে বিরাজমান আল্লাহ প্রদত্ব সকল নেয়ামত একইসাথে দেখতে পারে। (*আল-তাফসীর আল-কাবীর*, আল-রাজী, ৩১/১৪২) ।

পূর্বের আয়াতাবলীর সাথে অত্র আয়াতাবলীর সম্পর্ক:

পূর্বের আয়াতসমূরহ তথা (১-৭) নাম্বার আয়াতে কিয়ামতে জাহান্নামীদের অবস্থা তুলে ধরার পর আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে শান্তনা দেওয়ার জন্য অত্র (৮-১৬) নাম্বার আয়াতে জান্নাতীদের সুখের কথা তুলে ধরেছেন। (*নাযম আল-দুরার*, আল-বাক্বায়ী,২২/৮) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। (৮-৯) নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতীদের দুইটি অবস্থা তুলে ধরেছেন, যেমন:

(ক) তাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে।

(খ) জান্নাত পেয়ে ভীষণ খুশী হবে।

এবং (১০-১৬) নাম্বার আয়াতে জান্নাতের সাতটি অবস্থা বা বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন,

(ক) জান্নাত উঁচু এলাকায় অবস্থিত আছে।

(খ) সেখানে জান্নাতীরা অনার্থক বেহুদা কোন কথাবার্তা শুনবে না।

(গ) সেখানে রয়েছে সদা প্রবাহমান ঝর্ণাধারা।

(ঘ) সেখানে রয়েছে উঁচু উঁচু বহু খাট-পালঙ্ক।

(ঙ) সেখানে জান্নাতীদের সামনে পান পাত্রসমূহ প্রস্তুত থাকবে।

(চ) সেখানে বিশ্রামের জন্য সারি সারি বালিশ রয়েছে।

(ছ) সেখানে বসার জায়গাগুলোতে বিভিন্ন ধরণের গালিচা বিছানো রয়েছে।

(*আল-তাফসীর আল-কাবীর*, আল-রাজী, ৩১/১৪১) ।

২। উল্লেখিত আয়াতে জান্নাতের সাতটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা রয়েছে। এ ছাড়াও পবিত্র কোরআনে জান্নাতের আরো অনেক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন:

(ক) জান্নাতীদের আমল ও ঈমানের পার্থক্য অনুযায়ী জান্নাত বিভিন্ন মানের হবে। যারা কিয়ামতে বিচার ব্যবস্থার পর প্রথম ধাপে জান্নাতে যাবে তাদের জান্নাতের মান হবে এক রকম এবং যারা তাদের কৃত পাপের শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে যাবে তাদের জান্নাতের মান হবে আরেক রকম। জান্নাতে মোট আটটি বাব বা স্তর রয়েছে, যার সর্বোচ্চ স্তরের নাম ‘জান্নাতুল ফেরদাউস’, রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর কাছে এ জান্নাতটি চাওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। ‘জান্নাতুল ফেরদাউস’ এর উপর আরেকটি স্তর রয়েছে যার নাম ‘ওয়াসিলা’। জান্নাতের এ স্তরে শুধু রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রবেশ করবেন। জান্নাতের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে কোরআনে এসেছে:

﴿انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ [سورة الإسراء: ٢١].

অর্থাৎ: “হে নবী! তুমি দেখো, কিভাবে আমি পার্থিব সম্পদে তাদের একজনকে আরেকজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি; অবশ্য মর্যাদার দিক থেকে আখেরাত অনেক বড়ো, তার ফযিলতও বহুলাংশে বেশী” (সূরা ইসরাা, ২১)।

﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ [سورة آل عمران: ١٦٣].

অর্থাৎ: “এরা নিজ নিজ আমল অনুযায়ী আল্লাহর কাছে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হবে, এরা যা কিছু করে আল্লাহ তায়ালা তা জানেন” (সূরা আলে ইমরান, ১৬৩)।

(খ) জান্নাতে পানি, মদ, দুধ ও মধুর নদী থাকবে।

(গ) সকল ধরণের ফলমূল থাকবে, জান্নাতী সেখান থেকে যেভাবে ইচ্ছা পান এবং ভক্ষণ করতে পারবে। যেমন: কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ [سورة محمد: ١٥].

অর্থাৎ: “মোত্তাকীদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, সেখানে পানকারীদের জন্য নির্মল পানির নদী রয়েছে যা কখনো নষ্ট হয় না, দুধের নদী রয়েছে যার স্বাদ কখনো পরিবর্তন হয় না এবং বিশুদ্ধ মধুর নদী রয়েছে। এ ছাড়াও সব ধরণের ফলমূল এবং তাদের রবের পক্ষ থেকে রয়েছে ক্ষমা। এরা কি তাদের মতো যারা অনন্তকাল ধরে জ্বলন্ত আগুনে পুড়তে থাকবে এবং এমন ফুটান্ত পানি পান করানো হবে যা তাদের পেটের নাড়িভূঁড়ি কেটে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিবে” (সূরা মোহাম্মাদ, ১৫)।

(ঘ) জান্নাতে হুর গিলমান বা পুতপবিত্র অত্যন্ত সুন্দরী নারী এবং শিশু থাকবে, যারা এত সুন্দর এবং সুগন্ধিযুক্ত হবে যে তাদের কেউ এ পৃথিবীতে একবার থু ফেললে পুরো পৃথিবী সুগন্ধিযুক্ত হয়ে যেত। তাদের সম্পর্কে কোরআনে কারীমে এসেছে:

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ – بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ – لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ – وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ – وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ – وَحُورٌ عِينٌ – كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾ [سورة الواقعة: ١٧-٢٣].

অর্থাৎ: “পান পাত্র এবং প্রবাহমান সুরা ভর্তি পেয়ালা নিয়ে তাদের চারপাশে সেবার জন্যে চির কিশোরের একটি দল ঘুরতে থাকবে। এগুলো পান করার কারণে তাদের শিরপীড়া হবে না এবং নেশাগ্রস্তও হবে না। সেখানে তাদের নিজ নিজ পছন্দমতো ফলমূল থাকবে এবং তাদের মনের চাহিদা মোতাবেক রকমারী পাখীর গোশত থাকবে। আরো থাকবে সুন্দরী সুনয়না সাথীরা, তারা যেন ঢেকে রাকা এক একটি মুক্তা” (সূরা ওয়াক্বিয়া, ১৭-২৩) ।

(ঙ) জান্নাতে সোনার চুড়ি এবং রেশমের তৈরি পোষাক থাকবে। যেমন: আল্লাহ বলেন:

﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [سورة فاطر: ٣٣].

অর্থাৎ: “সেদিন তারা এক চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে, যেখানে তাদের সোনায় বাঁধানো ও মুক্তাখচিত কাঁকন বা চুড়ি পড়ানো হবে, সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের” (সূরা ফাতের, ৩৩) । এছাড়া সূরা ক্বাহাফ এর ৩১ এবং সূরা আল-হাজ্জ এর ২৩ নাম্বার আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে।

আয়াতাবলীর আমল:

সমাজের প্রতিটি মানুষের উচিৎ কিয়ামতের দিনে জান্নাতীদের চিরসুখের কথা স্মরণ করে সৎআমলের দিকে ধাবিত হয়ে আখেরাত ভিত্তিক জীবন যাপন করা। আল্লাহ তায়ালা মূলত এ উদ্দেশ্যেই পবিত্র কোরআনের প্রতি পেইজে এবং প্রতি বাক্যে আখেরাতের আলোচনা করেছেন। এর মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, কারণ একজন মানুষ যখন নিজের ভবিষ্যত সুখের কথা ভাবে, তখন সে নীতি নৈতিকতা বিরোধী কোন কাজ করতে পারে না।

﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٧) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨) وَإِلَى الْجِبَالِ
كَيْفَ نُصِبَتْ (١٩) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (٢٠) فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٢١) لَسْتَ
عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (٢٢) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (٢٣) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (٢٤) إِنَّ إِلَيْنَا
إِيَابَهُمْ (٢٥) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (٢٦)﴾ [سورة الغاشية: ١٧-٢٦].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়: পুনরুত্থান দিবস সত্য হওয়ার প্রমাণ।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১৭	তবে কি তারা দৃষ্টিপাত করে না	উটের প্রতি	কিভাবে	তা সৃষ্টি করা হয়েছে?	১৮
	أَفَلَا يَنْظُرُونَ	إِلَى الْإِبِلِ	كَيْفَ	خُلِقَتْ	

এবং আকাশের দিকে	কি ভাবে	তা উর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে?	১৯	এবং পর্বতমালার দিকে
وَإِلَى السَّمَاءِ	كَيْفَ	رُفِعَتْ		وَإِلَى الْجِبَالِ

কি ভাবে	তা স্থাপন করা হয়েছে?	২০	এবং যমীনের দিকে	কি ভাবে তা বিস্তৃত করা হয়েছে?
كَيْفَ	نُصِبَتْ		وَإِلَى الْأَرْضِ	كَيْفَ سُطِحَتْ

২১	অতএব (হে নবী!) তুমি উপদেশ দিতে থাকো	তুমি তো একজন	উপদেশ দাতা মাত্র।
	فَذَكِّرْ	إِنَّمَا أَنْتَ	مُذَكِّرٌ

২২	তুমি নয়	তাদের উপর	শক্তি প্রয়োগকারী।	২৩	তবে	যে (ব্যক্তি) মুখ ফিরিয়ে নিবে
	لَسْتَ	عَلَيْهِمْ	بِمُصَيْطِرٍ		إِلَّا	مَنْ تَوَلَّى

এবং অস্বীকার করবে,	২৪	আল্লাহ তাকে আযাব দিবেন	কঠিন আযাব।	২৫	নিশ্চয়
وَكَفَرَ		فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ	الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ		إِنَّ

আমারই নিকট	তাদের প্রত্যাবর্তন।	২৬	অতঃপর	নিশ্চয়	আমারই উপর
إِلَيْنَا	إِيَابَهُمْ		ثُمَّ	إِنَّ	عَلَيْنَا

তাদের হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব।
حِسَابَهُمْ

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

কিভাবে কাফির মুশরিকরা পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করতে পারে, তারা কি উটের দিকে গবেষণার নজরে তাকায় না, কিভাবে আল্লাহ তায়ালা তা সৃষ্টি করেছেন? তারা কি আকাশ নিয়ে গবেষণা করে না, কিভাবে আল্লাহ তায়ালা তাকে উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন? তারা কি পর্বতমালা নিয়ে

গবেষণা করে না, কি ভাবে আল্লাহ তায়ালা তা স্থাপন করেছেন? এবং তারা কি যমীন নিয়ে ভাবে না, কি ভাবে আল্লাহ তায়ালা তা বিস্তৃত করেছেন? (*আইসার*, ৫/৫৬২) ।

যিনি উটকে এক অদ্ভুত আকৃতিতে সৃষ্টি করে মানুষের অধিনস্ত করে দিয়ে তার থেকে বিভিন্ন উপকার যেমন: পিঠে আরোহণ, গোস্ত ভক্ষণ এবং দুগ্ধ পান ইত্যাদি গ্রহণ করার সুযোগ প্রদান করতে পেরেছেন, যিনি সুবিশাল আকাশ সৃষ্টি করে তাকে চন্দ্র, সূর্য এবং অগণিত তারকারাজী দিয়ে সজ্জিত করে পৃথিবীর জন্য খুটি বিহীন ছাদ বানাতে পেরেছেন, যিনি পৃথিবীকে স্থির রাখার জন্য পর্বতমালাকে পিলার হিসেবে উপযুক্ত যায়গাতে বসিয়ে দিতে পেরেছেন এবং যিনি পৃথিবীকে বিছানা স্বরুপ তৈরি করে তার উপর ভ্রমণ করার এবং তাকে আবাধ করার উপযুক্ততা দিতে পেরেছেন, তিনি অবশ্যই মৃতকে পুনরায় জীবিত করে বিচারের কাঠগড়ায় দাড় করাতে পারবেন।

সুতরাং মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) যেন তাদের কথায় কান না দিয়ে আল্লাহর কুদরাত, সৃষ্টি জগতে তার নিদর্শনসমূহ, বান্দার প্রতি তাঁর নেয়ামত ইত্যাদি বর্ণনার মাধ্যমে উপদেশ দিতে থাকেন, তিনি তো একজন উপদেশ প্রদানকারী মাত্র। তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে ঈমান গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য তাকে পাঠানো হয়নি। এরপরেও যদি তারা দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে আখেরাতে মহা আযাব প্রদান করবেন। তারাতো আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করছে এবং তাদের থেকে তিনি কড়ায়গন্ডায় হিসাব গ্রহণ করবেন। (*আল-মুন্তাখাব*, ৯০৩-৯০৪, *আল-মোয়াস্সার*, ১/৫৯৩, *আইসার*, ৫/৫৬২) ।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ﴾ 'বড় আযাব', আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ সম্পর্কে তাফসীরকারকদের কয়েকটি মত পাওয়া যায়: (ক) কুফরীর সর্বোচ্চ শাস্তিকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, অন্যান্য পাপ কাজের শাস্তি কুফরীর শাস্তির মত এতো বড় নয়। যেমন: সূরা সাজদার একটি আয়াতে এসেছে:

﴿وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾ [السَّجْدَةِ: ٢١].

অর্থাৎ: "বড় আযাবের আগে আমি অবশ্যই তাদের ছোটোখাটো আযাবও আস্বাদন করাবো" (সূরা সাজদা, ২১) ।

(খ) 'দারকিল আসফালি মিনান নার' বা জাহান্নামের তলদেশের শাস্তিকে বুঝানো হয়েছে।

(গ) দুনিয়ার বড় শাস্তি, যেমন: যুদ্ধের ময়দানে কতল এবং ফেরেশতা পাঠিয়ে শাস্তি দেওয়া কে বুঝানো হয়েছে। তবে প্রথম মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য। (*আল-তাফসীর আল-কাবীর*, ৩১/১৪৭) ।

পূর্বের আয়াতাবলীর সাথে অত্র আয়াতাবলীর সম্পর্ক:

পূর্বের আয়াতসমূহ তথা (১-১৬) নাম্বার আয়াতে কিয়ামতের ভয়াবহ চিত্র বর্ণনার পাশাপাশি জাহান্নামীদের এবং জান্নাতীদের অবস্থা তুলে ধরার পর অত্র আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি জগতে তার কুদরাত বর্ণনার মাধ্যমে পুনরুত্থান দিবস সংগঠিত হওয়ার যৌক্তিক প্রমাণ পেশ করেছেন। অতঃপর রাসূল (সা.) কে এ প্রমাণগুলো দিয়ে বিরোধীদেরকে দাওয়াত দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/২১৩-২১৪)।

আয়াতাবলী অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

ইবনু আবি হাতিম (র.) ক্বাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালা জান্নাত ও জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করলে মক্কার পথভ্রষ্ট কাফির মুশরিকরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে এটা নিয়ে

বিদ্রুপ ছড়াতে লাগলো। তখন আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন। (*আসবাব আল-নুযুল*, সুয়ূতী, ৩৫৭) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। (১৭-২০) নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা পুনরুত্থান সংগঠিত করার জন্য তাঁর ক্ষমতা প্রমান করতে উট, আকাশ, পাহাড় এবং যমীন এ চারটিকে উল্লেখ করেছেন। এখন প্রশ্ন হতে পারে এ চারটি বস্তু বিশেষভাবে উল্লেখ করার রহস্য কি? এ প্রশ্নের উত্তর হলো:

(ক) উল্লেখিত চারটি বস্তু মানুষের খুবই কাছে থাকে, যেমন: উট আরব জাতির ঐতিহ্য যা প্রতি ঘরে পালন করা হতো। বাকী তিনটি বস্তু যা মানুষ এড়িয়ে চলতে পারে না, যেমন: উপরে তাকালে দেখে আকাশ, নিচে তাকালে যমীন এবং ডানে-বামে ও সামনে-পিছনে তাকালে দেখে পাহাড়।

(খ) হাক্বীক্বাত এর দৃষ্টিতে পৃথিবীর সকল সৃষ্টি সমান। অতি ক্ষুদ্র একটি বস্তুর গবেষণা আল্লাহর ক্ষমতা বুঝার জন্য যথেষ্ট। এ জন্য আল্লাহ তাঁর ইচ্ছানুযায়ী চারটি বস্তু উল্লেখ করেছেন, এর পিছনে বিশেষ কোন রহস্য নেই। (*আল-তাফসীর আল-কাবীর*, ৩১/১৪৪) ।

২। উটকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো: (ক) উট অদ্ভুত প্রাণী হওয়া সত্বেও মানুষের পোষ গ্রহণ করে, (খ) মানুষ উটের পিঠে আরোহণ করে দুরদুরান্তে সফর করে, (গ) পণ্যসামগ্রী বহণ করে দুর থেকে দুরন্তে নিয়ে যায়, (ঘ) তার গোস্ত ভক্ষণ করা যায় এবং (ঙ) তার দুধ পান করা যায়। (*আল-তাফসীর আল-কাবীর*, ৩১/১৪৭)

৩। (১৭-২০) নাম্বার আয়াত দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহর ক্ষমতা বুঝার জন্য তাঁর সৃষ্টি জগত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা জরুরী। ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে একটি মত রয়েছে, যার কাছে রিসালাতের দাওয়াত পৌছেনি আল্লাহর পরিচয় পাওয়ার জন্য তার চতুর্দিকে বিরাজমান বস্তু থেকে আল্লাহর পরিচয় খুজে নেওয়া তার উপর ওয়াজিব।

৪। আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে অন্যের উপর প্রভাব খাটিয়ে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য না করে তাদেরকে উপদেশ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। এ থেকে বুঝা যায় একজন দায়ীর দায়িত্ব হলো অন্যের কাছে কালেমার দাওয়াত পৌছানো, কারো উপর প্রভাব বিস্তার করা নয়। সুতরাং একজন আদর্শ দায়ীর বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিৎ কারো উপর প্রভাব বিস্তার না করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছিয়ে দেওয়া।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/২১৭) ।

৫। যারা ইসলামের দাওয়াত কবুল করবে না তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তিনটি বিষয় উল্লেখ করার মাধ্যমে সতর্ক করেছেন:

(ক) তাদেরকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে।
(খ) আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের হিসাব গ্রহণ করবেন।
(গ) তাদেরকে মহা শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করা হবে। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

আয়াতাবলীর আমল:

(ক) সৃষ্টি জগত নিয়ে ধ্যান করা।
(খ) হক্কানী আলেম-ওলামাদের দাওয়াতে সারা দেওয়া।
(গ) আখেরাত ও তাক্বওয়া ভিত্তিক জীবন-যাপন করা।

(سُورة الفَجْر)

সূরা আল-ফাজ্‌র এর পরিচয়:

সূরার নাম:

তাফসীরকারকদের থেকে অত্র সূরার একটি মাত্র নাম পাওয়া যায়। (*তাফসীর মাওজূয়ী*, ১০/১২৫) ।

আলোচ্যবিষয়: আল্লাহ তায়ালা অত্যাচারী, বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, দুর্নীতিবাজ এবং অহংকারীদেরকে সর্বদা নজরবন্দীতে রাখেন।

সূরার ফযিলত: সালাতে সূরা আ'লা, শাম্‌স, ফাজ্‌র এবং লাইল তেলাওয়াতকে বড় সূরা তেলাওয়াতের স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যেমন: সুনান আল-কুবরা লি আল-নাসায়ীতে জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: صَلَّى مُعَاذٌ صَلَاةً، فَجَاءَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ فَطَوَّلَ، فَصَلَّى فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا، فَقَالَ: مُنَافِقٌ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَسَأَلَ الْفَتَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ أُصَلِّي مَعَهُ فَطَوَّلَ عَلَيَّ، فَانْصَرَفْتُ وَصَلَّيْتُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَعَلَفْتُ نَاضِحِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِمُعَاذٍ: "أَفَتَّانًا يَا مُعَاذُ، فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]، ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ [الشمس: ١]، ﴿وَالْفَجْرِ﴾ [الفجر: ١]، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ [الليل: ١]؟". (سنن الكبرى للنسائي: ١١٦٠٩).

অর্থাৎ: তিনি বলেন: মুয়াজ কোন এক ওয়াক্তের সালাত আদায় করতে লাগলো, ইতোমধ্যে এক জনৈক সাহাবী এসে তার পিছনে সালাতে দাড়িয়ে গেলেন, মুয়াজ সালাত লম্বা করায় সে সালাত ছেড়ে একাকী মসজিদের পাশে সালাত আদায় করে চলে গেল। এ সংবাদ মুয়াযের কাছে পৌছলে তাকে মুনাফিক বললো। পুরো ঘটনা রাসূলুল্লাহর কাছে পৌছলে তিনি ঐ যুবক সাহাবীকে ডেকে ঘটনা জিজ্ঞাসা করলেন, সে উত্তরে বললো: হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমি তার সাথে সালাতে দাড়িয়েছিলাম, তার লম্বা ক্বিরাতের কারণে সালাত ছেড়ে মসজিদের পাশে গিয়ে একাকী সালাত আদায় করে উট নিয়ে চলে গিয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) মুয়াযকে ডেকে বললেন: হে মুয়ায! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী? অতঃপর তিনি বললেন: তুমি সূরা আ'লা, শাম্‌স, ফাজ্‌র এবং লাইল দ্বারা সালাত আদায় করলে না কেন? (*সুনান আল-কুবরা*, ৭০৫) ।

এছাড়াও অত্র সূরাটি মুফাস্‌সালাত এর অন্তভুক্ত, আর মুফাস্‌সালাত সূরাগুলোকে কোরআনের অন্তর বলা হয়। যেমন: ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন:

(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].

অর্থাৎ: "প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, আর কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্‌সাল সূরাগুলো"।

(*সুনানে দারিমী*, ৩৪২০) ।

আরো একটি হাদীসে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে মুফাস্সালাত সূরাগুলো ইতিপূর্বে কোন নবী-রাসূলকে প্রদান করা হয়নি। যেমন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةَ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].

অর্থাৎ: "আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিষিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিষিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি"। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪) ।
হাদীসে মুফাস্সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ৮৯তম সূরা।

অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: নবম সূরা, যা 'সূরা লাইল' এর পরে এবং 'সূরা দুহা' এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

অবতীর্ণের স্থান: জমহুর তাফসীরকারকদের মতে, অত্র সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, সূরা মাক্কিয়্যাহ। (*বিতাকাত আল-তারীফ*, ৩০৭) ।

আয়াত সংখ্যা: ৩০টি।

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: এ সূরাটি অবতীর্ণের কোন প্রেক্ষাপট পাওয়া যায় না।

﴿وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (٢) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (٣) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (٤) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ
لِذِي حِجْرٍ (٥) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي
الْبِلَادِ (٨) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١٠) الَّذِينَ طَغَوْا فِي
الْبِلَادِ (١١) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (١٢) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٣) إِنَّ رَبَّكَ
لَبِالْمِرْصَادِ (١٤)﴾ [سورة الفجر: ١–١٤].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়:

সীমালঙ্ঘনকারীর পরিণতির অনিবার্যতা এবং তাদের শাস্তি এই পৃথিবীতেই শুরু হয়।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১	ফজরের শপথ।	২	দশ রাত্রির শপথ।	৩	জোড় ও বেজোড়ের শপথ।	৪	রাত্রির শপথ
	وَالْفَجْرِ		وَلَيَالٍ عَشْرٍ		وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ		وَاللَّيْلِ

যখন	তা গত হতে থাকে।	৫	নিশ্চয় এর মধ্যে আছে	শপথ	জ্ঞানবান ব্যক্তির জন্য।	৬
إِذَا	يَسْرِ		هَلْ فِي ذَلِكَ	قَسَمٌ	لِذِي حِجْرٍ	

তুমি কি দেখনি	তোমার রব কিরূপ আচরণ করেছিলেন	আদ জাতির সাথে?	৭	ইরাম
أَلَمْ تَرَ	كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ	بِعَادٍ		إِرَمَ

গোত্রের সাথে	যারা সুউচ্চ স্তম্ভের অধিকারী ছিলো?	৮	যার সমতুল্য সৃষ্টি করা হয়নি
	ذَاتِ الْعِمَادِ		الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا

কোন দেশে।	৯	আর সামূদ জাতির সাথে	যারা উপত্যাকার পাথর কেটে বাড়ি বানিয়েছিল?
فِي الْبِلَادِ		وَثَمُودَ	الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ

১০	আর ফির'আউনের সাথে,	সেনাছাউনির অধিপতি?	১১	যারা উদ্ধত আচরণ করেছিল
	وَفِرْعَوْنَ	ذِي الْأَوْتَادِ		الَّذِينَ طَغَوْا

দেশের মধ্যে।	১২	অতঃপর তারা বাড়িয়ে দিয়েছিলো	সেখানে	বিপর্যয়।	১৩	ফলে
فِي الْبِلَادِ		فَأَكْثَرُوا	فِيهَا	الْفَسَادَ		فَ

তোমার রব তাদের উপর	আযাবের চাবুক হানলেন।	১৪	নিশ্চয়	তোমার রব	ঘাটিতেই।
صَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ	سَوْطَ عَذَابٍ		إِنَّ	رَبَّكَ	لَبِالْمِرْصَادِ

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

আল্লাহ তায়ালা ফজরের সময়, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন, প্রত্যেক জিনিসের জোড়-বেজোড় এবং রাতের আগমন ও প্রস্থানের শপথ করে বলেছেন: আমি অবশ্যই কাফেরদেরকে শাস্তি দিবো। এ সমস্ত বস্তুর শপথ বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীদের জন্য যথেষ্ট নয় কি?

হে নবী! আপনি কি জানেন না যে, হুদ (আ.) এর বংশ ‘আদ’ এর একটি গোত্র ‘ইরামা’ এর সাথে আপনার রব কি আচরণ করেছিলেন? তারা তৎকালীন সময়ে খুবই শক্তিসালী ছিল এবং তারা উচু অট্টালিকা তৈরি করতো, যা অন্য কোন দেশ বা গোত্রের পক্ষে সম্ভব হতো না।

সালেহ (আ.) এর বংশধর সামুদ জাতির সাথে আপনার রব কিরুপ আচরণ করেছিলেন, তাও কি আপনি জানেন না? তারা শিল্পে এতই পারদশী ও শক্তিশালী ছিল যে, পাহাড়ের পাথর কেটে সুন্দর সুন্দর ঘর তৈরি করতো।

এবং আপনি জানেন কি আপনার রব মিশরের সম্রাট ‘ফেরআউন’ এর সাথে কি আচরণ করেছিলেন? সে ছিলো সেনাবাহিনীর অধিপতি যারা তার রাজ্য ও রাজত্বকে বহাল রাখতে ভূমিকা রেখেছিল।

উল্লেখিত প্রভাবশালী গোত্র ও সম্রাটগণ যখন আল্লাহর রাজ্যে যুলম ও বিশৃঙ্খলা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিলো, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর প্রচন্ডভাবে গযব অবতীর্ণ করেছিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সীমলঙ্ঘনকারী এবং অত্যাচারীদেরকে নজরবন্দীতে রাখেন। ফলে, তারা সীমালঙ্ঘন করে পার পায় না।

(*আল-মুন্তাখাব*, ৯০৫, *আল-মোয়াস্সার*, ১/৫৯৩, *আইসার*, ৫/৫৬৪) ।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ ‘দশ রাত্রি’, দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: যিলহজ্জের প্রথম দশ রাত্রি। (*গরীব আল-কোরআন*, ইবনু কুতাইবা, ৪৫২) ।

﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ ‘জোড়-বেজোর’, অত্র আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে দুইটি মত পাওয়া যায়: (ক) যিলহজ্জের প্রথম দশ রাত্রির জোড় এবং বেজোড় রাত্রিকে বোঝানো হয়েছে। (খ) সকল জিনিসের জোড় এবং বেজোড়কে বুঝানো হয়েছে। এখানে দ্বিতীয় মতটি অধিক শক্তিশালী (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/২২২) ।

﴿ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ ‘স্তম্ভ বিশিষ্ট’ দ্বারা দুইটি উদ্দেশ্য হতে পারে: (ক) মোটাতাজা এবং লম্বা আকৃতির লোক। (খ) সুউচ্চ অট্টালিকা (*আল-তাফসীর আল-কাবীর*, ৩১/১৫৩) । এখানে দ্বিতীয় মতটি অধিক শক্তিশালী; কারণ এতে প্রভাব ও প্রতিপত্তির ইঙ্গিত রয়েছে (*আল-মুনীর*, ৩০/২২২) ।

﴿إِرَمَ﴾ ‘ইরাম’, আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে তাফসীরকারকদের মত হলো: কোরআনে বর্ণিত ‘আদ’ জাতি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ছিল, ‘ইরাম’ হলো প্রথম আদ গোত্র। (*তাফসীর আল-মুনীর*: ৩০/২২২, *আইসার আল-তাফাসীর*: ৫/৫৬৪) ।

﴿ذِي الْأَوْتَادِ﴾ 'পেরাগওয়ালা' দ্বারা তিনটি উদ্দেশ্য হতে পারে: (ক) সেনাছাউনির অধিপতি, (খ) সে মানুষকে পেরাগ মেরে শাস্তি দিতো তার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং (গ) রাজ্যের অধিপতি (*আল-তাফসীর আল-কাবীর*, ৩০/১৫৪) ।

﴿الْفَسَادَ﴾ 'বিশৃঙ্খলা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সীমালঙ্ঘন, অবাধ্যতা, শিরক এবং যুলম। (*তাফসীর গরীব আল-কোরআন*, আল-কাওয়ারী, ১১/৮৯) ।

সূরা ফাজ্‌র এর সাথে পূর্বের সূরার সম্পর্ক:

পূর্বের সূরা তথা সূরা গাশিয়াতে আল্লাহ তায়ালা অপরাধী কাফের-মুশরিক সহ সকল সৃষ্টি তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে কৃতকর্মের হিসাব দিবে এ কথা বর্ণনার মাধ্যমে কাফেরদেরকে সতর্ক করার পর অত্র সূরা তথা সূরা ফাজ্‌র এ কয়েকটি মহান বিষয়ে কসম করার মাধ্যমে তাদের হিসেবের বর্ণনা দিয়েছেন। (*আল-নাযম আল-দুরার*, বাক্বায়ী, ৮/৪১৩) ।

সূরা ফাজ্‌র এর সাথে তার পরের সূরার সম্পর্ক:

সূরা ফাজ্‌র এর শেষাংশে প্রশান্ত আত্মার অবস্থা এবং তার জন্য প্রস্তুতকৃত জান্নাতের বর্ণনা দিয়েছেন, যা আখিরাত জীবনের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ স্থান। আর পরের সূরা তথা সূরা বালাদে পৃথিবীর সবচেয়ে দামী স্থান মক্কা মোকাররমা এর বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং উভয় সূরার মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট। (*তাফসীর মওজুয়ী*, মোস্তফা মুসলিম, ১০/১৩৪) ।

সূরা ফাজ্‌র এ কসমের ব্যাখ্যা:

মানুষের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা জায়েজ নেই, যা অসংখ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে ধরাবাধা কোন নিয়ম নেই, সাধারণতঃ তিঁনি যে বিষয়ে কথা বলতে চান তার সাথে সম্পর্কিত কোন বস্তুর কসম করেন। অত্র সূরায় আল্লাহ তায়ালা ফজরের সময়, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন, সকল বস্তুর জোড়-বেজোড় এবং রাতের আগমন ও প্রস্থানের শপথ করে অবাধ্য বান্দার শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন।

আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী কসমের বর্ণনা নিম্নরূপ:

তাফসীরকারকগণ অত্র সূরার কসমের দুইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

প্রথমত:

কসম বা শপথের বস্তু: ফজরের সময়, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন, সকল বস্তুর জোড়-বেজোড় এবং রাতের আগমন ও প্রস্থান, সূরার (১-৪) নাম্বার আয়াত।

জাওয়াবে কসম বা শপথের বিষয়বস্তু: আমি অবশ্যই কাফিরদেরকে শাস্তি দিব (উহ্য আছে)।

কসম ও জাওয়াবে কসমের মধ্যে সম্পর্ক: শপথের বস্তু ফজরের সময়, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন, সকল বস্তুর জোড়-বেজোড় এবং রাতের আগমন ও প্রস্থান। আর আলোচনা করা হয়েছে আল্লাহর অবাধ্য বান্দার শাস্তি সম্পর্কে, যারা অবাধ্যতা এবং খারাপ কাজগুলো কসমে উল্লেখিত সময়ে সম্পন্ন করে থাকে। সুতরাং কসম ও জাওয়াবে কসমের মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট।

দ্বিতীয়ত:

কসম বা শপথের বস্তু: ফজরের সময়, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন, সকল বস্তুর জোড়-বেজোড় এবং রাতের আগমন ও প্রস্থান, সূরার (১-৪) নাম্বার আয়াত।

জাওয়াবে কসম বা শপথের বিষয়বস্তু: নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সীমলঙ্ঘনকারী এবং অত্যাচারীদেরকে নজরবন্দীতে রাখেন (সূরার (১৪) নাম্বার আয়াত।

কসম ও জাওয়াবে কসমের মধ্যে সম্পর্ক: শপথের বস্তু ফজরের সময়, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন, সকল বস্তুর জোড়-বেজোড় এবং রাতের আগমন ও প্রস্থান। আর আলোচনা করা হয়েছে অত্যাচারী কাফির-মুশরিকদেরকে আল্লাহর নজরবন্দীতে রাখা সম্পর্কে, আল্লাহ তায়ালা কসমে বর্ণিত সময়ে তাদেরকে নজরে রাখেন। সুতরাং কসম ও জাওয়াবে কসমের মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট। (*আইসার*, ৫/৫৬৫, *আল-মুনীর*, ৩০/২২১) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। আল্লাহ তায়ালা অত্র সূরায় কসম করার মাধ্যমে চারটি বিষয়কে মহিমান্বিত করেছেন: (ক) ফজরের সময়, (খ) যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন, (গ) সকল বস্তুর জোড়-বেজোড় এবং (ঘ) রাতের আগমন ও প্রস্থান। (*তাফসীর খাজিন*, ৪/৪২৩) ।

২। অত্র সূরার প্রথম আয়াতে ফজরের সালাতের (এক মতানুযায়ী) কসম করার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাকে মহিমান্বিত করেছেন। এর ফযিলত সম্পর্কে অনেকগুলো হাদীস রয়েছে, অন্যতম একটি হাদীস হলো:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ: "رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا" (صحيح مسلم: ١٧٢١).

অর্থাৎ: আয়েশা সিদ্দীক্বা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত পৃথিবী এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে, এ সব থেকে উত্তম। (*সহীহ মুসলিম*, ১৭২১) ।

৩। অত্র সূরার দুই নাম্বার আয়াতে যিলহজ্জের প্রথম দশ রাতের কসম করার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাকে তাৎপর্যপূর্ণ করেছেন। এর ফযিলত সম্পর্কে সহীহ বুখারীর একটি হাদীস রয়েছে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–: مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ – يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ – " قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: " وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلًا خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ" (مسند أحمد: ١٩٦٨).

অর্থাৎ: “আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: নেকআমল করার জন্য আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম দিন হলো যিলহজ্জের প্রথম দশ দিন। রাবী (ইবনু আব্বাস) বলেন: এর জবাবে সাহাবায়ে কেরাম বললেন: হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়েও উত্তম? তিনি উত্তরে বললেন: হ্যা আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়েও উত্তম। তবে, কোন ব্যক্তি জান ও মাল নিয়ে আল্লাহর পথে বের হয়ে আর ফিরে আসে না, তার কথা আলাদা। (*মুসনাদে আহমাদ*, ১৯৬৮) ।

৪। আল্লাহ তায়ালা কাফের ও তাঁর অবাধ্য বান্দাদেরকে শাস্তি দিবেনই, এ কথা শপথের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে সংক্ষেপে জানানোর পর (৬-১৪) নাম্বার আয়াতে তিনি তাদেরকে ইতোমধ্যে দুনিয়ায় যে শাস্তি দিয়েছেন তার বিবরণ দিয়েছেন:

(ক) অহংকার বশত আল্লাহর রাজ্যে বিশৃঙ্খলাা এবং যুলম করার কারণে তিনি আদ জাতিকে প্রলয়ংকারী ঝড়ের মাধ্যমে সমুলে ধ্বংস করেছেন। যার বর্ণনা সুরা আহক্বাফ:২৪, সুরা ক্বামার, ২১ এবং সুরা হাক্বাহ, ৬-৭ এ এসেছে।

(খ) সামুদ জাতিকেও আল্লাহ তায়ালা একই কারণে প্রচন্ড গর্জন এবং প্রলয়ংকরী ভুমিকম্প দিয়ে ধংস করেছেন। যার বর্ণনা সুরা আরাফ এর ৭৮ নাম্বার আয়াত, হুদ এর ৬৭ নাম্বার আয়াত এবং সুরা ক্বামার এর ৩১ নাম্বার আয়াতে এসেছে।

(গ) ফেরআউন ও তার দলবলকেও একই কারণে আল্লাহ তায়ালা লোহিত সাগরে ডুবিয়ে মেরেছেন। যার বর্ণনা কোরআনে অনেক জায়গায় এসেছে।

৫। অত্র সুরার (১২-১৩) নাম্বার আয়াত থেকে বুঝা যায় আল্লাহ তায়ালা কোন শাসক এবং ক্ষমতাধরকে একটি মাত্র কারণে ধংস করে থাকেন, আর তা হলো: ফাসাদ। ফাসাদ এর অনেকগুলো তাফসীর রয়েছে: (ক) সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার, (খ) ক্ষমতার দাপট, (গ) আল্লাহর অবাধ্যতা এবং (ঘ) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করা। (ইবনু কাসীর, ৮/৩৯৭, *তাফসীর গরীব আল-কোরআন*, আলকাওয়ারী, ১১/৮৯) ।

এছাড়াও ১৪ নাম্বার আয়াত থেকে বুঝা যায় যখন কেউ ক্ষমতা পেয়ে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার, ক্ষমতার দাপট, আল্লাহর অবাধ্যতা এবং শিরক-কুফরে মেতে উঠে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিশেষ নজরদারিতে রাখেন এবং তাদের দ্বারা সীমালঙ্ঘন হলে মুহুর্তেই ক্ষমতা থেকে নামিয়ে নিঃস্ব বানিয়ে দেন। এমনকি তাদের নাম নেয়ার মতো সমাজে কাউকে বাকী রাখেন না। এটা আল্লাহ তায়ালার নিয়ম। যেমন: নমরুদ এতবড় ক্ষমতাধর বাদশা হওয়া সত্যেও তাকে আল্লাহ তায়ালা লাঞ্চনাদায়ক মৃত্যুর মাধ্যমে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে দিলেন। তাকে ভালোভাবে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করার কেউ নেই। হাজার হাজার বছর পরে এসে আজ তাকে সকলে ঘৃণাভরে স্মরণ করে, এমনকি কাফেররাও যারা তার অনুসারী ও কল্যানকামী ছিলো এবং তার থেকে স্বার্থ লুটেছিলো তাদের বংশধররাও আজ তাকে ঘৃণার সাথে স্মরণ করে এবং অভিসম্পাত করে। অপরদিকে ইব্রাহীম (আ.) যাকে নিঃশেষ করার জন্য নমরুদ তৎকালীন সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলো, তিনি আজ সকলের অন্তরে অমর হয়ে আছেন, যাকে সকল ধর্মের মানুষ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে এবং তার জন্য দোয়া করে ।

এভাবে সকল পেশীশক্তি, যেমন: ফেরআউন, কারুন, সাদ্দাত, আবু জেহেল, হিটলার এবং বুশ সহ সকল অত্যাচারী শাসকদেরকে মানুষ একটি সময় এসে ভুলে যায়। যদি কেউ তাদেরকে স্মরণ করেও থাকে, সে তাদের প্রতি লা'নত দিয়েই স্মরণ করে। কিন্তু তাদের সাথে থাকা ভালো মানুষগুলো যারা যুগ যুগ ধরে নিস্পেষিত হয়েছিলো তারা অমর হয়ে আছে মানুষের অন্তরে এবং তাদের নাম স্মরণ করে শ্রদ্ধাভরে।

অত্র আয়াতগুলো থেকে সকল শাসক ও ক্ষমতাশীনদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ, বিশেষকরে অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর উপর কর্তব্য হলো অত্র আয়াতগুলো পাঠ করে শিক্ষা গ্রহণ করা। যার ইঙ্গিত আল্লাহ তায়ালা ছয় নাম্বার আয়াতে দিয়েছেন। একদল তাফসীরকারক অত্র আয়াতের

অর্থ করেছেন: “হে মক্কার অত্যাচারী সম্প্রদায়! তোমরা কি দেখোনি তোমাদের রব আদ, সামূদ এবং ফেরআউনের সাথে কি আচরণ করেছিলো?। (আল্লাহ তায়ালা ভালো জানেন) ।

৬। উল্লেখিত আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মক্কার অত্যাচারী মুশরিক শাসকদেরকে সতর্ক করেছেন এবং মোহাম্মদ (সা.) শান্তনা প্রদান করেছেন। (*আইসার*, ৫/৫৬৬, *আল-মুনীর*, ৩০/২২৮) ।

আয়াতাবলীর আমল:

সকল মানুষের উচিৎ তাদের অধিনস্ত, দুর্বল, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং ভিন্ন মতাবলম্বী সকলের সাথে মানবিক আচরণ করা।

﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (١٥) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ
رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (١٦) كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (١٧) وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (١٨)
وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (١٩) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (٢٠)﴾ [سورة الفجر: ١٥-٢٠].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়:

আখিরাতের উপর দুনিয়াকে গুরুত্বারোপকারীর প্রতি আল্লাহর তিরস্কার।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১৫	আর মানুষ এমন যে	যখন	তার রব তাকে পরীক্ষা করেন	অতঃপর তাকে সম্মানিত করেন
	فَأَمَّا الْإِنْسَانُ	إِذَا	مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ	فَأَكْرَمَهُ
এবং অনুগ্রহ প্রদান করেন,	তখন সে বলে:	আমার রব	আমাকে সম্মানিত করেছেন।	১৬
وَنَعَّمَهُ	فَيَقُولُ	رَبِّي	أَكْرَمَنِ	
আর যখন	তিনি তাকে পরীক্ষা করেন	অতঃপর তার উপর সংকোচিত করে দেন	তার রুযী,	
وَأَمَّا إِذَا	مَا ابْتَلَاهُ	فَقَدَرَ عَلَيْهِ	رِزْقَهُ	
তখন সে বলে:	আমার রব	আমাকে অপমানিত করেছেন।	১৭	এটা কখনও ঠিক নয়,
فَيَقُولُ	رَبِّي	أَهَانَنِ		كَلَّا
বরং	তোমরা অনুগ্রহ করো না	ইয়াতিমদেরকে।	১৮	এবং পরস্পরকে উৎসাহিত করো না
بَلْ	لَا تُكْرِمُونَ	الْيَتِيمَ		وَلَا تَحَاضُّونَ
মিসকীনদেরকে খাবার দানের প্রতি।	১৯	এবং তোমরা ভক্ষণ করো	উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য	
عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ		وَتَأْكُلُونَ	التُّرَاثَ	
সম্পূর্ণরূপে।	২০	এবং তোমরা ভালোবেসে থাক	ধন-সম্পদকে	অত্যাধিক।
أَكْلًا لَمًّا		وَتُحِبُّونَ	الْمَالَ	حُبًّا جَمًّا

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

আল্লাহ তায়ালা সাধারণত মানুষকে নিয়ামত প্রদান করে অথবা নিয়ামত থেকে বঞ্চিত রেখে পরীক্ষা করেন। যখন কাউকে নিয়ামত দিয়ে পরীক্ষা করতে চান, তখন তিনি তার সম্পদ বাড়িয়ে দিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন দান করেন। ফলে, সে মনে করে আল্লাহর কাছে সে মর্যাদাবান হওয়ার কারণে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন পেয়েছে এবং খুশী হয়ে বলে: আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন। অপরদিকে, তিনি যখন কাউকে নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করে পরীক্ষা করতে চান, তখন সামান্য কিছু দিয়ে তাকে টানপোড়নে রাখেন। ফলে, সে ক্ষুব্ধ হয়ে বলে: আমার রব আমাকে অপমানিত করেছে। এটা হলো মানুষের স্বার্থপরায়ণ স্বভাব, যা আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তিরস্কার করার জন্য এখানে উল্লেখ করেছেন।

আসলে মানুষ যে রকম মনে করছে, ব্যাপারটা সে রকম নয়, বরং আল্লাহর অনুসরণের মধ্যে সম্মান নিহিত এবং তাঁর অবাধ্যতার মধ্যে রয়েছে অপমান। অথচ তোমরা ইয়াতিমদেরকে ইকরাম করছো না, তাদের প্রতি সদাচারণ করছো না, মিসকীনদেরকে খাবার দানের প্রতি তোমরা পরস্পরকে উৎসাহিত করছো না, উত্তরাধিকারী সম্পত্তি বণ্টন না করে অন্যের অধিকারকে আত্মসাৎ করছো এবং তোমরা সম্পদকে বেপরোয়া হয়ে ভালো বাসছো, যে কারণে তোমরা ডানে-বামে সম্পদ উপার্জন করে জমা করছো, আল্লাহর পথে ব্যয় করতে পারছো না। এ অবস্থায় তোমরা কিভাবে আল্লাহর ইকরাম আশা করতে পার?। (*আইসার*, ৫/৬৮, *আল-মুন্তাখাব*, ৯০৬, *আল-মুয়াস্সার*, ১/৫৯৩) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা ও আমল:

১। দুনিয়া হলো মানব জাতির পরীক্ষার জায়গা, যারা আল্লাহর বিধানকে জানে এবং মানে এ পরীক্ষায় কেবল তারাই পাশ করে।

২। বান্দা যখন সম্পদ ইসলামী শরিয়াতের নিয়ম অনুযায়ী ব্যয় করে, তখন তার সম্পদ নিয়ামত হিসেবে পরিগণিত হয়। অপরদিকে সে যখন সম্পদকে ইসলামী নিয়মকে পরোয়া না করে যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করে, তখন ঐ সম্পদ তার জন্য লাঞ্চনার কারণ হয়।

(*তাফসীর মাওজুয়ী*, মোস্তফা মুসলিম, ১০/১৩১) ।

৩। আবু বকর আল-জাযায়িরী (র.) উল্লেখিত আয়াতসমূহের চারটি শিক্ষা বর্ণনা করেছেন:

(ক) জড়বাদী চিন্তাচেতনা নুতন কোন বিষয় নয়, চৌদ্দশত বছর পুর্বে মক্কার কাফের মুশরিকরা এ আদর্শের সাথে পরিচিত ছিলো।

(খ) ইয়াতিমদের প্রতি অনুগ্রহ করা এবং ফকীর-মিসকীনকে নিজে খাবার খাওয়ানো ও অন্যদেরকে এ কাজের প্রতি উৎসাহিত করা ওয়াজিব।

(গ) উত্তরাধিকারী সম্পদ ছোট-বড় এবং নারী-পুরুষ সকল ওয়ারিসদেরকে তাদের নির্ধারিত অংশ প্রদান করা ওয়াজিব।

(ঘ) সম্পদের প্রতি এমন লোভ করা থেকে সতর্ক করা হয়েছে, যা সম্পদের হক আদায় করা থেকে বিরত রাখে। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ৫/৫৬৯) ।

৪। মানুষ সাধারণত মনে করে সম্পদ থাকা মর্যাদার লক্ষণ আর না থাকা লাঞ্চনার নিদর্শন। মানুষের প্রচলিত এ ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিলেন সম্পদ থাকার পরেও কেউ লাঞ্চিত হতে পারে যদি সে সম্পদ নিয়ে বড়াই করে এবং তার হক আদায় না করার কারণে এ পরীক্ষায় ফেইল করে। আবার সম্পদ না থাকলেও কেউ সম্মানিত হতে পারে যদি সে ধৈর্য ধারণ করে হারাম থেকে বেচে থাকার মাধ্যমে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। (*আল-মুনীর*, ৩০/২৩৪) ।

৫। উল্লেখিত আয়াত থেকে বুঝা যায় "অন্যের থেকে অনুগ্রহ পেয়ে সম্মানিত হওয়ার চেয়ে অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করে সম্মানিত হওয়া উত্তম"।

৬। চারটি কাজ করার মাধ্যমে মানুষ সম্মানিত হতে পারে: (ক) ইয়াতিমের প্রতি অনুগ্রহ করা, (খ) মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো, (গ) উত্তরাধিকারীর সম্পত্তির সুষ্ঠ বণ্ঠণ এবং (ঘ) সম্পদের ভালোবাসার প্রতি বেপড়োয়া না হওয়া। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (٢١) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (٢٢) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ
بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (٢٣) يَقُولُ يَالَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (٢٤)
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (٢٥) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ (٢٦) يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ
(٢٧) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (٢٨) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي
(٣٠)﴾ [سورة الفجر: ٢١-٣٠].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়: কিয়ামতে সুখী মানুষ এবং দুঃখী মানুষ।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

২১	এটা কখনও ঠিক নয়,	যখন	যমীনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে	পরিপূর্ণভাবে।	২২	এবং
	كَلَّا	إِذَا	دُكَّتِ الْأَرْضُ	دَكًّا دَكًّا		وَ

আগমণ করবেন	তোমার রব	এবং ফেরেশতাগণ	সারিবদ্ধভাবে।	২৩	উপস্থিত করা হবে
جَاءَ	رَبُّكَ	وَالْمَلَكُ	صَفًّا صَفًّا		وَجِيءَ

সে দিন	জাহান্নামকে,	এবং সেদিন	মানুষ উপলব্ধি করতে পারবে,	কিন্তু কি কাজে আসবে
يَوْمَئِذٍ	بِجَهَنَّمَ	يَوْمَئِذٍ	يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ	وَأَنَّى

তার	এ উপলব্ধি?	২৪	সে বলবে:	হায়!	যদি অগ্রীম কিছু পাঠাতাম	এ জীবনের জন্য।
لَهُ	الذِّكْرَى		يَقُولُ	يَالَيْتَنِي	قَدَّمْتُ	لِحَيَاتِي

২৫	অতঃপর সেদিন	আযাব দিতে পারবে না	তাঁর (আল্লাহর) আযাবের মত	কেউ।	২৬
	فَيَوْمَئِذٍ	لَا يُعَذِّبُ	عَذَابَهُ	أَحَدٌ	

এবং বাধতে পারবে না	তাঁর বাধার মত	কেউ।	২৭	হে প্রশান্ত আত্মা!	২৮	ফিরে এসো
وَلَا يُوثِقُ	وَثَاقَهُ	أَحَدٌ		يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ		ارْجِعِي

তোমার রবের প্রতি	সন্তুষ্টচিত্তে,	সন্তোষভাযন হয়ে।	২৯	অতঃপর শামিল হয়ে যাও
إِلَى رَبِّكِ	رَاضِيَةً	مَرْضِيَّةً		فَادْخُلِي

আমার বান্দাদের মধ্যে।	৩০	এবং প্রবেশ করো	আমার জান্নাতে।	
فِي عِبَادِي		وَادْخُلِي	جَنَّتِي	

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

তোমাদের আমল কখনও এমন হওয়া ঠিক নয়, যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, একসময় আসবে যখন যমীনকে পরিপূর্ণভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে হাশরের ময়দান তৈরি করা হবে। সেখানে

তোমার রব সৃষ্টি জগতের বিচার ফয়সালা করার জন্য উপস্থিত হবেন এবং তাঁর সাথে সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতা থাকবে। জাহান্নামকে টেনে এনে প্রথমে হাশরের ময়দানের বাম পাশে রাখা হবে, এরপরে তা দিয়ে হাশরের ময়দানকে ঘিরে ফেলা হবে। ঐ দিন দুর্ভাগা মানুষ তাদের নিজেদের ভুলের কথা বুঝতে পেরে লজ্জায় চিৎকার করে বলবে: হায় আফসোষ! এ জীবনের জন্য আগে যদি কিছু সৎআমল পাঠিয়ে রাখতে পারতাম, তাহলে আজ আমাদের এ দশা হতো না। কিন্তু তাদের এ উপলব্ধি এবং আক্ষেপ কোন উপকারে আসবে না। সেদিন এ অবস্থায় দুর্ভাগা পাপীদেরকে আল্লাহ এমন শাস্তি দিবেন যা অন্য কেউ দিতে পারবে না এবং তাঁর বাঁধনের মতো পাপীদেরকে কেউ বাঁধতে পারবে না।

সৌভাগ্যবান নেককারদেরকে বলা হবে, হে প্রশান্ত আত্মা! পার্থিব জীবনের নেকআমলের বিনিময়ে তোমাদেরকে যে নিয়ামত প্রদান করা হয়েছে, তাতে সন্তুষ্ট হয়ে এবং তাঁর প্রিয়ভাজন হয়ে তোমার প্রভুর নিকটে ফিরে যাও। সুতরাং তোমরা আমার প্রিয় বান্দাদের লাইনে শামিল হয়ে যাও এবং তাদের সাথে মহামূল্যবান স্থায়া জান্নাতে প্রবেশ করো।

(*আল-মুন্তাখাব*, ৯০৬-৯০৭, *আল-মোয়াস্সার*, ১/৫৯৪, *আইসার*, ৫/৫৭০-৫৭১) ।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ 'প্রশান্ত আত্মা' দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে ইবনু তাইমিয়্যাহ (র.) এর থেকে সুন্দর উক্তি পাওয়া যায়। তিনি বলেন: মানুষের আত্মা তিন প্রকার:

(ক) 'আল-নাফ্স আল-মুতমায়িন্না' বা প্রশান্ত আত্মা, মানুষের এমন অন্তর যা সর্বদা ভালো চিন্তা করে এবং ভালো কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এ প্রকার আত্মা সম্পর্কে অত্র সূরার ২৭ নাম্বার আয়াতে কথা বলা হয়েছে।

(খ) 'আল-নাফ্স আল-লাওয়্যামাহ' বা দোষারোপকারী আত্মা, মানুষের এমন অন্তর যা মাঝে মধ্যে কোন খারাপ চিন্তা বা কাজ করে ফেললে নিজেকে ভৎসনা বা দোষারোপ করে তাওবা করার মাধ্যমে শোধরিয়ে নেয়। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরানে এসেছে:

﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ [سورة القيامة: ٢].

অর্থাৎ: "আমি শপথ করছি এমন আত্মার, যা দোষত্রুটির পর নিজেকে ধিক্কার দেয়" (সূরা আল-ক্বিয়ামাহ, ২) ।

(গ) 'আল-নাফ্স আল-আম্মারাহ' বা প্রবৃত্তি, মানুষের এমন অন্তর যা সর্বদা খারাপ চিন্তা ও কাজে মত্ত থাকে, সে ভালো কোন চিন্তাই করতে পারে না। এ অন্তর সম্পর্কে কোরআনে এসেছে: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ [سورة يوسف: ٥٣].

অর্থাৎ: 'নিশ্চয় মানুষের প্রবৃত্তি মন্দের প্রতিই প্ররোচনা দিতে থাকে" (সূরা ইউসুফ, ৫৩) ।

(*আল-আমরু বিল মারুফ*, ইবনু তাইমিয়্যাহ, ৩১) ।

(২৭-৩০) নাম্বার আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

ইবনু আবি হাতিম (র.) বলেন, অত্র আয়াতসমূহ হামযা (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।
কেউ কেউ বলেন: আবু বকর (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘোষণা দিলেন, যে ব্যক্তি রুমা কুপটি ক্রয় করে মানুষের পানি পান ও সেচের ব্যবস্থা করবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর ওসমান (রা.) কুপটি ক্রয় করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি তা মানুষের জন্য উৎসর্গ করবে? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যা, হে আল্লাহর রাসূল! তখন ওসমান (রা.) সম্পর্কে অত্র আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। (*আল-দুর্‌রু আল-মানসুর*, সুয়ূতী, ৮/৫১৪) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। ২১ নাম্বার আয়াতের প্রথমাংশ (কাল্লা বা কখনও ঠিক নয়) থেকে বুঝা যায় যে যারা নিম্নের চারটি কাজ করবে, তারা কিয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তাদের ভুল বুঝতে পেরে আক্ষেপ করবে: (ক) ইয়াতিমের প্রতি অনুগ্রহ না করা, (খ) মিসকীনকে খাবার না খাওয়ানো, (গ) উত্তরাধিকারীর সম্পত্তির সুষ্ঠ বণ্ঠণ না করে আত্মসাৎ করা এবং (ঘ) সম্পদের ভালোবাসার প্রতি বেপড়োয়া হওয়া।

২। (২১-২৬) নাম্বার আয়াতে কিয়ামতের ছয়টি অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে:

(ক) পৃথিবী এক প্রচন্ড ভূমিকম্পে ধ্বংসাবশেষে পরিণত হবে।

(খ) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিচার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবেন।

(গ) সারি সারি ফেরেশতা হাশরের ময়দান প্রহরার দায়িত্বে থাকবেন।

(ঘ) জাহান্নামকে টেনেহিঁচড়ে হাশরের ময়দানে আনায়ন করা হবে।

(ঙ) হাশরের ময়দানে মানুষ নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আপসোষ করতে থাকবে।

(চ) শাস্তিপ্রাপ্তদেরকে আল্লাহ এমনভাবে বেধে শাস্তি দিবেন যে শাস্তি কেউ কখনও কল্পনা করে নাই। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/২৩৮) ।

৩। (২৩-২৪) নাম্বার আয়াতে পাপীদের অবস্থা তুলে ধরে বলা হয়েছে, তারা কিয়ামতের দিন নিজেদের ভুল বুঝে শোধরানোর চেষ্টা করবে, কিন্তু সে সুযোগ আখেরাতে নেই। অবশেষে তারা আক্ষেপ করে বলতে থাকবে "হায় দুনিয়ায় যদি পাপ কাজে না জড়িয়ে সৎআমল করতাম"। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে অসংখ্য আয়াত রয়েছে, যেমন: সূরা গাফির এর ৫২ নাম্বার আয়াত, সূরা আনআম এর (২৭-২৮) নাম্বার আয়াত, সূরা সাজদা এর ১২ নাম্বার আয়াত, সূরা নাবা এর ৪০ নাম্বার আয়াত ইত্যাদি জায়গাতে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতে কাফিরদের আক্ষেপ ও অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরেছেন।

৪। সেরা আত্মা বা আল-নাফস আল-মুতমায়িন্না, যা আল্লাহ তায়ালার একান্ত বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ প্রকার আত্মার অধিকারী হওয়ার সর্বোত্তম উপয় হলো- "সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিক্‌র"। এ বিষয়ে অসংখ্য আয়াত রয়েছে, যেমন: আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [سورة الرعد: ٢٨].

অর্থাৎ: "যারা ঈমান আনে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর যিক্‌র এ প্রশান্ত হয়, জেনে রেখো একমাত্র যিক্‌রের মাধ্যমেই মানুষের অন্তর প্রশান্ত হয়" (সূরা আল-রা'দ, ২৮) ।

আয়াতাবলীর আমল:

১। আখেরাত ও কিয়ামতের ভয়াবহ চিত্রকে স্মরণ করা।

২। সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করা।

(سورة البَلَد)

সূরা আল্-বালাদ এর পরিচয়:

সূরার নাম:
ইমাম শাওকানী (র.) এর ভাষ্যানুযায়ী অত্র সূরার দুইটি নাম রয়েছে: (ক) সূরা আল্-বালাদ এবং (খ) সূরা লা উকসিমু। এর বাহিরে তার কোন নাম পাওয়া যায় না। (*ফাতহুল ক্বাদীর*, ৫/৫৩৮) ।

আলোচ্যবিষয়: মানুষের উপর আল্লাহর কর্তৃত্ব এবং জীবন পরিচালনায় তার দায়িত্ব-কর্তব্য।

সূরার ফযিলত: সহীহ হাদীসে অত্র সূরার বিশেষ কোন ফযিলত পাওয়া যায় না। তবে তা মুফাস্‌সালাত এর অন্তভুক্ত, আর মুফাস্‌সালাত সূরাগুলোকে কোরআনের অন্তর বলা হয়। যেমন: ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন,

(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].

অর্থাৎ: "প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, আর কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্‌সাল সূরাগুলো"।
(*সুনানে দারিমী*, ৩৪২০) ।

আরো একটি হাদীসে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে মুফাস্‌সালাত সূরাগুলো ইতিপূর্বে কোন নবী-রাসূলকে প্রদান করা হয়নি। যেমন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةَ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].

অর্থাৎ: "আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিষিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিষিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্‌সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি"। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪) ।
হাদীসে মুফাস্‌সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ৯০তম সূরা।

অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ৩৪তম সূরা, যা 'সূরা ক্বফ' এর পরে এবং 'সূরা ত্বারিক' এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

অবতীর্ণের স্থান: সকল আলেম এক মত পোষণ করেছেন যে, অত্র সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, সূরা মাক্কিয়্যাহ। (*বিতাকাত আল-তারীফ*, ৩১০) ।

আয়াত সংখ্যা: ২০টি।

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: এ সূরাটি অবতীর্ণের কোন প্রেক্ষাপট পাওয়া যায় না।

﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (١) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (٢) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
فِي كَبَدٍ (٤) أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (٥) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا (٦) أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ
يَرَهُ أَحَدٌ (٧)﴾ [سورة البلد: ١–٧].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়: মানুষ ক্লান্তি দ্বারা পীড়িত এবং ক্ষমতা ও অর্থ দ্বারা প্রতারিত।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১	আমি শপথ করছি	এই	নগরীর।	২	আর (হে নবী!) তুমি	মুক্ত	এই নগরীতে।
	لَا أُقْسِمُ	بِهَذَا	الْبَلَدِ		وَأَنْتَ	حِلٌّ	بِهَذَا الْبَلَدِ

৩	শপথ জন্ম দাতার	এবং সে জন্ম দিয়েছে তার।	৪	অবশ্যই	আমি সৃষ্টি করেছি
	وَوَالِدٍ	وَمَا وَلَدَ		لَقَدْ	خَلَقْنَا

মানুষকে	কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে।	৫	সে কি ধারণা করেছে	যে	কখনো শক্তিধর হবে না
الْإِنْسَانَ	فِي كَبَدٍ		أَيَحْسَبُ	أَنْ	لَنْ يَقْدِرَ

তার উপর	কেউ?	৬	সে বলে:	আমি নিঃশেষ করেছি	প্রচুর ধনসম্পদ।	৭
عَلَيْهِ	أَحَدٌ		يَقُولُ	أَهْلَكْتُ	مَالًا لُبَدًا	

সে কি ধারণা করছে	যে	কেউ তাকে দেখেনি?
أَيَحْسَبُ	أَنْ	لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র মক্কা নগরী (যা আদম (আ.), ইব্রাহীম (আ.), ইসমাঈল (আ.) এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) সহ অসংখ্য নবী-রাসূলদের পদচারণায় মর্যাদাপূর্ণ হয়েছে) এবং আদম (আ.) ও তার সন্তানদের শপথ করে বলেছেন: নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টিগতভাবে কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে রেখে দিয়েছি, যে কারণে সে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কষ্ট-ক্লেশের মধ্যেই থাকে।

আবুল আশদীন ইবনু কালাদাহ নামক মুশরিক কি ধারণা পোষণ করে যে, তাকে বশ করার ক্ষমতা কারো নেই? অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সময়মতো তাকে পাকড়াও করবেন। সে অহংকার করে বলে: মোহাম্মদের শত্রুতা পোষণ করতে এবং তার দাওয়াত থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখতে অনেক টাকা ব্যয় করেছি। সে কি আরো ধারণা পোষণ করে যে, তার এ বিষয়টি গোপন আছে, আল্লাহ তায়ালা তা দেখছেন না এবং তার বিচার করবেন না? অবশ্যই আল্লাহ তার কর্মকান্ড দেখছেন এবং একদিন বিচার করবেন।

(*আল-মুন্তাখাব*, ৯০৮, *আল-মোয়াস্সার*, ১/৫৯৪, *আইসার*, ৫/৫৭২)।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿لَا أُقْسِمُ﴾ 'আমি শপথ করছি', সকল মুফাসসির এক মত যে, অত্র আয়াতাংশে 'লা' বা 'না' শব্দটি নেতিবাচক অর্থ বুঝাতে আসেনি, বরং বাক্যের সৌন্দর্য রক্ষার জন্য এসেছে।

﴿بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ 'এই নগরী' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: মক্কা নগরী। (*আইসার*, ৫/৫৭২)।

﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾ 'পিতা এবং সন্তান', এখানে পিতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: আদম (আ.) এবং সন্তান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: তার বংশধর। (*গরীব আল-কোরআন*, ইবনু কুতাইবা, ৪৫৪)।

﴿أَيَحْسَبُ﴾ 'সে কি ধারণা করছে', অত্র আয়াতাংশে সে দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: আবুল আসদীন ইবনু কালাদা নামক মুশরিক। (*আইসার*, ৫/৫৭২)।

সূরা বালাদ এর সাথে তার পূর্বের সূরার সম্পর্ক:

অত্র সূরার পূর্বের সূরা তথা সূরা ফাজর এর শেষাংশে প্রশান্ত আত্মার অবস্থা এবং তার জন্য প্রস্তুতকৃত জান্নাতের বর্ণনা দিয়েছেন, যা আখিরাত জীবনের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ স্থান। আর অত্র সূরা তথা সূরা বালাদে পৃথিবীর সবচেয়ে দামী স্থান মক্কা মোকাররমা এর বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং উভয় সূরার মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট। (*তাফসীর মওজুয়ী*, মোস্তফা মুসলিম, ১০/১৩৪)।

সূরা বালাদ এর সাথে তার পরের সূরার সম্পর্ক:

ইমাম সুয়ূতী (র.) বলেন: অত্র সূরা তথা সূরা বালাদ এবং তার পরবর্তী সূরা তথা সূরা শাম্স এর মধ্যকার সম্পর্ক খুবই স্পষ্ট। আল্লাহ তায়ালা সূরা আল-বালাদ এ ডানপন্থী এবং বামপন্থী মানুষ সম্পর্কে বর্ণনার পর সূরা শাম্স এ তার সারমর্ম উল্লেখপূর্বক বলেন: যারা তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে তারা ডানপন্থী এবং যারা তাদের আত্মাকে কদর্য করে তারা বামপন্থী।

(*আসরার তারতীব আল-কোরআন*, সুয়ূতী, ১৫১)।

আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

বর্ণিত আছে যে, অত্র সূরার ৫ নাম্বার আয়াত আবুল আশদীন ইবনু কালাদাহ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে তার সাময়িক শারিরিক শক্তির ধোকায় পড়ে তা নিয়ে গর্ব করতো।

ইমাম মুক্বাতিল (র.) বলেন: অত্র সূরার ৬ নাম্বার আয়াত হারিস ইবনু আমির ইবনু নাওয়াফিল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। সে গুনাহ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে ফতোয়া চাইলে তিনি তাকে কাফ্ফারা প্রদান করতে বলেন। তখন সে উত্তরে বলে: মোহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করার পর থেকে কাযা-কাফ্ফারা দিয়ে সম্পদ শেষ করে ফেলেছি। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত অবতীর্ণ হলে সে লজ্জিত হয়।

ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: আবুল আশদীন ইবনু কালাদাহ বলতো: আমি মোহাম্মদের শত্রুতা পোষণ করতে এবং তার দাওয়াত থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখতে অনেক টাকা ব্যয় করেছি। তার সম্পর্কে অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/২৪৪)।

উল্লেখ্য যে, ইমাম সুয়ূতী (র.) তার 'লুবাব' এবং ইমাম ওয়াহিদী (র.) তার 'আসবাব আল-নুযুল' গ্রন্থে অত্র আয়াতদ্বয় অবতীর্ণের কোন প্রেক্ষাপট উল্লেখ করেননি। কিন্তু ইমাম জুহাইলী (র.) তার তাফসীর গ্রন্থ 'আল-মুনীর' এ কোন তথ্যসূত্র উল্লেখ ছাড়াই উল্লেখিত প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন।

সূরা বালাদে কসমের ব্যাখ্যা:

মানুষের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা জায়েজ নেই, যা অসংখ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে ধরাবাধা কোন নিয়ম নেই, সাধারণতঃ তিঁনি যে বিষয়ে কথা বলতে চান তার সাথে সম্পর্কিত কোন বস্তুর কসম করেন। অত্র সূরায় আল্লাহ তায়ালা পবিত্র নগরী এবং আদম ও তার বংশধরের শপথ করে মানুষের দুর্বল প্রকৃতির কথা বর্ণনা করেছেন। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী কসমের বর্ণনা নিম্নরূপ:

কসম বা শপথের বস্তু: মক্কা নগরী এবং আদম ও তার বংশধর, সূরার (১-৩) নাম্বার আয়াত।

জাওয়াবে কসম বা শপথের বিষয়বস্তু: মানুষের দুর্বল প্রকৃতির বর্ণনা, সূরার ৪ নাম্বার আয়াত।

কসম ও জাওয়াবে কসমের মধ্যে সম্পর্ক: শপথের বস্তু মক্কা নগরী, যা মানবজাতির ভুল সংশোধনের জন্য একটি আশার জায়গা এবং আদম (আ.), যিনি মানবজাতির আদি পিতা। আর আলোচনা করা হয়েছে মানবজাতির দুর্বল প্রকৃতি নিয়ে। সুতরাং কসম ও জাওয়াবে কসমের মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। আল্লাহ তায়ালা অত্র সূরার প্রথম আয়াতে মক্কা নগরীর শপথ করেছেন, দ্বিতীয় আয়াত 'জুমলা মু'তারেজা' বা মু'তারেজা বাক্য যেখানে রাসূলুল্লাহর (সা.) মক্কায় অবস্থানকে এ নগরীর জন্য মর্যাদা হিসেবে ভুষিত করেছেন, তৃতীয় আয়াতে আদম (আ.) ও তার বংশধরের শপথ করেছেন এবং চতুর্থ আয়াতে 'জাওয়াবে কসম' বা শপথের বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছেন যে "নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টিগতভাবে কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে রেখে দিয়েছি, যে কারণে সে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কষ্ট-ক্লেশের মধ্যেই থাকে"। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/২৪৩) ।

২। উল্লেখিত আয়াতসমূহে মানব জীবনের বাস্তব সত্য রূপটি চিত্রায়িত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে এমন একটি প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, তাদের কেউই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কষ্ট-ক্লেশ, রোগ-শোক, বালা-মুসিবত ইত্যাদি থেকে মুক্ত নয়। অতঃপর মৃত্যুর পর আখিরাত জীবনে ঈমানদারদের একদল যথেষ্ট সৎআমল থাকার কারণে আল্লাহর রহমত পেয়ে সরাসরি জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যমে চীরস্থায়ী সুখের অধিকারী হবে, আরেক দল বদআমলের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করে নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যমে চিরস্থায়ী সুখের অধিকারী হবে এবং কাফেররা তাদের কুফরীর কারনে আল্লাহর ক্রোধে পতিত হয়ে চিরস্থায়া জাহান্নামী হবে। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ৫/৪৭৩) ।

৩। অত্র আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়ালা মক্কা নগরী এবং আদম (আ.) ও তার বংশধরের মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিতের পাশাপাশি আদম সৃষ্টির বিস্ময়কর ঘটনা এবং তার ঔরষে মানব জাতি সৃষ্টির আশ্চর্যজনক ধারা চালু করার প্রতিও ইঙ্গিত দিয়েছেন। (তাফসীর আল-মুনীর, ৩০/২৪৫) ।

আয়াতাবলীর আমল:

১। মানুষকে দুর্বল করে বানানো হয়েছে এ কথা সর্বদা মাথায় লালন করা।

২। ধন-সম্পদ, সামাজিক ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ইত্যাদির মালিক হয়ে আসল মালিককে ভুলে না যাওয়া।

﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (٨) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (٩) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (١٠) فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ
(١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) يَتِيمًا
ذَا مَقْرَبَةٍ (١٥) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (١٦) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا
بِالْمَرْحَمَةِ (١٧) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (١٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ
(١٩) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ (٢٠)﴾ [سورة البلد: ٨-٢٠].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়: পছন্দের নীতি এবং পরকালে মুক্তির উপায়।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

৮	আমি কি দেইনি	তাকে	দুইটি চোখ?	৯	এবং একটি জিহ্বা	ও দুইটি ঠোঁট?	
	أَلَمْ نَجْعَلْ	لَهُ	عَيْنَيْنِ		وَلِسَانًا	وَشَفَتَيْنِ	
১০	এবং আমি তাকে প্রদর্শন করিয়েছি	দুইটি পথ।	১১	কিন্তু সে অতিক্রম করতে পারেনি			
	وَهَدَيْنَاهُ	النَّجْدَيْنِ		فَلَا اقْتَحَمَ			
দুর্গম পথটি।	১২	তুমি কি জানো	সে দুর্গম পথটি কি?	১৩	তা হচ্ছে, দাস মুক্তকরণ।		
الْعَقَبَةَ		وَمَا أَدْرَاكَ	مَا الْعَقَبَةُ		فَكُّ رَقَبَةٍ		
১৪	অথবা,	খাদ্য দান করা	দুর্ভিক্ষের দিনে।	১৫	ইয়াতিম	আত্মীয়-স্বজনকে।	১৬
	أَوْ	إِطْعَامٌ	فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ		يَتِيمًا	ذَا مَقْرَبَةٍ	
অথবা, ধুলি-মলিন মিসকীনকে।	১৭	অতঃপর	যারা ঈমানদারদের দলে শামিল হয়,				
أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ		ثُمَّ	كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا				
পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়	এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয়	দয়া-অনুগ্রহের।	১৮				
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ	وَتَوَاصَوْا	بِالْمَرْحَمَةِ					
তারাই	ডানপন্থী (সৌভাগ্যবান)।	১৯	আর যারা	অস্বীকার করে	আমার আয়াতসমূহ		
أُولَئِكَ	أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ		وَالَّذِينَ	كَفَرُوا	بِآيَاتِنَا		
তারা হচ্ছে	বামপন্থী (দুর্ভাগা) ।	২০	তাদের উপর থাকবে	অবরুদ্ধ আগুন।			
هُمْ	أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ		عَلَيْهِمْ	نَارٌ مُؤْصَدَةٌ			

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

আমি আবুল আশদীন ইবনু কালাদাহ সহ সকল মানুষকে দুইটি করে চক্ষু দিয়েছি, যা দিয়ে তারা দেখে, একটি জিহ্বা ও দুইটি ঠোট দিয়েছি, যা দিয়ে তারা কথা বলে এবং তাদেরকে সৎ ও ভ্রান্ত দুইটি পথ দেখিয়ে কোনটি গ্রহণ করবে তা তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছি। অতঃপর তাদের বেশীরভাগ মানুষ সব ভুলে গিয়ে অন্ধ হয়ে গেছে, ফলে আমি তাদেরকে যে নেয়ামত দিয়েছি, তা তারা আমার রাসূল ও দ্বীনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে।

আবুল আশদীনকে যে নেয়ামত দেওয়া হয়েছে, তা আল্লাহর পথে ব্যয় না করে, কেন মোহাম্মাদের দাওয়াতী কাজে বাধা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করেছে!। অথচ সে নিম্নের পাঁচটি কাজ করার মাধ্যমে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারতো:

(ক) দাস মুক্ত করা।
(খ) দুর্ভিক্ষের দিনে এতিম আত্মীয়-স্বজন ও ধুলি-মলিন মিসকীনকে খাদ্য দান করা।
(গ) একান্ত চিত্তে ঈমানদারদের দলে শামিল হওয়া।
(ঘ) আল্লাহর নির্দেশ পালনে পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া।
(ঙ) সৎচরিত্রের মাধ্যমে পরস্পরকে দয়া-অনুগ্রহের উপদেশ দেওয়া।

উল্লেখিত গুনে যারা গুনান্বিত হবে তারাই ডনিপন্থী সৌভাগ্যবান মুসলিম, তারা চিরকাল জান্নাতে সুখে বসবাস করবে। অপরদিকে যারা রাসূলকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর আয়াতাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তারা বামপন্থী দুর্ভাগা। আখেরাতে তাদেরকে জাহান্নামের আগুন ঘিরে ফেলবে।

(*আইসার*, ৫/৫৭৩-৫৭৫, *আল-মুন্তাখাব*, ৯০৮, *আল-মুয়াস্‌সার*, ১/৫৯৪)।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الْعَقَبَةَ﴾ 'দুর্গম পথ', এখানে উদ্দেশ্য হলো: জাহান্নাম থেকে মুক্তির পথ।

﴿نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ﴾ 'অবরুদ্ধ আগুন', উদ্দেশ্য হলো: এমন জাহান্নাম যার কোন জানালা-দরজা নেই, নেই কোন স্কাইলাইট যা দিয়ে বাহিরের আলো-বাতাস ঢুকবে। (*আইসার*, ৫/৫৭৪)।

উল্লেখিত আয়াতাবলীর সাথে পূর্বের আয়াতাবলীর সম্পর্ক:

(১-৭) নাম্বার আয়াতে অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর প্রকৃতির মানুষকে তিরস্কার এবং অবজ্ঞার পরে (৮-১১) নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নিজের পরিপূর্ণ ক্ষমতার দলীল হিসেবে মানব জাতির চক্ষু, জিহ্বা, ঠোট ইত্যাদি সৃষ্টির বিবরণ দিয়েছেন এবং তাদেরকে হক-বাতিলের পার্থক্যদানকারী মহামূল্যবান আক্বল প্রদান করে সৎপথ অথবা অসৎপথ গ্রহণকে তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। অবশেষে, (১২-২০) নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: যারা তাঁর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়পূর্বক সৎপথকে আকড়ে ধরে তারা সৌভাগ্যবান এবং যারা অসৎপথকে গ্রহণ করে তারা দুর্ভাগা। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/২৪৯)।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। আল্লাহ তায়ালা চক্ষু, জিহ্বা, ঠোট এবং বিবেক চারটি নেয়ামতকে কয়েকটি কারণে অত্র সূরায় উল্লেখ করেছেন: (ক) মানুষের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য, (খ) আল্লাহর পরিপূর্ণ ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য এবং (গ) মানুষ হক এবং বাতিলের কোনটি গ্রহণ করবে তা তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, এ কথার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/২৫৩)। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে অসংখ্য আয়াত এসেছে, যেমন: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، إِمَّا شَاكِرًا، وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [سورة الدهر:٣].

অর্থাৎ: "আমি তাকে চলার পথ দেখিয়ে দিয়েছি, সে চাইলে আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হবে, না হয় অকৃতজ্ঞ কাফের হয়ে যাবে" (*সূরা দাহ্‌র: ৩*)। সূরা কাহ্‌ফ এর একটি আয়াতে এসেছে:

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [سورة الكهف: ٢٩].

অর্থাৎ: "এবং হে নবী! বলো: সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে, যে চায় ঈমান গ্রহণ করবে আর যে চায় কাফের হবে" (*সূরা কাহ্‌ফ*: ২৯)।

২। (১৩-১৮) নাম্বার আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ পাঁচটি বিষয় পালন করা মানুষের উপর ওয়াজিব:

(ক) একান্ত চিত্তে ঈমানদারদের দলে শামিল হওয়া।
(খ) আল্লাহর নির্দেশ পালনে পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া।
(গ) সৎচরিত্রের মাধ্যমে পরস্পরকে দয়া-অনুগ্রহের উপদেশ দেওয়া।
(ঘ) দাস মুক্ত করা বা অন্যের সমস্যা লাঘব করা।
(ঙ) দুর্ভিক্ষের দিনে এতিম আত্মীয়-স্বজন ও ধুলি-মলিন মিসকীনকে খাদ্য দান করা।

(আল্লাহই ভালো জানেন)।

৩। মানুষ তার অর্জিত সম্পদ কল্যান তথা আল্লাহর পথে ব্যয় করলে, সে জান্নাতী হবে। অপরদিকে সে তার সম্পদ অকল্যান তথা শয়তানের পথে ব্যয় করলে, জাহান্নামী হবে। (*আইসার*, ৫/৫৭৫)। যেমন: একটি হাদীসে দেখতে পাই, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

لاَ تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ. (سنن الترمذي: ٢٦٠١].

অর্থাৎ: "কিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দেওয়া পর্যন্ত আদম সন্তান তার রব থেকে এক কদম সামনে অগ্রসর হতে পারবে না: (ক) তার বয়স সম্পর্কে, সে তা কোন পথে শেষ করেছে, (খ) তার যৌবন সম্পর্কে, সে তা কোথায় খরচ করেছে, (গ) তার সম্পদ সম্পর্কে, সে তা কোন পন্থায় উপার্জন করেছে, (ঘ) সম্পদ কোথায় খরচ করেছে এবং (ঙ) যা জেনেছে তা আমল করেছে কি না?" (*আল-তিরমিযী*, ২৬০১)।

আয়াতাবলীর আমল:

আখেরাতে সৌভাগ্যবান হওয়ার জন্য পাঁচটি কাজ করা: ঈমানদার হওয়া, ধৈর্য ধারণ করা, অন্যের প্রতি দয়া করা, অন্যের সমস্যা লাঘব করা এবং এতিম মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো।

(سورة الشَّمْس)

সূরা শাম্‌স এর পরিচয়:

সূরার নাম:

- ইবনু আশুর (র.) বলেন: বেশীরভাগ মুসহাফ এবং কিছু কিছু তাফসীরগ্রন্থে অত্র সূরাকে “সূরাতু আশ-শাম্‌স” (ওয়াও উল্লেখ ছাড়া) নামে নামকরণ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ইমাম তিরমিযী (র.) তার সুনানে অত্র নামে শিরোনাম করেছেন।
- কতিপয় তাফসীরকারক “সূরাতু ওয়া আশ-শাম্‌স” (ওয়াও উল্লেখ সহ) নামে নামকরণ করেছেন। ইমাম বুখারী (র.) তার সহীহ গ্রন্থে এ নামে শিরোনাম করেছেন।

ইমাম সুয়ূতী (র.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘আল-ইতক্বান’ এ অত্র সূরাটি একটি নাম বিশিষ্ট সূরার নামের তালিকায় রেখেছেন। (*তাফসীর আল-মাওজুয়ী*, ১০/১৪১) ।

আলোচ্যবিষয়: পবিত্র আত্মার সফলতা এবং কদর্য আত্মার ব্যর্থতার বিবরণ।

সূরার ফযিলত: সালাতে সূরা আ’লা, শাম্‌স এবং লাইল তেলাওয়াতকে বড় সূরা তেলাওয়াতের স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যেমন: সহীহ বুখারীতে জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে:

قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ، فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي، فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ البَقَرَةِ، أَوِ النِّسَاءِ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ، أَوْ أَفَاتِنٌ؟ ثَلاَثَ مِرَارٍ، فَلَوْلاَ صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الحَاجَةِ. [صحيح البخاري: ٧٠٥].

অর্থাৎ: তিনি বলেন: জনৈক সাহাবী দুইটি উটের পিঠে পানি নিয়ে আসছিলেন। রাতের অন্ধকার তখন ঘনীভূত হয়ে এসেছিল। এ সময় তিনি মু’আয (রা.) কে সালাত আদারত পান, তিনি তার উট দুইটি বসিয়ে মুয়ায (রা.) এর দিকে সালাত আদায় করতে এগিয়ে গেলেন। মু’আয (রা.) সূরা বাক্বারা বা সূরা আন-নিসা পড়তে শুরু করেন। এতে সাহাবী জামাত ছেড়ে চলে যান। পরে তিনি জানতে পারেন যে, মু’আয (রা.) এজন্য তার সমালোচনা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহর এর কাছে এসে মু’আয (রা.) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: হে মু’আয তুমি কি লোকদের ফিতনায় ফেলতে চাও? অথবা তিনি বলেছিলেন: তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী? তিনি একথা তিনবার বলেন। অতঃপর তিনি বলেন: তুমি সূরা আ’লা, শাম্‌স এবং লাইল দ্বারা সালাত আদায় করলে না কেন? কারন, তোমার পিছনে দুর্বল, বৃদ্ধ ও হাজতওয়ালা লোক সালাত আদায় করে থাকে। (*সহীহ আল-বুখারী*, ৭০৫) ।

এছাড়াও, অত্র সূরাটি মুফাস্‌সালাত এর অন্তভূক্ত, আর মুফাস্‌সালাত সূরাগুলোকে কোরআনের অন্তর বলা হয়। যেমন: ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন,

(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].

অর্থাৎ: “প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, আর কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্সাল সূরাগুলো”। (*সুনানে দারিমী*, ৩৪২০) ।

আরো একটি হাদীসে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে মুফাস্সালাত সূরাগুলো ইতিপূর্বে কোন নবী-রাসূলকে প্রদান করা হয়নি। যেমন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةِ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].

অর্থাৎ: “আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিষিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিষিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি”। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪) ।

হাদীসে মুফাস্সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ৯১তম সূরা।

অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ২৫তম সূরা, যা ‘সূরা ক্বাদ্‌র’ এর পরে এবং ‘সূরা আল-বুরূজ’ এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

অবতীর্ণের স্থান: সকল আলেম এক মত পোষণ করেছেন যে, অত্র সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, সূরা মাক্কিয়্যাহ। (*বিতাকাত আল-তারীফ*, ৩১৬) ।

আয়াত সংখ্যা: ১৫টি।

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: এ সূরাটি অবতীর্ণের কোন প্রেক্ষাপট পাওয়া যায় না।

﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (١) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا (٢) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (٣) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (٤)
وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (٥) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (٦) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (٨)
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (١٠) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (١١) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا
(١٢) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (١٣) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ
فَسَوَّاهَا (١٤) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (١٥)﴾ [سورة الشمس].

সূরার আলোচ্য বিষয়: পবিত্র আত্মার সফলতা এবং কদর্য আত্মার ব্যর্থতা।

সূরার সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১	শপথ সূর্যের	এবং	তার কিরণের।	২	শপথ চাঁদের,	যখন	তা সূর্যের অনুগামী হয়।
	وَالشَّمْسِ	وَ	ضُحَاهَا		وَالْقَمَرِ	إِذَا	تَلَاهَا
৩	শপথ দিবসের,	যখন	তা সূর্যকে প্রকাশ করে।	৪	শপথ রাতের,	যখন	তা সূর্য ঢেকে দেয়।
	وَالنَّهَارِ	إِذَا	جَلَّاهَا		وَاللَّيْلِ	إِذَا	يَغْشَاهَا
৫	শপথ আকাশের	এবং যিনি তা বানিয়েছেন।	৬	শপথ যমীনের	এবং তা বিস্তৃতকারীর।		
	وَالسَّمَاءِ	وَمَا بَنَاهَا		وَالْأَرْضِ	وَمَا طَحَاهَا		
৭	শপথ আত্মার	এবং যিনি তা সুসম করেছেন।	৮	অতঃপর তাকে অবহিত করেছেন			
	وَنَفْسٍ	وَمَا سَوَّاهَا		فَأَلْهَمَهَا			
তার পাপসমূহ	এবং তার তাকওয়া সম্পর্কে।	৯	অবশ্যই সে (ব্যক্তি) সফলকাম হবে	যে			
فُجُورَهَا	وَتَقْوَاهَا		قَدْ أَفْلَحَ	مَنْ			
তাকে পরিশুদ্ধ করবে।	১০	এবং সে (ব্যক্তি) ব্যর্থ হবে	যে তার আত্মাকে কলুষিত করবে।				
زَكَّاهَا		وَقَدْ خَابَ	مَنْ دَسَّاهَا				
১১	সামূদ জাতি (সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো	অবাধ্যতাবশত।	১২	যখন (সে)			
	كَذَّبَتْ ثَمُودُ	بِطَغْوَاهَا		إِذِ			
তৎপর হয়ে উঠেছিলো	যে (ব্যক্তি) তাদের মধ্যে সর্বাধিক হতভাগ্য।	১৩	তখন বলেছিলো				
انْبَعَثَ	أَشْقَاهَا		فَقَالَ				
তাদেরকে	আল্লাহর রাসূল:	আল্লাহর উষ্ট্রী	ও তার পানি পান সম্পর্কে সতর্ক হও।				
لَهُمْ	رَسُولُ اللَّهِ	نَاقَةَ اللَّهِ	وَسُقْيَاهَا				
১৪	কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বললো,	অতঃপর উষ্ট্রীকে যবেহ করলো,	ফলে ধ্বংস করে দিলেন				
	فَكَذَّبُوهُ	فَعَقَرُوهَا	فَدَمْدَمَ				
তাদেরকে তাদের রব	তাদের পাপের কারণে,	অতঃপর তা একাকার করে দিলেন।	১৫	আর			
عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ	بِذَنْبِهِمْ	فَسَوَّاهَا		وَ			
তিনি ভয় করেন না	তার পরিণামকে।						
لَا يَخَافُ	عُقْبَاهَا						

সূরার ভাবার্থ:

আল্লাহ তায়ালা আটটি বস্তু তথা সূর্য ও তার কিরণ, চন্দ্র যখন তা সূর্যের পরে আভির্ভূত হয়, দিন যখন তা সূর্যকে প্রকাশ করে দেয়, রাত যখন তা সূর্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, আকাশ ও তার নির্মাণদাতা, যমীন ও তার বিস্তীর্নকারী এবং আত্মা ও যিনি তাকে সুঠাম করে ভালো-মন্দের জ্ঞান দান করেছেন, এর শপথ করে বলেছেন: যারা আমলে সালিহ করার মাধ্যমে তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে তারা সফল হবে আর যারা অসৎআমল করার মাধ্যমে তাদের আত্মাকে কদর্য করবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ততঃপর আল্লাহ তায়ালা যারা অসৎআমল করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের উদাহরণ দিয়ে বলেন: সামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত সত্যকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছিলো। যখন তাদের মধ্যে এক কুলাঙ্গার 'কুদ্দার বিন সালেফ' নবী সালিহ (আ.) কে নির্যাতন করতে সর্বাধিক তৎপর হয়ে উঠেছিল। তখন তাদের নবী বলেছিলো: আল্লাহর উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যাও। কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বললো এবং উষ্ট্রীকে যবেহ করলো। ফলে তাদের রব গুনাহের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন। আর আল্লাহ তায়ালার সে ভয় নেই যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন, ফলে কোন বৃহৎ শক্তি তার প্রতিশোধ নিবে। তিনি এ শাস্তির পরিণাম থেকে ভয়শূন্য।

(*তাফসীর আল-মুয়াস্‌সার*, ১/৫৯৫) ।

সূরার অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿وَضُحَاهَا﴾ 'তার কিরণের', অত্র আয়াতাংশের মূল অর্থ হলো: দিনের প্রথম ভাগ। এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে তাফসীরকারদের কয়েকটি মত পাওয়া যায়: (ক) সূর্যের কিরণ, (খ) চাস্তের সময় এবং (গ) দিন। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাড়ায়: সূর্য এবং তার কিরণের শপথ, অথবা সূর্য এবং চাস্তের শপথ, অথবা সূর্য এবং দিনের শপথ। (*আহসানুল বয়ান*, ১০৮৭) ।

﴿مَنْ زَكَّاهَا﴾ "যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে", এর দুইটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়:

(ক) তাকওয়া অবলম্ভনের মাধ্যমে যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। এ অর্থে সূরা আ'লার ১৪ এবং ১৫ নাম্বার আয়াতে বর্ণনা এসেছে।

(খ) আল্লাহ যার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে দেন। (*তাফসীর ইবনু কাসীর*, ৮/৪১২) । দুইটি ব্যাখ্যাকে সমন্বয় করলে অর্থ দাড়ায়: "তাকওয়া অবলম্বনের কারণে যার আত্মাকে আল্লাহ পরিশুদ্ধ করেন, সে আখিরাতে সফল হবে"।

﴿مَنْ دَسَّاهَا﴾ "যে তার আত্মাকে কদর্য করে", এর দুইটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়:

(ক) আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার মাধ্যমে যে তার আত্মাকে কদর্য করে।

(খ) আল্লাহ যার আত্মাকে কদর্য করে দেন। (*তাফসীর ইবনু কাসীর*, ৮/৪১২) । দুইটি ব্যাখ্যাকে সমন্বয় করলে অর্থ দাড়ায়: "অবাধ্যতার কারণে যার আত্মাকে আল্লাহ কদর্য করেন, সে আখিরাতে ব্যর্থ হবে"।

সূরা শাম্‌স এর সাথে পরের সূরার সম্পর্ক:

ইমাম সুয়ূতী (র.) বলেন: সূরা শাম্‌স সফলতা ও ব্যর্থতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছে আর সূরা লাইল তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে। (*আসরারু তারতীব আল-কোরআন*, ১৬০) ।
আবু হাইয়্যান আল-আন্দালুসী (র.) বলেন: অত্র সূরা তথা সূরা শাম্‌স এ আখিরাতে সফলতা অর্জন ও ব্যর্থ হওয়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। আর পরের সূরা তথা সূরা লাইল এ সফলতা অর্জনের কিছু গুণ এবং ব্যর্থ হওয়ার কিছু কারণ উল্লেখ করেছেন। (*আল-বাহ্‌র আল-মুহীত*, ৮/৩৬২) ।

সূরা শাম্‌স এর সাথে পূর্বের সূরার সম্পর্ক:

ইমাম সুয়ূতী (র.) বলেন: অত্র সূরা তথা সূরা শাম্‌স এবং তার পূর্ববর্তী সূরা তথা সূরা আল-বালাদ এর মধ্যকার সম্পর্ক খুবই স্পষ্ট। আল্লাহ তায়ালা সূরা আল-বালাদ এ ডানপন্থী এবং বামপন্থী মানুষ সম্পর্কে বর্ণনার পর সূরা শাম্‌স এ তার সারমর্ম উল্লেখপূর্বক বলেন: যারা তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে তারা ডানপন্থী এবং যারা তাদের আত্মাকে কদর্য করে তারা বামপন্থী। (*আসরার তারতীব আল-কোরআন*, সুয়ূতী, ১৫১) ।

সূরার শিক্ষা:

১। এ সূরাতে তিনটি অংশ রয়েছে:
(ক) প্রথমাংশ তথা এক থেকে আট নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বৃহৎ আটটি বস্তু যেমন: সূর্য, চন্দ্র, দিন, রাত, আকাশ, যমীন, আত্মা এবং তাঁর নিজ সত্বার শপথ করেছেন।
(খ) দ্বিতীয়াংশ তথা নয় এবং দশ নাম্বার আয়াতে যে বিষয়ে কথা বলার জন্য আল্লাহ তায়ালা কসম করেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন, আর তা হলো: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণের মাধ্যমে যারা নিজেদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে তারা আখিরাতে সফল হবে, অপরদিকে যারা শয়াতানের পদচারণা অনুসরণ করে আত্মাকে কদর্য করে তারা আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
(গ) তৃতীয়াংশ তথা শেষের পাঁচ আয়াতে ক্ষতিগ্রস্তদের উদাহরণ স্বরূপ সামূদ জাতির পরিণাম বর্ণনা করেছেন। (*তাফসীর মওজূয়ী*, মোস্তফা মুসলিম, ১০/১৪৯) ।
২। ইমাম আবু বকর আল-জাজ্বায়িরী (র.) অত্র সূরার কয়েকটি শিক্ষা বর্ণনা করেছেন:
(ক) বৃহৎ কয়েকটি বস্তুর কসম করার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কুদরাতের বর্ণনা করেছেন।
(খ) ইবাদত-বন্দেগী এবং নেকআমল করার মাধ্যমে আত্মাকে পরিশুদ্ধ রাখাই জান্নাত অর্জনের একমাত্র পথ, কেউ আত্মা পরিশুদ্ধ রাখতে ব্যর্থ হলে সে জাহান্নামী হবে।
(গ) নেকআমলের প্রতি উৎসাহিত এবং শিরক ও বদআমল থেকে সতর্ক করা হয়েছে।
(ঘ) সামূদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে শান্তনা প্রদান করেছেন যে তারা তাদের নবী সালিহ (আ.) কে অমান্য করে ধ্বংস হয়েছে কোরাইশ গোত্রও যদি তোমার অবাধ্যতা থেকে ফিরে না আসে তাহলে তাদের জন্যও ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে। (*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ৫/৫৭৭-৫৭৯) । এভাবে আল্লাহ তায়ালা কোরআন মাজীদে পূর্ববতী অত্যাচারী জাতির ধংসের ইতিহাস বর্ণনার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং ঈমানদারদেকে শান্তনার পাশাপাশি ধৈর্যের শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

৩। সামুদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের কাহিনী:
সামুদ জাতি দীর্ঘদিন ধরে মূর্তি পুজায় লিপ্ত ছিল। তাদেরকে একত্ববাদ ও এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবান করার জন্য সালিহ (আ.) কে নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়। খুবই নগন্য সংখ্যা ছাড়া তাদের কেউই তার ডাকে সাড়া দিলো না। অবশেষে তারা সালিহ (আ.) কে শর্ত দিলো যে, যদি তিনি পাথর থেকে তাদের দেওয়া কিছু গুণের উষ্ট্রী বের করে নিয়ে আসতে পারেন, তাহলে তারা ঈমান এনে তাকে অনুসরণ করবে।
নবী সালিহ (আ.) আল্লাহর কাছে দোয়া করলে তিঁনি জানিয়ে দিলেন যে, অমুক পাথর থেকে অমুক দিনে তাদের চোখের সামনে একটি উষ্ট্রী বেড়িয়ে আসবে। নির্দিষ্ট দিনে সেই পাথর থেকে একটি মোটাতাজা সুদর্শনীয় উট বেড়িয়ে আসলো। এ মুজিজা দেখে অনেকে ঈমান গ্রহণ করলো আর তাদের বেশীরভাগই তাকে অস্বীকার করলো। সালিহ (আ.) তাদেরকে জানিয়ে দিলেন তোমরা এ উটকে স্বাধীনভাবে খেতে ও পান করতে দিবে এবং তাকে যবেহ করতে পারবে না, অন্যথায় তোমাদেরকে আল্লাহর গযব গ্রাস করবে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা অবাধ্য হয়ে উটটিকে যবেহ করে ফেললো। ফলে আকাশ থেকে ভয়াবহ গর্জন এবং যমীন থেকে ভারি ভূমিকম্প এসে তাদেরকে সমুলে ধ্বংস করে দিলো। (*কাসাসুল আম্বিয়া*, ইবনু কাসীর, ১১২) ।
৪। অত্র সূরার নয় এবং দশ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে, যারা নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ রাখবে তারা আখিরাতে সফল হবে এবং যারা তা কদর্য করবে তারা ব্যর্থ হবে। এখন প্রশ্ন হলো কে আত্মাকে পরিশুদ্ধ রাখে আল্লাহ তায়ালা নাকি মানুষ নিজেই?
এ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের পূর্বে একটি ছোট ভূমিকা দরকার, তা হলো: দার্শনিকগণ মনে করেন, মানুষ যখন জন্ম নেয় তখন তাদের অন্তর আয়না এর মত পরিষ্কার থাকে এবং বালেগ হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থায় থাকে। প্রাপ্তবয়স্কে উপণিত হওয়ার পর গুনাহের কাজ করলে প্রতিটি গুনাহের জন্য অন্তরের উপর একটি কালো দাগ পরে যায়। ফলে গুণাহের পরিমাণ বেশী হলে অন্তর কলুষিত হয়ে কদর্য হয়ে যায়। অপরদিকে ভালো কাজ করলে অন্তর পরিষ্কার থাকে। দুএকটি গুনাহ হয়ে গেলে দুএকটি কালো দাগ পরে যায় এবং পরবর্তীতে সৎআমল করলে কালো দাগ দুর হয়ে যায়। এখন মূল উত্তরে ফিরে যাওয়া যাক, মূলত একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই মানুষের সৎআমল, যিকর-অযকার, তাওবা-ইস্তেগফার ইত্যাদির আলোকে তাদের অন্তরকে পরিষ্কার রাখেন এবং কদর্য হয়ে গেলে তা পরিচ্ছন্ন করে দেন, যা দুনিয়ার কোন মানুষ করতে পারে না। কারণ তিঁনি হলেন অন্তর্যামী, তিনি অন্তরের ভেদ সম্পর্কে জানেন। যেমনটা অত্র সূরার নয় নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে। এছাড়াও এ ব্যাপারে কোরআনের অন্য আয়াতে এসেছে:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ [سورة النساء: ٤٩].

অর্থাৎ: "হে নবী! তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করে? বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে পবিত্র করেন। আর তাদেরকে সূতা পরিমাণও যুলম করা হয় না"। (সূরা নিসা, ৪৯) । অন্য একটি আয়াতে দেখতে পাই, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [سورة النجم: ٣٢].

অর্থাৎ: “যারা ছোটখাটো দোষ-ত্রুটি ছাড়া বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে, নিশ্চয় তোমার রব ক্ষমার ব্যাপারে উদার; তিনি তখন থেকেই তোমাদের ব্যাপারে ভালোভাবে জানেন যখন তিনি তোমাদেরকে এ পৃাথিবী থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা ছিলে মাতৃগর্ভে। সুতরাং তোমরা নিজেদেরকে পূতপবিত্র মনে কর না, তিনিই তোমাদের তাকওয়ার ব্যাপারে ভালো জানেন” (*সূরা নাজম*, ৩২)। একটি হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর কাছে অন্তর পবিত্র রাখার জন্য দোয়া করতেন:

(اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا) [صحيح مسلم: ٢٧٢٢].

অর্থাৎ: “হে আল্লাহ! আমার অন্তরে তাকওয়া ঢেলে দাও এবং তাকে পরিশুদ্ধ করে দাও, আপনিই উত্তম পরিশুদ্ধকারী, আপনিই তার মালিক” (*সহীহ মুসলিম*, ২৭২২) ।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের আলোকে বলা যায় একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে পারেন। মানুষের প্রসংশা এবং কোন শায়খ বা পীর ফায়েজ-তাওজ্জুহ প্রদানের মাধ্যমে কারো আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে পারেন না। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

৫। একটি প্রশ্ন হতে পারে মানুষ কি কাজ করলে আল্লাহ তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেন?

কোরআন-সুন্নাহের আলোকে বুঝা যায়, মানুষ নিম্নের কাজগুলো ইখলাসের সাথে পালন করলে আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দিবেন:

(ক) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক আদিষ্ট বিষয়গুলো পালন করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বর্জন করা। সূরা বাক্বারা এর ১২৯ নাম্বার আয়াত, সূরা আলে ইমরান এর ১৬৪ নাম্বার আয়াত এবং সূরা জুমুয়াহ এর ২ নাম্বার আয়াতে ‘রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে সৎপথের আদেশ দিবেন এবং অসৎ পথ থেকে নিষেধ করবেন। (*তাফসীরে ইবনু কাসীর*, ২/১৫৮) ।

(খ) বেশী বেশী আল্লাহর যিকর। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু আমর থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةً، أو صقالة، وَإِنَّ سِقَالَةَ، أو صقالة الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللهِ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ) [صحيح الترغيب والترهيب للألباني: ١٤٩٥، شعب الإيمان للبيهقي: ٥١٩].

অর্থাৎ: “প্রত্যেক জিনিস পরিষ্কার করার যন্ত্র আছে, আর অন্তর ছাফ করার যন্ত্র হলো: আল্লাহর যিক্র। আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে আল্লাহর যিক্র এর চেয়ে অধিক কার্যকারী আর কোন জিনিস নেই” (*সহীহ আল-তারগীব*, আলবানী, ১৪৯৫/ *শুয়াবুল ঈমান*, আল-বায়হাক্বী, ৫১৯) । অত্র হাদীসকে ইমাম আলবানী (রহ.) ‘সহীহ লিগাইরিহি’ বলেছেন।

এছাড়াও আরো কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলোকে ওলামায়ে কিরাম অন্তর পরিশুদ্ধ করার মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন:

(ক) জুহদ বা আখেরাতের পথে বাধা হয় এমন বিষয়কে এড়িয়ে চলা।

(খ) শুদ্ধ বা দলীলভিত্তিক জ্ঞান ও আমল।
(গ) দিনের বিশেষ কোন সময়ে দুনিয়ার সকল কিছু থেকে আলাদা হয়ে আল্লাহর ধ্যানে থেকে আত্মসমালোচনা করা।
উল্লেখ্য যে, কোরআনের ভাষ্যানুযায়ী মানুষের অন্তর তিন প্রকার, যেমন: (ক) নাফ্‌স মোতমায়েন্না, যা সৎআমল ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করে না। এটা জান্নাতী আত্মা। (খ) নাফ্‌স লাউয়্যামাহ, যা সৎআমলের পাশাপাশি শয়তানে কুমন্ত্রনায় বদআমলে নিমজ্জিত হলেও আবার তাওবা করে নিজেকে শোধরিয়ে নেয়। এটা সম্ভাবনার জায়গায় হয়তো জান্নাতী না হয় জাহান্নামী। (গ) নাফ্‌স আম্মারাহ, যা বদআমল ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করে না। এটা জাহান্নামী আত্মা। এ বিষয় জানার মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে পরিমাফ করতে পারবো আমরা কোন ধরণের আত্মা বহণ করে আছি। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

সূরার আমল:
(ক) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক আদিষ্ট বিষয় পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয় বর্জন করার মাধ্যমে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ রাখা।
(খ) সালাতে বড় সূরা পড়ার সুযোগ না থাকলে আ’লা, শাম্‌স এবং লাইল তেলাওয়াত করা।

(سورة اللَّيْل)

সূরা লাইল এর পরিচয়:

সূরার নাম:

- বেশীরভাগ মুসহাফ এবং কিছু কিছু তাফসীরগ্রন্থে অত্র সূরাকে "সূরাতু আল-লাইল" (ওয়াও উল্লেখ ছাড়া) নামে নামকরণ করা হয়েছে।
- অধিকাংশ তাফসীরগ্রন্থে "সূরাতু ওয়াল-লাইল" (ওয়াও সহ) নামে নামকরণ করা হয়েছে।
- ইমাম বুখারী তার সহীহ গ্রন্থে এবং ইমাম তিরমিযী তার সুনানে অত্র সূরার আলোচনার শিরনাম করেছেন "সূরাতু ওয়াল লাইলি ইজা ইয়াগশা" নামে। এছাড়াও ইবনু হিব্বান তার সহীহ গ্রন্থে এবং হাকীম আবু আব্দিল্লাহ তার 'মুস্তাদরাক আলা সহীহাইন' এ অত্র নাম উল্লেখ করেছেন। এখানে নামের তিনটি রুপ দেখা গেলেও মূলত নাম একটি। (*তাফসীর আল-মাওজুয়ী*, ১০/১৬৫)।

আলোচ্যবিষয়: মানুষ যে প্রকৃতিতে তৈরি হয়েছে তা তার জন্য সহজ করা হয়েছে।

সূরার ফযিলত: সালাতে সূরা আ'লা, শাম্‌স এবং লাইল তেলাওয়াতকে বড় সূরা তেলাওয়াতের স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যেমন: সহীহ বুখারীতে জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে:

قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ، فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي، فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ البَقَرَةِ، أَوِ النِّسَاءِ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ، أَوْ أَفَاتِنٌ؟ ثَلاَثَ مِرَارٍ، فَلَوْلاَ صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الحَاجَةِ. [صحيح البخاري: ٧٠٥].

অর্থাৎ: তিনি বলেন: জনৈক সাহাবী দুইটি উটের পিঠে পানি নিয়ে আসছিলেন। রাতের অন্ধকার তখন ঘনীভূত হয়ে এসেছিল। এ সময় তিনি মু'আয (রা.) কে সালাত আদারত পান, তিনি তার উট দুইটি বসিয়ে মুয়ায (রা.) এর দিকে সালাত আদায় করতে এগিয়ে গেলেন। মু'আয (রা.) সূরা বাক্বারা বা সূরা আন-নিসা পড়তে শুরু করেন। এতে সাহাবী জামাত ছেড়ে চলে যান। পরে তিনি জানতে পারেন যে, মু'আয (রা.) এজন্য তার সমালোচনা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহর এর কাছে এসে মু'আয (রা.) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: হে মু'আয তুমি কি লোকদের ফিতনায় ফেলতে চাও? অথবা তিনি বলেছিলেন: তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী? তিনি একথা তিনবার বলেন। অতঃপর তিনি বলেন: তুমি সূরা আ'লা, শাম্‌স এবং লাইল দ্বারা সালাত আদায় করলে না কেন? কারন, তোমার পিছনে দুর্বল, বৃদ্ধ ও হাজতওয়ালা লোক সালাত আদায় করে থাকে। (*সহীহ আল-বুখারী*, ৭০৫)।

এছাড়াও, অত্র সূরাটি মুফাস্‌সালাত এর অন্তর্ভুক্ত, আর মুফাস্‌সালাত সূরাগুলোকে কোরআনের অন্তর বলা হয়। যেমন: ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন,

(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].

অর্থাৎ: “প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, আর কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্সাল সূরাগুলো”। (*সুনানে দারিমী*, ৩৪২০) ।

আরো একটি হাদীসে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে মুফাস্সালাত সূরাগুলো ইতিপূর্বে কোন নবী-রাসূলকে প্রদান করা হয়নি। যেমন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةِ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].

অর্থাৎ: “আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিষিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিষিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি”। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪) ।

হাদীসে মুফাস্সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ৯২তম সূরা।

অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ৮ম সূরা, যা ‘সূরা আ’লা’ এর পরে এবং ‘সূরা আল-ফযর’ এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

অবতীর্ণের স্থান: অধিকাংশ ওলামার মতে, অত্র সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, সূরা মাক্কিয়্যাহ। (*বিতাকাত আল-তারীফ*, ৩১৬) ।

আয়াত সংখ্যা: ২১টি।

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: এ সূরাটি অবতীর্ণের দুইটি প্রেক্ষাপট পাওয়া যায়, যা সূরার ব্যাখ্যায় আসবে, ইনশাআল্লাহ।

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (١) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (٢) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (٣) إِنَّ سَعْيَكُمْ
لَشَتَّى (٤) فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧) وَأَمَّا مَنْ
بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (١٠) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا
تَرَدَّى (١١)﴾ [سورة الليل: ١-١١].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়: মানুষের প্রচেষ্টার ভিন্নতা।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১	শপথ রাতের,	যখন	তা ঢেকে দেয়।	২	শপথ দিনের,	যখন	তা আলোকিত হয়।
	وَاللَّيْلِ	إِذَا	يَغْشَى		وَالنَّهَارِ	إِذَا	تَجَلَّى

৩	শপথ তাঁর, যিনি	সৃষ্টি করেছেন	নর	ও নারী।	৪	নিশ্চয়	তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা
	وَمَا	خَلَقَ	الذَّكَرَ	وَالْأُنْثَى		إِنَّ	سَعْيَكُمْ

বিভিন্ন প্রকারের।	৫	সুতরাং	যে	দান করেছে	এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করেছে।	৬
لَشَتَّى		فَأَمَّا	مَنْ	أَعْطَى	وَاتَّقَى	

আর সত্যকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।	৭	আমি তার জন্য সুগম করে দেব	সহজ পথ।
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى		فَسَنُيَسِّرُهُ	لِلْيُسْرَى

৮	পক্ষান্তরে, যে	কার্পণ্য করেছে	এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করেছে।	৯	আর
	وَأَمَّا مَنْ	بَخِلَ	وَاسْتَغْنَى		وَ

সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।	১০	আমি তার জন্য সুগম করে দেব	কঠিন পথ।	১১
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى		فَسَنُيَسِّرُهُ	لِلْعُسْرَى	

তার কোন উপকারে আসবে না	তার সম্পদ,	যখন	সে ধ্বংস হবে।	
وَمَا يُغْنِي عَنْهُ	مَالُهُ	إِذَا	تَرَدَّى	

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

১-৪। আল্লাহ তায়ালা অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত, আলোকিত দিন এবং তাঁর নিজস্ব সত্ত্বার শপথ করে বলেন, নিশ্চয় মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্নরকম। কেউ কাজ করে দুনিয়ার জন্য আবার কেউ আখেরাতের জন্য।

৫-৭। সুতরাং যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাক্বওয়া ভিত্তিক জীবন পরিচালনা করে এবং ঈমানী চেতনাকে যথার্থভাবে লালন করে, তাদের জন্য তিনি জান্নাতের পথকে সহজ করে দিবেন। (*আল-মোন্তাখাব*, ৯১৪, *আল-মোয়াস্‌সার*, ১/৫৯৬) ।

৮–১০। অপরদিকে যারা আল্লাহর হক আদায় করতে সম্পদ ব্যয়ে কার্পণ্য করে, সম্পদ থাকার কারণে নিজেকে আল্লাহর প্রতি অমুখাপেক্ষী মনে করে এবং ঈমান গ্রহণে অস্বীকার করে, তাদের জন্য তিনি জাহান্নামের পথকে সহজ করে দিবেন।
১১। সে যখন কবরে অথবা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন কার্পণ্য করে যে সম্পদ জমিয়েছিল তা তাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। (*আল-মোন্তাখাব*, ৯১৪, *আল-মোয়াস্‌সার*, ১/৫৯৬) ।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿بِالْحُسْنَىٰ﴾ ‘সর্বোত্তম’, আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ইসলাম বা ঈমান। আবার কেউ কেউ বলেছেন: তাওহীদের বাক্য “লইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’।

﴿لِلْيُسْرَىٰ﴾ ‘সহজের জন্য’, আয়াতাংশে ‘সহজ’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: জান্নাতের পথ।

﴿لِلْعُسْرَىٰ﴾ ‘কঠিনের জন্য’, আয়াতাংশে ‘কঠিন’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: জাহান্নামের পথ।

(*তাফসীর গরীব আল-কোরআন*, ৯২/৬-১০) ।

সূরা লাইল এর সাথে সূরা শাম্‌স এর সম্পর্ক:

আবু হাইয়্যান আল-আন্দালুসী (র.) বলেন: পূর্বের সূরা তথা সূরা শাম্‌স এ আখিরাতে সফলতা অর্জন ও ব্যর্থ হওয়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। আর অত্র সূরা তথা সূরা লাইল এ সফলতা অর্জনের কিছু গুণ এবং ব্যর্থ হওয়ার কিছু কারণ উল্লেখ করেছেন। (*আল-বাহ্‌র আল-মুহীত*, ৮/৩৬২) ।
ইমাম সুয়ূতী (র.) বলেন: সূরা শাম্‌স সফলতা ও ব্যর্থতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছে আর সূরা লাইল তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে। (*আসরারু তারতীব আল-কোরআন*, ১৬০) ।

সূরা লাইল এর সাথে সূরা দুহা এর সম্পর্ক:

দুই দিক থেকে সূরা লাইল এর সাথে সূরা দুহা এর সম্পর্ক রয়েছে:
(ক) সূরা লাইল এর ১৩ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে: “দুনিয়া আখেরাতের নিরংকুশ মালিকানা আমারই হাতে” এবং সূরা দুহা এর ৪ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে: “অবশ্যই আখেরাত তোমার জন্য দুনিয়ার চেয়ে উত্তম”।
(খ) সূরা লাইল এর ২১ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে: “আর অচিরেই আল্লাহ তাদের উপর খুশী হয়ে যাবেন এবং সূরা দুহা এর ৫ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে: “অচিরেই তোমার রব তোমাকে এমন কিছু দান করবেন, যা পেয়ে তুমি খুশী হয়ে যাবে”। (*আসরারু তারতীব আল-কোরআন*, ১৬০) ।

অত্র আয়াতাবলী সংশ্লিষ্ট ঘটনা এবং অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: এক ব্যক্তির একটি খেজুরগাছ ছিল, যার ডালপালা অন্য এক দরিদ্র ব্যক্তির বাড়িকে ঘিরে রেখেছিল। খেজুরগাছের মালিক যখন খেজুর কাটার জন্য গাছে উঠতো। তখন কিছু খেজুর গাছের নিচে পতিত হলে বাড়িওয়ালার ছেলেমেয়েরা খেজুর কুড়িয়ে নিলে সে গাছ থেকে নেমে তাদের হাত থেকে খেজুরগুলো নিয়ে নিত। এমনকি তারা খাওয়ার জন্য খেজুর মুখে নিলে তাদের মুখ থেকে খেজুর বের করে নিত। অতঃপর তাদের

পিতা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে অভিযোগ নিয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বললো: তুমি যাও বিষয়টি আমি দেখছি। রাসূলুল্লাহ (সা.) গাছের মালিকের সাথে সাক্ষাত করে বললো: তোমার গাছটিকে জান্নাতের একটি গাছের বিনিময়ে আমাকে দিয়ে দাও। তখন ব্যক্তিটি উত্তরে বললো: অবশ্যই দিবো, তবে এ গাছটি নয় হে আল্লাহর রাসূল, আমার আরো অনেক খেজুর গাছ আছে, যার ফলনের আধিক্যতা আমাকে মুগ্ধ করে এবং তা এ গাছটির চেয়ে অনেক উত্তম, সে গাছগুলো আপনাকে দিব।

অতঃপর খেজুরগাছের মালিক বের হয়ে এক ব্যক্তির সাক্ষাত পেল, যে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং খেজুর গাছের মালিকের কথা শুনতেছিল। সে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে বললো: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আমাকে এমন জিনিস দিবেন যা ঐ ব্যক্তিটিকে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তর দিলেন: হ্যা। অতঃপর ব্যক্তিটি বের হলে খেজুর গাছের মালিকের সাথে সাক্ষাত হলো। অতঃপর তাকে খেজুর গাছের মালিক বললো: তুমি উপলব্দি করতে পেরেছো যে রাসূলুল্লাহ (সা.) অমুক ব্যক্তির বাড়ির উপর আমার খেজুর গাছটির বিনিময়ে আমাকে জান্নাতে একটি খেজুর গাছ দেওয়ার প্রস্তাব দিলে আমি তাকে বললাম: অবশ্যই দিবো, তবে এ গাছটি নয়, আমার আরো অনেক খেজুর গাছ আছে, যার ফলনের আধিক্যতা আমাকে মুগ্ধ করে এবং তা এ গাছটির চেয়ে অনেক উত্তম, সে গাছগুলো আপনাকে দিব। অতঃপর অপর ব্যক্তি তাকে বললো: তুমি কি খেজুর গাছটি বিক্রী করবে? সে উত্তরে বললো: না, তবে তার বদলা আমার পছন্দের কিছু দিতে হবে। অতঃপর সে বললো: তথায় কয়টি গাছ আছে? উত্তরে গাছের মালিক বললো: চল্লিশটি গাছ আছে। সে বললো: মহৎ কাজ করেছো। গাছের মালিক চুপ থেকে তাকে বললো: আমি তোমাকে চল্লিশটি খেজুর গাছ দিবো। অতএব তুমি কয়েকজন সাক্ষী ডাকো, অতঃপর তার কাওমকে সাক্ষী রাখলো।

অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে গিয়ে বললো: হে আল্লাহর রাসূল! আমার মালিকানায় থাকা সেই গাছটি আপনাকে হাদিয়া দিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বাড়ির মালিকের কাছে গিয়ে বললো: এ খেজুর গাছটি তোমার এবং তোমার পরিবারের। আত্র ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা সূরা লাইল অবতীর্ণ করেন। [ইবনু কাছীর (র.) হাদীসটিকে গরীব বলেছেন]।

(*লুবাব আল-নুকূল*, ৩৬০) ।

(৫-২১) নাম্বার আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) বলেন: আবু কুহাফা তার ছেলে আবু বকর (রা.) কে বললেন: আমি তোমাকে দেখছি দুর্বল দাসগুলো আযাদ করে দিচ্ছো। হে বৎস! তুমি যদি শক্তিশালী দাস আযাদ করতে তাহলে তা তোমার নানাবিধ উপকারে আসতো। অতঃপর আবু বকর বললেন: হে আমার পিতা! আমি আল্লাহর কাছে যা আছে তা চাই। তখন অত্র সূরার ৫ নাম্বার আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ করা হয়। (*লুবাব আল-নুকূল*, ৩৬০) ।

সূরায় কসমের ব্যাখ্যা:

মানুষের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা জায়েজ নেই। আর আল্লাহ তায়ালা সাধারণত যে বিষয়ে কথা বলতে চান তার সাথে সম্পর্কিত কোন বস্তুর কসম করেন। অত্র

সূরায় আল্লাহ তায়ালা অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত, আলোকিত দিন এবং তাঁর নিজ সত্ত্বার কসম করে মানুষের বিভিন্নমুখী কর্মপ্রচেষ্টার বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে কসম হলো: দিন, রাত এবং স্বয়ং আল্লাহ আর জাওয়াবে কসম হলো: মানুষের বিভিন্নমুখী কর্মপ্রচেষ্টার বর্ণনা। এ কথা দিবলোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, মানুষের সকল কর্মপ্রচেষ্টা আল্লাহ প্রদত্ব শক্তিকে ব্যবহার করে দিনে-রাতে সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং কসম ও জাওয়াবে কসমের মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। (৪-১১) নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষের কাজকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন:
(ক) আখেরাতের উদ্দেশ্যে কাজ করা, যা তার সাথীকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। যেমন: ঈমান, তাক্বওয়া, দান-সদকা ইত্যাদি।
(খ) আখেরাতকে বাদ দিয়ে শুধুই দুনিয়ার উদ্দেশ্যে কাজ করা, যা তার সাথীকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। যেমন: কুফরী, কৃপণতা ইত্যাদি। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/২৭২) ।
২। উল্লেখিত আয়াত থেকে বুঝা যায় তিনটি কাজ জান্নাতের পথকে সহজ করে দেয়:
(ক) আল্লাহর পথে ব্যয় করা।
(খ) তাক্বওয়া ভিত্তিক জীবন পরিচালনা করা।
(গ) ঈমানী চেতনাকে যথার্থভাবে লালন করা।
এবং তিনটি কাজ জাহান্নামের পথকে সহজ করে দেয়:
(ক) আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কার্পণ্য করা।
(খ) দুনিয়ার ক্ষনিকের সফলতাকে চুড়ান্ত সফলতা মনে করা।
(গ) ঈমানী চেতনাকে অস্বীকার করে মানুষের বানানো চেতনাকে গ্রহণ করা।
৩। আবু বকর আল-জাজ্বায়িরী (র.) বলেন: অত্র আয়াতগুলোতে 'মানুষ যে প্রকৃতিতে তৈরি হয়েছে তা তার জন্য সহজ করা হয়েছে' এর বর্ণনা রয়েছে। যে ব্যক্তি ভালো কাজের প্রকৃতিতে তৈরি হয়েছে তার কাছে ভালো কাজকে প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে এবং যে খারাপ কাজের প্রকৃতিতে তৈরি হয়েছে তার কাছে খারাপ কাজকে প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যারা ভালো কাজ করবে তারা সুভাগ্যবান আর যারা খারাপ কাজ করবে তারা দুর্ভাগা। (আইসার, ৫/৫৮২)। এ ব্যাপারে সহীহ আল-বুখারীর ৩২০৮ নাম্বারে লম্বা একটি হাদীস রয়েছে।
৪। এগার নাম্বার আয়াত থেকে বুঝা যায়, যারা দুনিয়ার প্রতি বিভোর হয়ে ক্ষনিকের সুযোগ-সুবিধা ও সফলতা লাভ করেছে, এটা তাদেরকে আখেরাতে মুক্তি দিতে পারবে না।

আয়াতাবলীর আমল:

১। আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করা।
২। তাক্বওয়া ভিত্তিক জীবন পরিচালনা করা।
৩। ঈমানী চেতনাকে যথার্থভাবে লালন করে।

﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (١٢) وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى (١٣) فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (١٤) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (١٥) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٦) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (١٧) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (١٨) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (١٩) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (٢٠) وَلَسَوْفَ يَرْضَى (٢١)﴾ [سورة الليل: ١٢-٢١].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়:
অজুহাতের দরজা বন্ধ রেখে খারাপ কাজ থেকে সতর্কীকরণ।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১২	নিশ্চয়	হেদায়েত দেওয়া আমারই দায়িত্ব।	১৩	আর আমারই কর্তৃত্বে	পরকাল		
	إِنَّ	عَلَيْنَا لَلْهُدَى		وَإِنَّ لَنَا	لَلْآخِرَةَ		
ও ইহকাল।	১৪	অতএব আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি	লেলিহান আগুন সম্পর্কে।				
وَالْأُولَى		فَأَنْذَرْتُكُمْ	نَارًا تَلَظَّى				
১৫	তাতে প্রবেশ করবে	কেবল	হতভাগা।	১৬	যে	(নবীকে) অস্বীকার করেছে	
	لَا يَصْلَاهَا	إِلَّا	الْأَشْقَى		الَّذِي	كَذَّبَ	
এবং (ঈমান থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।	১৭	আর তা থেকে দুরে রাখা হবে	মোত্তাকীকে।				
وَتَوَلَّى		وَسَيُجَنَّبُهَا	الْأَتْقَى				
১৮	যে	তার সম্পদ দান করে	আত্মশুদ্ধির জন্য।	১৯	এমন নয় যে	কারো জন্য	তার কাছে
	الَّذِي	يُؤْتِي مَالَهُ	يَتَزَكَّى		وَمَا	لِأَحَدٍ	عِنْدَهُ
বিদ্যমান কোন অনুগ্রহের	প্রতিদান দেওয়ার জন্য।	২০	কেবল	সন্তুষ্ট লাভের প্রত্যাশায়			
مِنْ نِعْمَةٍ	تُجْزَى		إِلَّا	ابْتِغَاءَ وَجْهِ			
তার মহান রবের।	২১	এবং অচিরেই	সে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।				
رَبِّهِ الْأَعْلَى		وَلَسَوْفَ	يَرْضَى				

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:
(১২-১৩) নিশ্চয় তোমাদের প্রতি বিশেষ দয়ার কারণে আমিই তোমাদের জন্য সৎপথকে অসৎপথ থেকে আলাদা করে বর্ণনা করি এবং কেবল আমিই আখিরাত ও দুনিয়ার সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে থাকি।
(১৪) অতএব হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি।

১৫-১৬। জাহান্নামে কেবল ঐ সকল দুর্ভাগারা প্রবেশ করবে, যারা মোহাম্মাদ (সা.) কে অস্বীকার করে এবং তার অনুসরণ থেকে বিরত থাকে। (*তাফসীর আল-মোয়াস্‌সার*, ১/৫৯৬) ।
(১৭-২১) এবং জাহান্নাম থেকে কেবল মোত্তাক্বীরাই মুক্তি পাবে, যারা অন্যকে হাদিয়ার বিনিময়ে হাদিয়া, অথবা দানের জবাবে দান করার জন্য নয়, বরং আত্মশুদ্ধির জন্য একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় দান-সদকা করে। ফলে আল্লাহও তাকে এমন প্রতিদান দিবেন, যা পেয়ে সে খুশী হয়ে যাবে। (*আল-মোয়াস্‌সার*, ১/৫৯৬) ।

আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুর রহমান ইবনু আবি হাতিম (র.) উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল এমন সাত জন দাসকে আবু বকর (রা.) ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা আবু বকর (রা.) কে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে অত্র সূরার ১৭ নাম্বার আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/২৭৪) ।
বেলাল (রা.) আব্দুল্লাহ ইবনু জুদআন নামক মুশরিকের দাস থাকা কালে ইসলাম গ্রহণ করার পর মুর্তির কাছে গিয়ে কয়েকটি মূর্তি ভেঙ্গে ফেললেন। অতঃপর মুশরিকরা তার মনিবের কাছে এ সংবাদ পৌঁছালে উত্তপ্ত মরুভূমিতে ফেলে তার উপর অত্যাচার চালায়। আর বেলাল (রা.) তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাওহীদের বাক্য উচ্চারণ করতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তার পাশ দিয়ে গমণকালে সুসংবাদ দিয়ে বলেছিলেন এ তাওহীদের বাক্য তোমাকে মুক্তি দিবে। অতঃপর তিনি আবু বকরকে (রা.) বললেন: বেলালের উপর নির্মমভাবে নিপীড়ন চালানো হচ্ছে। এ অবস্থায় আবু বকর (রা.) স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে তাকে ক্রয় করলে মুশরিকরা বলতে থাকে আবু বকর এ দাস দিয়ে কি করবে! তখন অত্র সূরার (১৯-২১) নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করা হয়। (*আসবাব আল-নুযূল*, আল-ওয়াহেদী, ৪৮০) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। হেদায়েত পাওয়ার এবং হেদায়েতের উপর থাকার জন্য চারটি স্তর রয়েছে:
(ক) হেদায়াতের পথকে ভ্রান্ত পথ থেকে আলাদা করে আল্লাহ কর্তৃক স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেওয়া। যা অত্র সূরার ১২ নাম্বার আয়াত থেকে বুঝা যায়।
(খ) হেদায়ায়েত গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষ পরিপূর্ণ স্বাধীন। যে ইচ্ছা তা গ্রহণ করে সৌভাগ্যবান হবে এবং যে ইচ্ছা তা বর্জন করে দুর্ভাগা হবে। যেমন একটি আয়াতে এসেছে:

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [سورة الكهف: ٢٩].

অর্থাৎ: "হে নবী! বলুন: আমি যে হেদায়েতের দিকে আহবান করছি, এটাই তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছা ঈমানদার হবে আর যে ইচ্ছা কাফির হবে" (সূরা আল-কাহ্‌ফ, ২৯) ।
(গ) মানুষের কর্মকান্ডের আলোকে আল্লাহ তায়ালা কাউকে হেদায়েত গ্রহণের তাওফীক দেন আবার কাউকে হেদায়েত থেকে বঞ্চিত রাখেন। যেমন কোরানের একটি আয়াতে এসেছে:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [سورة القصص: ٥٦].

অর্থাৎ: “নিশ্চয় তুমি কাউকে ভালোবেসে হেদায়েত দিতে পারবে না, তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে অবশ্যই হেদায়েত দান করেন, তিনি ভালো করেই জানেন কারা এ হেদায়েতের অনুসারী হবে” (সূরা কাছাছ, ৫৬) ।

(ঘ) যারা হেদায়েত পাবে তাদের উপর দায়িত্ব হলো: হেদায়েতচ্যুত না হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে তাওফীক কামনা করা। যেমন: প্রাপ্ত হেদায়েতের উপর অটল থাকার জন সালাতের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে তাওফীক কামনা করার নির্দেশ রয়েছে। সূরা আলে-ইমরানের ৮ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা একটি দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন, যেখানে বলা হয়েছে:

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [سورة آل عمران: ٨].

অর্থাৎ: “হে আমাদের রব! সঠিক পথের দিশা দেওয়ার পর তুমি আমাদের মনকে বাঁকা করে দিও না, তোমার কাছ থেকে আমাদের প্রতি দয়া করো, কারণ যাবতীয় দয়ার মালিক তো তুমিই” (সূরা আলে-ইমরান, ৮) । অধিকাংশ তাফসীরকারক মনে করেন, এই আয়াতটি যারা নিয়মিত তেলাওয়াত করবে, সে মৃত্যুর সময় সয়তানের ফেতনা থেকে সংরক্ষিত থাকবে।

এছাড়াও আমরা বিশুদ্ধ হাদীসে দেখতে পাই রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে হেদায়েতের উপর অটল থাকার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন এবং তার উম্মতকেও দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন: আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: (يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: (نَعَمْ، إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ)

[سنن الترمذي: ٢١٤٠، حديث صحيح].

অর্থাৎ: “রাসূলুল্লাহ (সা.) বেশী বেশী এ দোয়া করতেন যে, হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর অটল রাখো। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার প্রতি এবং আপনি যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনি কি আমাদের ব্যাপারে ভয় পাচ্ছেন? আল্লাহর নবী (সা.) উত্তর দিলেন: হ্যা, নিশ্চয় মানুষের অন্তর আল্লাহর আঙ্গুলসমূহের দুই আঙ্গুলের মাঝে, তিনি যেভাবে চান পরিবর্তন করে দেন” (*সুনান আল-তিরমিযী*: ২১৪০, ইমাম আলবানী (র.) হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন) ।

আমাদের সমাজের চিত্র হলো: অধিকাংশ মুসলিমের ভাবভঙ্গি এবং কথাবর্তায় মনে হয় তারা হেদায়েতকে ক্রয় করে নিয়ে এর মালিকানাকে টিকসই করে নিয়েছে। উল্লেখিত হাদীসটিতে তাদের জন্য সতর্কবার্তা রয়েছে। মূল কথা হলো, শয়তান তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একজন হেদায়েত প্রাপ্তকে গোমরা বানানোর জন্য সকল ধরণের পদক্ষেপ অব্যাহত রাখছে। এজন্য একজন মুসলিমের উচিৎ হেদায়েতের দোয়ার পাশাপাশি এর উপর অটল থাকার জন্য আল্লাহর তায়ালার কাছে দোয়া করা। একটি হাদীসে এসেছে, আলী (রা.) বলেন:

قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: قُلِ اللهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي﴾ [صحيح مسلم، ٢٧٢٥].

অর্থাৎ: "রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, বলো: হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়েত দাও এবং তার উপর অটল থাকার তাওফীক দাও" (*সহহী মুসলিম*, ২৭২৫)।

২। ১৩ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে কেবল আল্লাহ তায়ালাই দুনিয়া-আখেরাতের একক মালিক। তিনি যাকে ইচ্ছা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে কল্যান দান করেন, যাকে ইচ্ছা আখেরাত থেকে বঞ্চিত রেখে দুনিয়াতে কল্যান দেন, যাকে ইচ্ছা দুনিয়া থেকে বঞ্চিত রেখে আখেরাতে প্রভূত কল্যান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই কল্যান থেকে বঞ্চিত করেন। যেমন: কোরআনে এসেছে: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [سورة آل عمران، ٢٦]. অর্থাৎ: "হে নবী! তুমি বলো: হে রাঝাধিরাজ মহান আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে সম্রাজ্য দান করো, আবার যার কাছ থেকে চাও তা কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছ তুমি সম্মানিত করো, যাকে ইচ্ছা তুমি অপমানিত করো। সব রকমের কল্যান তো তোমার হাতেই নিবন্ধ। নিশ্চয় তুমি সবকিছুর উপর একক ক্ষমতাবান" (সূরা আলে-ইমরান, ২৬)।

অত্র আয়াতের আলোকে বলা যায় সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছায় হয়। এজন্য মানুষের উচিৎ সকল তাগুতকে বাদ দিয়ে কেবল তাঁর কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যান প্রত্যাশা করা। সুতরাং যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে রিয্ক চাইবে, অথবা শরিয়াত সিদ্ধ মাধ্যম ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চাইবে তারা বঞ্চিত হবে এবং আল্লাহর ক্রোধে পতিত হবে। যেমন: কোরআনে এসেছে: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [سورة البقرة: ١٨٦]. অর্থাৎ: "হে নবী! যখন আমার কোন বান্দা আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তাকে বলুন: নিশ্চয় আমি তার একান্ত কাছে আছি। আমি আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে। তাই তাদেরও উচিৎ আমার ডাকে সাড়া দিয়ে আমার উপর ঈমান আনা। আশা করা যায় তারা সঠিক পথের দিশা পাবে" (সূরা বাক্বারা, ১৮৬)।

৩। (১৫-১৭) নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে যে, হতভাগা কাফির, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণকে অস্বীকার করে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, অপরদিকে সৌভাগ্যবান মোত্তাকীগণ, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অনুসরণ করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ ব্যাপারে সহীহ আল-বুখারীর ৭২৮০ নাম্বারে একটি হাদীস রয়েছে।

৪। (১৮-২১) নাম্বার আয়াতের আলোকে মোত্তাকীর অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো: সে সম্পদ ব্যয় করে কেবল আল্লহর সন্তুষ্টি এবং আত্মশুদ্ধির জন্য। এমন নয় যে, কেউ তাকে কিছু দেয় তার বিনিময়ে প্রদান করে, অথবা ভবিষ্যাতে কিছু পাওয়ার জন্য দান-সদকা ও হাদিয়া-তোহফা করে (তাফসীর আল-মুনীর, ৩০/২৭৭)। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, আমাদের সমাজের চিত্র এর উল্টা, সকল স্তরের মানুষের মাঝে দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক বিরাজ করছে। এমনকি হাদিয়া দিয়ে অথবা নিয়ে ডাইরীতে নোট করে রাখে পরবতী সময় তা গ্রহণ অথবা প্রদান করার জন্য। এটা স্পষ্টতই এখলাসের পরিপন্থি। সুতরাং অত্র আয়াতে আমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

আয়াতাবলীর আমল:

(ক) দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যান একমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থণা করা।
(খ) একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আত্মশুদ্ধির জন্য দান-সদকা এবং হাদীয়া-তোহফা করা।
(গ) সালাতে বড় সূরা পড়ার সুযোগ না থাকলে আ'লা, শাম্স এবং লাইল তেলাওয়াত করা।

(سورة الضُّحى)

সূরা দুহা এর পরিচয়:

সূরার নাম: ইবনু আশুর (র.) বলেন: বেশীরভাগ মুসহাফ, অনেক তাফসীরগ্রন্থে এবং সুনানে তিরমিযীতে অত্র সূরাকে "সূরাতু আদ-দুহা" (ওয়াও উল্লেখ ছাড়া) নামে নামকরণ করা হয়েছে। কিছু কিছু তাফসীরগ্রন্থ এবং সহীহ আল-বুখারীতে "সূরাতু ওয়াদ-দুহা" (ওয়াও উল্লেখপূর্বক) নামে নামকরণ করা হয়েছে। সাহাবীদের থেকে এ সূরার নামের ব্যাপারে কোন সহীহ তথ্য পাওয়া যায় না। (*আল-তাহরীর ওয়া আল-তানভীর*, ৩০/৩৯৪)।
এছাড়া হাকীম আবু আব্দিল্লাহ এর লেখা 'মুস্তাদরাক আলা সহীহাইন' এতেও এ সূরার নাম "সূরা ওয়াল-দুহা" (ওয়াও উল্লেখপূর্বক) বর্ণনা করা হয়েছে।

আলোচ্যবিষয়: রাসূলুল্লাহর প্রতি আল্লাহর নেয়ামত এবং দিকনির্দেশনা।

সূরার ফযিলত: অত্র সূরাটি মুফাস্সালাত এর অন্তভূক্ত, আর মুফাস্সালাত সূরাগুলোকে কোরআনের অন্তর বলা হয়। যেমন: ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন,
(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].
অর্থাৎ: "প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, আর কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্সাল সূরাগুলো"।
(*সুনানে দারিমী*, ৩৪২০)।
আরো একটি হাদীসে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে মুফাস্সালাত সূরাগুলো ইতিপূর্বে কোন নবী-রাসূলকে প্রদান করা হয়নি। যেমন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةِ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].
অর্থাৎ: "আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিষিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিষিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি"। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪)।
হাদীসে মুফাস্সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।
মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ৯৩তম সূরা।
অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ১০ম সূরা, যা 'সূরা আল-ফাজর' এর পরে এবং 'সূরা আল-শারহ' এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।
অবতীর্ণের স্থান: অত্র সূরাটি মাক্কিয়্যাহ হওয়ার ব্যাপারে সকল মোফাসসের ঐকমত পোষণ করেছেন। (*বিতাকাত আল-তারীফ*, ৩১৯)।
আয়াত সংখ্যা: ১১টি।
অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: এ সূরাটি অবতীর্ণের দুইটি প্রেক্ষাপট পাওয়া যায়, যা সূরার ব্যাখ্যায় আসবে, ইনশাআল্লাহ।

﴿وَالضُّحَى (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٣) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ
الْأُولَى (٤) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (٥) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى (٦) وَوَجَدَكَ ضَالًّا
فَهَدَى (٧) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (٨) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (٩) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
(١٠) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (١١)﴾ [سورة الضحى].

সূরার আলোচ্য বিষয়: রাসূলুল্লাহর প্রতি আল্লাহর নেয়ামত এবং দিকনির্দেশনা।

সূরার সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১	শপথ পূর্বাহ্নের।	২	শপথ অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতের।	৩	তোমাকে পরিত্যাগ করেননি
	وَالضُّحَى		وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى		مَا وَدَّعَكَ

তোমার রব	এবং অসন্তুষ্টও হননি।	৪	নিশ্চয় আখিরাত	উত্তম	তোমার জন্য	দুনিয়ার চেয়ে।
رَبُّكَ	وَمَا قَلَى		وَلَلْآخِرَةُ	خَيْرٌ	لَكَ	مِنَ الْأُولَى

৫	আর অচিরেই	তোমাকে দান করবেন	তোমার রব,	ফলে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।
	وَلَسَوْفَ	يُعْطِيكَ	رَبُّكَ	فَتَرْضَى

৬	তিনি কি তোমাকে পাননি	ইয়াতিম অবস্থায়?	অতঃপর তিনি আশ্রয় প্রদান করেছেন।
	أَلَمْ يَجِدْكَ	يَتِيمًا	فَآوَى
৭	তিনি তোমাকে পেলেন	সৎপথের অনুসন্ধানী অবস্থায়,	অতঃপর পথ দেখালেন।
	وَوَجَدَكَ	ضَالًّا	فَهَدَى

৮	তিনি তোমাকে পেলেন	নিঃস্ব অবস্থায়,	অতঃপর অভাবমুক্ত করলেন।	৯	সুতরাং
	وَوَجَدَكَ	عَائِلًا	فَأَغْنَى		فَأَمَّا

ইয়াতিমের প্রতি	তুমি কঠোর হয়ো না।	১০	আর ভিক্ষুককে	তুমি ধমক দিও না।
الْيَتِيمَ	فَلَا تَقْهَرْ		وَأَمَّا السَّائِلَ	فَلَا تَنْهَرْ

১১	আর	তোমার রবের অনুগ্রহের কথা	বর্ণনা কর।	
	وَأَمَّا	بِنِعْمَةِ رَبِّكَ	فَحَدِّثْ	

সূরার ভাবার্থ:

১-৩। আল্লাহ তায়ালা দিনের এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতের শপথ করে বলেন, হে নবী! তোমার রব তোমাকে ছেড়ে যাননি এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে অহী পাঠাতে দেরী করেননি।

৪,৫। হে নবী! নিশ্চয় তোমার জন্য আখিরাত দুনিয়ার চেয়ে উত্তম। এবং খুব শীঘ্রই আখিরাতে তুমি তোমার রবের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরণের নেয়ামত পেয়ে খুশী হয়ে যাবে।
৬-৮। তুমিতো তোমার মায়ের গর্ভে থাকা কালে পিতা হারিয়ে ইয়াতীম হয়ে গিয়েছিলে। তোমার রব কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পেয়ে আশ্রয় দেননি? তুমি জানতে না কিতাব কি? এবং ঈমান সম্পর্কেও জানতে না তুমি। অতঃপর তিনি তোমাকে অজানা বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন এবং সৎআমল করার তাওফীক দিয়েছেন। এছাড়াও তিনি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পেয়ে রিজিক দান এবং তৃপ্তি ও ধৈর্য প্রদানের মাধ্যমে অভাবমুক্ত করেছেন।
৯-১১। হে নবী! এভাবে আমি তোমাকে অসংখ্য নিয়ামত দিয়েছি। সুতরাং তুমি ইয়াতিমকে কখনও ধিক্কার দিও না এবং ভিক্ষুককে কর্কশ ভাষায় ফিরিয়ে দিও না এবং নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ এবং আল্লাহ প্রদত্ব সকল নিয়মতের শুকরিয়া স্বরূপ নিয়ামতের কথা ব্যক্ত করে দাও। (*আল-মোন্তাখাব*, ৯১৪, *আল-মোয়াস্‌সার*, ১/৫৯৬) ।

সূরার অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿وَالضُّحَىٰ﴾ ‘শপথ পূর্বাহ্নের’, অত্র আয়াতে ‘পূর্বাহ্ন’ এর অর্থ হলো: দিনের প্রথমাংশ, যখন সূর্য পরিপূর্ণভাবে উদিত হয়ে কিছুক্ষণ অতিক্রান্ত হয়। যা প্রচলিত সময়ের হিসেবে সকাল ১০/১১ টা হয়। অত্র আয়াতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে দুইটি মত পাওয়া যায়:
(ক) একদল তাফসীরকারক বলেন: উল্লেখিত আভিধানিক অর্থকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।
(খ) দিনের বিশেষ সময়কে উল্লেখ করে ব্যাপকার্থে পুরো দিনকে বুঝানো হয়েছে; কারণ এর বিপরীতে পরের আয়াতে পুরো রাতের কসম করা হয়েছে।
তবে ইমাম তানতাভী (র.) প্রথম মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কারণ এ সময়টাতেই সূর্যের আলোর পরিপূর্ণতা পায় এবং মানুষের বিভিন্ন কাজে ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে দুনিয়া সচ্ছল হয়ে উঠে।
(*আল-তাফসীর আল-ওয়াসীত*, তানতাভী, ১৫/৪২৭) ।

﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ﴾ ‘অবশ্যই আপনার জন্য পরকাল ইহকালের চেয়ে উত্তম’, অত্র আয়াতের শাব্দিক অনুবাদ করলে অর্থ দাড়ায় ‘শেষাংশ প্রথমাংশের চেয়ে উত্তম’। ‘শেষাংশ’ এবং ‘প্রথমাংশ’ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে তাফসীরকারকদের দুইটি মত পাওয়া যায়:
(ক) ‘শেষাংশ’ দ্বারা আখিরাতের জীবন এবং ‘প্রথমাংশ’ দ্বারা দুনিয়ার জীবনকে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাড়ায় ‘অবশ্যই আপনার জন্য আখিরাত দুনিয়ার চেয়ে উত্তম’। (ইবনু কাসীর)।
(খ) ‘শেষাংশ’ দ্বারা তার শেষ জীবন এবং ‘প্রথমাংশ’ দ্বারা তার প্রথম জীবনকে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাড়ায় ‘অবশ্যই আপনার জীবনের প্রথমাংশের চেয়ে শেষাংশ উত্তম’। (*আলূসী*, ১৫/৩৭৭) ।
অত্র আয়াতে উল্লেখিত দুইটিই উদ্দেশ্য হতে পারে, যেহেতু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে তিনি শেষের জীবনে ইসলামী রাষ্ট্র রচনা এবং মক্কা বিজয় সহ বিভিন্ন নেয়ামত দ্বারা ভূষিত হয়েছেন এবং আখিরাতে তিনি অনেকগুলো নেয়ামতে ভূষিত হবেন, যা কোরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। তবে অধিকাংশ মোফাসসের প্রথম মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

﴿ضَالًّا﴾ 'পথভ্রষ্ট', অত্র আয়াতাংশে 'পথভ্রষ্ট' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সৎপথের অনুসন্ধানী; কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) জীবনে কখনও কবীরা গুনাহ, শীরক এবং কুফরে জড়িয়ে পথভ্রষ্ট হননি। বরং অহী লাভের পূর্বে পুরো জীবন তিনি নীরবে সৎপথ ও তাওহীদকে অনুসন্ধান করেছেন এবং অহী লাভের পর মৃত্যু পর্যন্ত তাওহীদের দাওয়াতে মশগুল ছিলেন। যেমন কোরআনে এসেছে:

﴿ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمانُ﴾ [سورة الشورى: ٥٢].

অর্থাৎ: "কিতাব কি এবং ঈমান কি? তা তুমি জানতে না" (সূরা শুরা, ৫২)।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/২৮২-২৮৩)।

সূরা দুহা এর সাথে পরের সূরার সম্পর্ক:

ইমাম সুয়ূতী (র.) বলেন: "সূরা দুহা এ তিনটি এবং সূরা আল-শারহ এ তিনটি, এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর মোট ছয়টি নেয়ামতের বিষয় অত্র দুই সূরায় আলোচনা হওয়ার কারণে উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। এ জন্য কতিপয় সালাফ বলেছেন: দুই সূরার মাঝে 'বাসমালাহ' না থাকলে উভয়কে একটি সূরা ধরা যেত" (*আসরারু তারতীব আল-কোরআন*, সুয়ূতী, ১/১৫২)। এছাড়াও একটি হাদীসে কুদসীতে উল্লেখিত ছয়টি নেয়ামতকে এক জায়গায় দেখতে পাই। সে হিসেবেও দুইটি সূরাকে একটি সূরা বলা যায়। হাদীসটি হলো:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ مَسْأَلَةً وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَأَلْتُهُ، قُلْتُ: أَيْ رَبِّ قَدْ كَانَتْ قَبْلِي أَنْبِيَاءُ، مِنْهُمْ مَنْ سَخَّرْتَ لَهُ الرِّيحَ، ثُمَّ ذَكَرَ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ -عليهما السلام-، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُحْيِي الْمَوْتَى، ثُمَّ ذَكَرَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ -عليه السلام-، وَمِنْهُمْ يَذْكُرُ مَا أُعْطَوْا، قَالَ: أَلَمْ أَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَيْتُ؟ قُلْتُ: بَلَى، أَيْ رَبِّ، قَالَ: أَلَمْ أَجِدْكَ ضَالًّا فَهَدَيْتُ؟ قُلْتُ: بَلَى، أَيْ رَبِّ، قَالَ: أَلَمْ أَجِدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَيْتُ؟ قُلْتُ: بَلَى، أَيْ رَبِّ، قَالَ: أَلَمْ أَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، وَوَضَعْتُ عَنْكَ وِزْرَكَ؟ قُلْتُ: بَلَى، أَيْ رَبِّ) [شرح مشكل الآثار: ٣٩٦٦].

অর্থাৎ: ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "আমি আল্লাহকে কয়েকটি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমি আসলে এ রকম প্রশ্ন করতে প্রস্তুত ছিলাম না। আমি বললাম: হে রব! আমার পূর্বের নবীদের কাউকে বাতাশের উপর প্রভাব খাটানোর ক্ষমতা দিয়েছিলেন, যেমন: সোলাইমান ইবনু দাউদ (আ.) এবং কাউকে মৃত্যুকে জীবিত করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন, যেমন: ঈসা ইবনু মারইয়াম। এভাবে আরো অনেক।

তখন আল্লাহ উত্তরে বললেন: আমি কি তোমাকে এতিম পেয়ে আশ্রয় দেইনি? আমি বললাম: অবশ্যই দিয়েছেন, হে আমার রব। তিঁনি বললেন: আমি তোমাকে সৎপথের সন্ধানী পেয়েছিলাম, অতঃপর তোমাকে সৎপথের সন্ধান দেই নি? আমি বললাম: অবশ্যই দিয়েছেন, হে আমার রব। আমি তোমাকে নিস্ব অবস্থায় পেয়েছিলাম, অতঃপর তোমাকে ধনী বানাই নি? আমি বললাম: অবশ্যই বানিয়েছেন, হে আমার রব। এবার তিঁনি বললেন: আমি কি তোমার বক্ষ বিদীর্ণ করে দেই নি এবং তোমার থেকে ভুলের বোঝাকে অপসরণ করে দেই নি? আমি বললাম: অবশ্যই দিয়েছেন, হে আমার রব" (*শরহে মুশকিল আল-আসার*, ৩৯৬৬)।

ইমাম বাক্বায়ী (র.) বলেন: সূরা আল-শারহ সূরা দুহা এর সর্বশেষ আয়াতের ব্যাখ্যা। (*নাযমুদ দরার*, ২২/১১৫)। সুতরাং সূরা আল-শারহ এবং সূরা দুহা এর মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট।

অত্র সূরাটি অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

যায়েদ ইবনু আরক্বাম (র.) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে কিছুদিন ধরে জিবরীল (আ.) অহী নিয়ে না আসলে আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মু জামীল বললো: আল্লাহ মোহাম্মদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে বর্জন করেছে। তখন আল্লাহ সূরা দুহা এর প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন। ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "আমার পরে আমার উম্মতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয় আমার কাছে পেশ করা হলে আমি তাতে আনন্দিত হলাম"। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অত্র সূরার চার এবং পাঁচ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করা হয়।

(*লুবাব আল-নুকূল*, সুয়ূতী, ৩৬১-৩৬২) ।

সূরায় কসমের ব্যাখ্যা:

অত্র সূরায় প্রথম এবং দ্বিতীয় আয়াত হলো: 'কসম' এবং তৃতীয় আয়াত হলো: 'জাওয়াবে কসম'। ইমাম ইবনু আতিয়্যাহ (রহ.) বলেন: এখানে 'কসম' এবং 'জাওয়াবে কসম' এর মধ্যে সম্পর্ক হলো: রাত-দিনের কসম করা হয়েছে, আর জাওয়াবে কসম এ বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর প্রতি অসন্তুষ্ট নয় এবং তাকে বর্জনও করেননি। অর্থাৎ: রাত এবং দিনের কসম তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দিন ও রাতের কোন এক অংশে এক মুহূর্তেও জন্য বর্জন করেননি। সুতরাং কসম ও জাওয়াবে কসমের মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট। (*আল-তিবইয়ান ফী আকসাম আল-কোরআন*, ইবনু কাইয়্যুম, ৪৭, *তাফসীর শানক্বীতি*, ৯/৫৪) ।

সূরার শিক্ষা:

১। ইমাম সুয়ূতী (র.) তার 'লুবাব আল-নুকূল' কিতাবে বর্ণনা করেছেন, একটি কুকুরছানা রাসূলুল্লাহর ঘরে ঢুকে তার খাটের নিছে মারা যায়। এ কারণে তার কাছে কিছুদিন ধরে জিবরীল (আ.) অহী নিয়ে না আসলে আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মু জামীল সহ কতিপয় মুশরিক বলতে শুরু করে মোহাম্মাদের খোদা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে পরিত্যাগ করেছে। তাদের এ ভ্রান্ত দাবীর জবাবে অত্র সূরার প্রথম তিন আয়াতে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন তিনি কখনও মোহাম্মদ (সা.) এর প্রতি অসন্তুষ্ট হননি এবং তাকে পরিত্যাগও করেননি। (*লুবাব আল-নুকূল*, ৩৬১-৩৬২) । এভাবে আমরা কোরআনে দেখতে পাই যখনি কেউ রাসূলুল্লাহ (সা.) কে কষ্ট দিয়েছে অথবা গালমন্দ করেছে, তখনি আল্লাহ তায়ালা সরাসরি আয়াত অবতীর্ণ করে তার জবাব দিয়েছেন এবং তাকে শান্তনা দিয়েছেন।

২। চার এবং পাঁচ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে শান্তনা দিয়েছেন যে, দুশমনরা যাই বলুক আপনি তাদের কথায় কান দিয়েন না। অচিরেই আপনার ভবিষ্যাত জীবন অতীত জীবনের চেয়ে উত্তম হবে। আল্লাহ তায়ালার এ ওয়াদামূলক শান্তনা বাণীর প্রতিফলণ হিসেবে দেখতে পাই মদীনায় ইসলামী রাস্ট্র রচনা করা, দশ বছরের ব্যবধানে মক্কা বিজয় ইত্যাদি সহ অনেক নেয়ামত এবং কিয়ামতে তাকে স্পেশাল কিছু সম্মান ও ক্ষমতা প্রদান সহ অনেক নেয়ামতের ঘোষণা দিয়েছেন, যা কোরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/২৮৫) ।

৩। ছয়, সাত এবং আট নাম্বার আয়াতে, আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে ইতিপুর্বে যে নেয়ামত প্রদান করেছিলেন তা থেকে তিনটি নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন:

(ক) ইয়াতিম অবস্থায় পেয়ে তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

(খ) হকের অনুসন্ধানী পেয়ে তাকে হকের সন্ধান দিয়েছিলেন।

(গ) নিঃশ্ব অবস্থায় পেয়ে তাকে অভাবমুক্ত করেছিলেন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ কিভাবে নেয়ামত প্রদান করে খোটা দিলেন? অথচ কোরআন এবং সহীহ সুন্নাহ থেকে প্রতিয়মান হয় যে খোটা দেওয়া জায়েজ নেই। এর উত্তর হলো: কাউকে উপরকার করে অথবা নেয়ামত প্রদান করে খোটা দেওয়া হারাম, সকল ওলামা একমত যে এ হুকুম কেবল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আল্লাহর ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না। আরো স্পষ্ট কথা হলো শরীয়াতের কোন বিধানই আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রাযোজ্য হবে না।

৪। নয়, দশ এবং এগার নাম্বার আয়াতে, উল্লেখিত নেয়ামতের শুকরিয়া স্বরুপ রাসূলুল্লাহ (সা.) কে তিনটি বিষয় পালন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন:

(ক) ইয়াতিমের প্রতি কঠোর না হওয়া।

(খ) ভিক্ষুককে ভিক্ষা না দিয়ে ধমকের স্বরে তাড়িয়ে না দেওয়া।

(গ) অর্জিত নেয়ামতের কথা অন্যের কাছে ব্যক্ত করা।

৫। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব রাসূলুল্লাহ (সা.) কে যথাক্রমে ইয়াতিম, হক্ক সন্ধানী এবং নিঃস্বতায় ফেলে তা থেকে পরিত্রান দিয়েছেন। তিনি চাইলে তাকে সকল দিকে ভরপুর রেখেও নবুওয়াত দিতে পারতেন। এটা না করার হিকমাত হলো: আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন তিনি পিতৃহীনতা এবং নিঃস্বতার কষ্ট বোঝার পাশাপাশি যেন হক্ক থেকে দুরে থাকার কষ্ট বুঝতে পারেন। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/২৮৯) ।

৬। এগার নাম্বার আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ প্রদত্ব নেয়ামত অর্জন করলে শুকরিয়া স্বরুপ তা মানুষের কাছে ব্যক্ত করা। তাফসীরকারকগণ এ মাসয়ালায় তিনটি মত ব্যক্ত করেছেন:

(ক) স্বাভাবিকভাবে অর্জিত আল্লাহর নেয়ামতের কথা অন্যের কাছে ব্যক্ত করা জায়েজ।

(খ) আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন এবং অন্যকে নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় শিখানোর জন্য তা ব্যক্ত করা মোস্তাহাব।

(গ) নিজের ভিতর অহংকার আসা এবং অন্যের হিংসার স্বীকার হওয়া সহ যে কোন ফেতনাতে পতিত হওয়ার ভয় থাকলে নেয়ামতের কথা গোপন রাখা উত্তম। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/২৯০) ।

সূরার আমল:

১। ইয়াতিম-অসহায়দের দায়িত্বগ্রহণপূর্বক আশ্রয় প্রদান করা এবং ভিক্ষুকের সাথে ভালো ব্যবহার করা।

২। পরিস্থিতি বিবেচনা করে নেয়ামতের কথা অন্যের কাছে ব্যক্ত করা।

(سورة الشَّرْح)

সূরা আল-শার্‌হ এর পরিচয়:

সূরার নাম: ইবনু আশুর (র.) অত্র সূরার তিনটি নাম উল্লেখ করেছেন:

(ক) সহীহ আল-বুখারী এবং সুনান আল-তিরমিযী সহ অধিকাংশ তাফসীর গ্রন্থে এ সূরাকে ‘আলাম নাশরাহ’ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

(খ) কোন কোন তাফসীর গ্রন্থ এবং মুসহাফে ‘আল-শার্‌হ’ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

(গ) আবার কিছু তাফসীর গ্রন্থে ‘আল-ইনশিরাহ’ নামটিও পাওয়া যায়। (*আল-তাহরীর ওয়া আল-তানভীর*, ৩০/৩৫৯) । কিন্তু ইমাম সুয়ূতী (র.) তার ‘ইতক্বান’ কিতাবে অত্র সূরাকে একাধিক নামওয়ালা সূরাগুলোর তালিকায় উল্লেখ করেননি।

আলোচ্যবিষয়: রাসূলুল্লাহর প্রতি আল্লাহর নেয়ামত এবং কিছু দিকনির্দেশনা।

সূরার ফযিলত: অত্র সূরার ফযিলতের ব্যাপারে কিছু দুর্বল হাদীস পাওয়া যায়, যা উল্লেখযোগ্য নয়। তবে অত্র সূরাটি মুফাস্‌সালাত এর অন্তভুক্ত, আর মুফাস্‌সালাত সূরাগুলোকে কোরআনের অন্তর বলা হয়। যেমন: ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন,

(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].

অর্থাৎ: “প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, আর কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্‌সাল সূরাগুলো”।

(*সুনানে দারিমী*, ৩৪২০) ।

আরো একটি হাদীসে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে মুফাস্‌সালাত সূরাগুলো ইতিপূর্বে কোন নবী-রাসূলকে প্রদান করা হয়নি। যেমন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةِ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشاميين: ٢٧٣٤].

অর্থাৎ: “আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিষিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিষিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্‌সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি”। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪) ।

হাদীসে মুফাস্‌সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ৯৪তম সূরা।

অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ১০ম সূরা, যা ‘সূরা দুহা’ এর পরে এবং ‘সূরা আসর’ এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

অবতীর্ণের স্থান: অত্র সূরাটি মাক্কিয়্যাহ হওয়ার ব্যাপারে সকল মোফাসসসের ঐকমত পোষণ করেছেন। (*বিতাকাত আল-তারীফ*, ৩২২) ।

আয়াত সংখ্যা: ৮টি।

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: এ সূরাটি অবতীর্ণের একটি প্রেক্ষাপট পাওয়া যায়, যা সূরার ব্যাখ্যায় আসবে, ইনশাআল্লাহ।

﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (٢) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
(٤) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (٧) وَإِلَى رَبِّكَ
فَارْغَبْ (٨)﴾ [سورة الشرح].

সূরার আলোচ্য বিষয়: রাসূলুল্লাহর প্রতি আল্লাহর নেয়ামত এবং কিছু দিকনির্দেশনা।

সূরার সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১	আমি কি প্রশস্ত করিনি	তোমার জন্য	তোমার বক্ষ?	২	এবং নামিয়ে দিয়েছি
	أَلَمْ نَشْرَحْ	لَكَ	صَدْرَكَ		وَوَضَعْنَا

তোমার থেকে	তোমার বোঝা।	৩	যা	ভেঙ্গে দিচ্ছিল	তোমার পিঠকে।	৪	আর
عَنْكَ	وِزْرَكَ		الَّذِي	أَنْقَضَ	ظَهْرَكَ		وَ

আমি সমুন্নত করেছি	তোমার (মর্যাদার) জন্য	তোমার স্মরণকে।	৫	তাই কষ্টের সাথেই
رَفَعْنَا	لَكَ	ذِكْرَكَ		فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ

রয়েছে সুখ।	৬	নিশ্চয়	কষ্টের সাথে রয়েছে	সুখ।	৭	সুতরাং যখনই	অবসর পাবে,
يُسْرًا		إِنَّ	مَعَ الْعُسْرِ	يُسْرًا		فَإِذَا	فَرَغْتَ

তখনই (ইবাদতে) সচেষ্ট হবে।	৮	এবং	তোমার রবের প্রতি	আকৃষ্ট হবে।	
فَانْصَبْ		وَ	إِلَى رَبِّكَ	فَارْغَبْ	

সূরার ভাবার্থ:

১। হে নবী! চার বছর বয়েসের সময় একবার এবং ৫২ বছর বয়েসে মি’রাজের সময় একবার, এভাবে মোট দুই বার সিনাচাকের মাধ্যমে আমি আপনার বক্ষকে হেদায়েত, অহী এবং দাওয়াতী কাজের জন্য উপযুক্ত করে নিয়েছি।

২,৩। নবুয়াতের পূর্বের জীবন জাহেলিয়াত যুগে সংঘঠিত হওয়া ছোটখাট ভুলত্রুটিগুলোকে আপনি বড় বোঝা মনে করতেন, আমি তা আপনার থেকে অপসারণ করে নিয়েছি।

৪। সাহাদা বাক্য, বক্তৃতা, সালাতের আযান, ইক্বামত এবং তাশাহুদে আমার নামের সাথে আপনার নাম সংযোজন করার মাধ্যমে আপনার স্মরণকে সবার উপরে সমুন্নত করেছি। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত আমার নামের সাথে আপনার নাম উচ্চারিত হবে।

৫, ৬। হে নবী! আপনার প্রতি কাফির-মুশরিকদের আঘাত, শত্রুতা, বাধা এবং ক্ষতিসাধনের কারণে দাওয়াতী কাজে নিরুৎসাহিত হবেন না। আপনার এই কষ্টের দিন শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। নিশ্চয় কষ্টের পরে সুখ রয়েছে।

৭,৮। সুতরাং যখনই দুনিয়াবি ব্যস্ততা এবং দাওয়াতী কাজ থেকে অবসর হবেন, তখন ইবাদতে মগ্ন হবেন এবং আপনার রবের প্রতি একন্তভাবে মননিবেশ করবেন।

(*আইসার*, ৫/৫৮৮, আল-*মোন্তাখাব*, ৯১৫, *আল-মোয়াস্সার*, ১/৫৯৫-৫৯৬) ।

সূরার অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ "আমি কি তোমার জন্য তোমার বক্ষ প্রশস্ত করি নি?", অত্র আয়াতে বক্ষ প্রশস্ত করা দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ বিষয়ে কয়েকটি মত পাওয়া যায়:

ইবনু কাসীর (র.) এ বিষয়ে দুইটি মত উল্লেখ করেছেন:

(ক) আমি তোমার অন্তরকে হেদায়েতের নুরে আলোকিত করেছি, যেমন: সূরা আনআম এর ১২৫ নাম্বার আয়াতে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(খ) মীরজের রাতের সিনাচাককে বুঝানো হয়েছে। এ বিষয়ে ইসরা এর লম্বা একটি হাদীস রয়েছে। (*তাফসীর ইবনু কাসীর*, ৮/৪২৯) ।

আবার কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন: চার বছর বয়সে খেলার মাঠে ফেরেশতা এসে তাকে সিনাচাক করেছিলো, এখানে সেটা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। (*আইসার*, ৫/৫৮৮) ।

এখানে তিনটিই উদ্দেশ্য হতে পারে, কারণ আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে ফেরেশতার মাধ্যমে যে দুই বার সিনাচাক করেছেন, তা মুলত তার অন্তরকে হেদায়েদ দিয়ে আলোকিত করা জন্যই করেছেন। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/২৯৪-২৯৬) ।

﴿وِزْرَكَ﴾ 'আপনার বোঝা', এখানে বোঝা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: নবুওয়াতের পুর্বে সংঘটিত হওয়া রাসূলুল্লাহর (সা.) ভুলত্রুটি, যেগুলোকে তিনি বোঝা মনে করতেন। (*গরীব আল-কোরআন*, ৪৬০) ।

﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ 'আমি তোমার স্মরণকে সমুন্নত করেছি', সকল মোফাসসের একমত যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'আমি শাহাদা বাক্য, বক্তৃতার ভূমিক, আযান, ইক্বামত এবং সালাতের তাশাহুদে আপনার নাম সংযোজন করেছি, যা কিয়ামত পর্যন্ত উচ্চারিত হবে'। (*তাফসীর গরীব আল-কোরআন*, ৪/৯৪) ।

অত্র সূরার সাথে পূর্বের সূরার সম্পর্ক:

ইমাম সুয়ূতী (র.) বলেন: "সূরা দুহা এ তিনটি এবং সূরা আল-শারহ এ তিনটি, এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর মোট ছয়টি নেয়ামতের বিষয় অত্র দুই সূরায় আলোচনা হওয়ার কারণে উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। এ জন্য কতিপয় সালাফ বলেছেন: দুই সূরার মাঝে 'বাসমালাহ' না থাকলে উভয়কে একটি সূরা ধরা যেত" (*আসরারু তারতীব আল-কোরআন*, সুয়ূতী, ১/১৫২) । এছাড়াও একটি হাদীসে কুদসীতে উল্লেখিত ছয়টি নেয়ামতকে এক জায়গায় দেখতে পাই। সে হিসেবেও দুইটি সূরাকে একটি সূরা বলা যায়। হাদীসটি হলো:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ مَسْأَلَةً وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَأَلْتُهُ، قُلْتُ: أَيْ رَبِّ قَدْ كَانَتْ قَبْلِي أَنْبِيَاءُ، مِنْهُمْ مَنْ سَخَّرْتَ لَهُ الرِّيحَ، ثُمَّ ذَكَرَ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ -عليهما السلام-، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُحْيِي الْمَوْتَى، ثُمَّ ذَكَرَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ -عليه السلام-، وَمِنْهُمْ يَذْكُرُ مَا أُعْطُوا، قَالَ: أَلَمْ أَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَيْتُ؟ قُلْتُ: بَلَى، أَيْ

رَبِّ، قَالَ: أَلَمْ أَجِدْكَ ضَالًّا فَهَدَيْتُ؟ قُلْتُ: بَلَى، أَيْ رَبِّ، قَالَ: أَلَمْ أَجِدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَيْتُ؟ قُلْتُ: بَلَى، أَيْ رَبِّ، قَالَ: أَلَمْ أَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، وَوُضَعْتُ عَنْكَ وِزْرَكَ؟ قُلْتُ: بَلَى، أَيْ رَبِّ) [شرح مشكل الآثار: ٣٩٦٦].

অর্থাৎ: ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "আমি আল্লাহকে কয়েকটি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমি আসলে এ রকম প্রশ্ন করতে প্রস্তুত ছিলাম না। আমি বললাম: হে রব! আমার পূর্বের নবীদের কাউকে বাতাশের উপর প্রভাব খাটানোর ক্ষমতা দিয়েছিলেন, যেমন: সোলাইমান ইবনু দাউদ (আ.) এবং কাউকে মৃত্যুকে জীবিত করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন, যেমন: ঈসা ইবনু মারইয়াম। এভাবে আরো অনেক।
তখন আল্লাহ উত্তরে বললেন: আমি কি তোমাকে এতিম পেয়ে আশ্রয় দেইনি? আমি বললাম: অবশ্যই দিয়েছেন, হে আমার রব। তিঁনি বললেন: আমি তোমাকে সৎপথের সন্ধানী পেয়েছিলাম, অতঃপর তোমাকে সৎপথের সন্ধান দেই নি? আমি বললাম: অবশ্যই দিয়েছেন, হে আমার রব। আমি তোমাকে নিস্ব অবস্থায় পেয়েছিলাম, অতঃপর তোমাকে ধনী বানাই নি? আমি বললাম: অবশ্যই বানিয়েছেন, হে আমার রব। এবার তিঁনি বললেন: আমি কি তোমার বক্ষ বিদীর্ণ করে দেই নি এবং তোমার থেকে ভুলের বোঝাকে অপসরণ করে দেই নি? আমি বললাম: অবশ্যই দিয়েছেন, হে আমার রব" (*শরহে মুশকিল আল-আসার*, ৩৯৬৬)।
ইমাম বাক্বায়ী (র.) বলেন: অত্র সূরাটি সূরা দুহা এর সর্বশেষ আয়াতের ব্যাখ্যা। (*নাযমুদ দরার*, ২২/১১৫)।

অত্র সূরার সাথে পরের সূরার সম্পর্ক:

অত্র সূরা তথা সূরা আল-শারহ এ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর আল্লাহ তায়ালার তিনটি নেয়ামতের কথা স্মরণ করে দিয়ে এর শুকরিয়া স্বরুপ তার উপর করণীয় বিষয় ঠিক করে দিয়েছেন। আর পরের সূরা তথা সূরা তীন এ মানবজাতিকে অনন্য আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ নেয়ামতের কথা উল্লেখের পর তাদের উপর করণীয় বিষয় ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং উভয় সূরার মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট। (*তাফসীরে খতীব*, ৩০/১৭০৫, *তাফসীরে মাওজুয়ী*, ১০/২৪২)।

সূরাটি অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

ইমাম সুয়ূতী (র.) বলেন: মুশরিকরা যখন মুসলমানদেরকে তাদের দরিদ্রতার কারণে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছিলো, তখন আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াত "নিশ্চয় কষ্টের পরে সুখ রয়েছে" অবতীর্ণ করেন। অত্র আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদেরকে সুসংবাদ দিলেন যে, তোমাদের কাছে সুখ-স্বাচ্ছন্দ আসছে। নিশ্চয় দুই সুখের উপর দরিদ্রতা কখনও বিজয় লাভ করতে পারবে না। (*লুবাব আল-নুযূল*, ৩৬৩)।

অত্র সূরার শিক্ষা:

১। অত্র সূরায় আল্লাহ তায়ালা চারটি বিষয় আলোচনা করেছেন:
(ক) প্রথম চার আয়াতে, মক্কা এবং তায়েফের কাফের-মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা.) উপর যে অত্যাচার করেছে তা থেকে শান্তনা প্রদানের জন্য তার উপর আল্লাহ তায়ালার তিনটি

নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। নেয়ামত তিনটি হলো: (১) সিনাচাকের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরকে হেদায়েত, অহী এবং দাওয়াতী কাজের জন্য উপযুক্ত করে নিয়েছেন, (২) তার অন্তরকে পাপপঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করেছেন এবং (৩) দুনিয়া-আখিরাতে তার স্মরণ ও মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন।

(খ) পঞ্চম এবং ষষ্ঠ আয়াতে, দাওয়াতী কাজে ইসলামের দুশমন কর্তৃক যুলম-নির্যাতনের সম্মুখীন হলে তা থেকে রক্ষার পাশাপাশি শত্রু বাহিনীর উপর বিজয় প্রদানের ওয়াদা করেছেন।

(গ) সপ্তম আয়াতে, দুনিয়াবি ব্যস্ততা এবং দাওয়াতী কাজ থেকে অবসর হলে ইবাদতে মগ্ন হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

(ঘ) অষ্টম আয়াতে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করার নির্দেশ।

২। সাত নাম্বার আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একজন মুমিন দাওয়াতী প্রচারণা, রিযক অন্বেষণ, সামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদি কাজের বাহিরে পুরো সময়টাই ইবাদত-বন্দেগী, জিকর-আজকার, তাওবা-ইস্তেগফার ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকবে। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/২৯৮) ।

৩। পাঁচ এবং ছয় নাম্বার আয়াতে একই কথা দুইবার উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা দুইটি বিষয়ের প্রতি তাকীদ দিয়েছেন:

(ক) সুখের প্রতি আশার তীব্রতাকে বুঝানো হয়েছে।

(খ) কষ্টাবস্থায় প্রবল ধৈর্যধারণ করার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদের জন্য একটি কষ্টের বিপরীতে দুইটি সুখের ব্যবস্থা করেছেন। অর্থাৎ: সুখের পরে কষ্ট এবং তারপরে আবার সুখ। মাওকুফ সূত্রে একটি হাদীসে এসেছে, ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন:

(لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ) [المستدرك على الصحيحين لحاكم، ٣٩٤٢].

অর্থাৎ: "সুখ কষ্টকে দুই দিক থেকে বেষ্টন করে রাখার কারণে কষ্ট কখনও সুখের উপর বিজয়ী হবে না" (*আল-মোস্তাদরাক আলা-সহীহাইন*, ৩৯৪৯) ।

৪। সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর উপর ভরসা করা এবং সকল সৎআমলের সওয়াব একমাত্র আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করা।

৫। অত্র সূরায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবাদের জন্য শান্তনা এবং সুসংবাদ রয়েছে যে, তোমরা ইসলামের পথে যা কিছু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করছো এ ব্যাপারে চিন্তিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। যেহেতু এর পরেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য স্বস্তি এনে দিবেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালার এ সুসংবাদ পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়েছিল, ইতিহাস যার স্বপক্ষে সাক্ষী হয়ে আছে।

সূরার আমল:

১। আগত সুখের প্রত্যাশা নিয়ে চলমান কষ্টে ধৈর্যধারণ করা।

২। সর্বদা আল্লাহর ইবাদত, ইস্তেগফার এবং জিকর-আজকারে নিজেকে মশগুল রাখা।

৩। সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর উপর ভরসা করা।

(سورة التين)

সূরা তীন এর পরিচয়:

সূরার নাম: এ সূরার একটি মাত্র নাম পাওয়া যায়: সূরা তীন। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা এ সূরা তীন শব্দটি দিয়ে শুরু করেছেন, সেহেতু একে সূরা তীন নামকরণ করা হয়েছে। (তাফসীর মাওজুয়ী, ১০/২৩৭) ।

আলোচ্যবিষয়: মানুষের মূল্যায়ন হয় ধর্মের মানদন্ডে।

সূরার ফযিলত:

(ক) ইশার সালাতে সূরা তীন পাঠ করা, কারণ অত্র সূরাটি রাসূলুল্লাহ (সা.) ইশার সালাতে পড়তেন। সহীহ বুখারীতে একটি হাদীস এসেছে, বারা’আ (রা.) বলেন:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي العِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ: بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. (صحيح البخاري: ٧٦٧).

অর্থাৎ: “রাসূলুল্লাহ (সা.) এক সফরে ইশা সালাতের প্রথম দুই রাকআতের এক রাকআতে সূরা তীন পাঠ করেন” (*সহীহ আল-বুখারী*, ৭৬৭) ।

(খ) অত্র সূরাটি কোরআনের অন্তর, অত্র সূরাটি মুফাস্‌সালাত এর অন্তভুক্ত, আর মুফাস্‌সালাত সূরাগুলোকে কোরআনের অন্তর বলা হয়। যেমন: ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন,

(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].

অর্থাৎ: “প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, আর কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্‌সাল সূরাগুলো”। (*সুনানে দারিমী*, ৩৪২০) ।

আরো একটি হাদীসে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে মুফাস্‌সালাত সূরাগুলো ইতিপূর্বে কোন নবী-রাসূলকে প্রদান করা হয়নি। যেমন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةِ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].

অর্থাৎ: “আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিষিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিষিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্‌সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি”। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪) ।

হাদীসে মুফাস্‌সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ৯৫তম সূরা।

অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ২৭তম সূরা, যা ‘সূরা বুরূজ’ এর পরে এবং ‘সূরা কুরাইশ’ এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

অবতীর্ণের স্থান: মক্কা, অথবা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। অধিকাংশ ওলামার মতে, সূরা মাক্কিয়্যাহ। (*বিতাকাত আল-তারীফ*, ৩২৫) ।

আয়াত সংখ্যা: ৮টি।

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: একটি প্রেক্ষাপট পাওয়া যায়, যা সূরার ব্যাখ্যায় আসবে, ইনশাআল্লাহ।

﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (١) وَطُورِ سِينِينَ (٢) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ
تَقْوِيمٍ (٤) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٥) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
(٦) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (٧) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (٨)﴾ [سورة التين].

সূরার আলোচ্য বিষয়: মানুষের মূল্যায়ন হয় ধর্মের মানদন্ডে।

সূরার সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১	শপথ তীন	এবং যায়তুনের।	২	শপথ ‘সিনাই’ পর্বতের।	৩	শপথ এ নিরাপদ নগরীর।	
	وَالتِّينِ	وَالزَّيْتُونِ		وَطُورِ سِينِينَ		وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ	
৪	অবশ্যই	আমি সৃষ্টি করেছি	মানব জাতিকে	সর্বোত্তম	গঠনে।	৫	অতঃপর
	لَقَدْ	خَلَقْنَا	الْإِنْسَانَ	فِي أَحْسَنِ	تَقْوِيمٍ		ثُمَّ
তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি	হীনতার সর্বনিম্ন স্তরে।	৬	কিন্তু তাদেরকে নয়	যারা ঈমান এনেছে			
رَدَدْنَاهُ	أَسْفَلَ سَافِلِينَ		إِلَّا	الَّذِينَ آمَنُوا			
এবং আমলে সালিহ করেছে,	তাদের জন্য রয়েছে	নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।	৭	সুতরাং কিসে			
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ	فَلَهُمْ	أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ		فَمَا			
এরপরও তোমাকে অবিশ্বাসী করে তোলে	কর্মফল সম্পর্কে?	৮	আল্লাহ কি নয়	শ্রেষ্ঠ বিচারক			
يُكَذِّبُكَ بَعْدُ	بِالدِّينِ		أَلَيْسَ اللَّهُ	بِأَحْكَمِ			
বিচারকদের মধ্যে?							
الْحَاكِمِينَ							

সূরার ভাবার্থ:

আল্লাহ তায়ালা সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিশর এবং মক্কার শপথ করে বলেন: অবশ্যই আমি মানবজাতিকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করে একদল যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুসরণ করে না তাদেরকে জাহান্নামী বানিয়েছি এবং আরেকদল যারা ঈমান আনে এবং সৎআমল করে তাদেরকে জান্নাতী বানিয়েছি।

হে মানবজাতি! বিচার দিন সম্পর্কে তোমাদের কাছে যথেষ্ট দলীল থাকার পরও কোন জিনিস তোমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করলো তা অস্বীকার করতে? নিশ্চই আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে অযথা সৃষ্টি করেননি, বরং তিনি তাদের দুনিয়ার জীবনের কৃতকর্মের বিচারের জন্য কিয়ামতের দিনকে নির্ধারণ করেছেন। (*আল-তাফসীর আল-মোয়াস্সার*, ১/৫৯৭)।

সূরার অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ 'শপথ তীন এবং যাইতুনের', তীন এবং যাইতুন হলো: তৎকালীন শাম দেশে অবস্থিত দুইটি পাহাড়ের নাম। এ পাহাড়দ্বয়ে বেশী বেশী তীন এবং যাইতুন ফল জন্মানোর কারণে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে। তবে আয়াতে শাম দেশকে বুঝানো হয়েছে, যা বর্তমান মানচিত্র অনুযায়ী সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন এবং ফিলিস্তিনকে বুঝানো হয়। (*গরীব আল-কোরআন*, ইবনু কুতাইবা, ৪৬১) ।

ইমাম শাওকানী (র.) তার তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইবনু যায়েদ (র.) বলেন: "তীন হলো মসজিদে দেমাস্ক এবং যায়তুন হলো মসজিদে আক্বসা"। (*ফাতহুল ক্বাদীর*, ৫/৫৬৭) ।

কোন কোন তাফসীকারক বলেছেন: 'তীন দ্বারা স্বয়ং তীনকে এবং যায়তুন দ্বারা স্বয়ং যায়তুনকেই বুঝানো হয়েছে' এর নানাবিধ উপকারিতার কারণে আল্লাহ তায়ালা এর শপথ করেছেন। (*আল-তাফসীর আল-কাবীর*, ৩২/২১০) ।

তবে প্রথম ও দ্বিতীয় মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য, যেমন: সাইয়্যেদ কুতুব (র.) বলেছেন: "তীন ও যায়তুনকে উল্লেখ করে স্থানের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন যার সাথে ধর্মীয় ঐতিহ্যের সম্পর্ক রয়েছে" এ মতটি হক্বের বেশী কাছাকাছি। (*ফি জিলাল আল-কোরআন*, ৬/৩৯৩৩) ।

﴿وَطُورِ سِينِينَ﴾ 'এবং সিনাই পাহাড়', দ্বারা মিশর ভূমিকে বুঝানো হয়েছে। (*আইসার*, ৫/৫৯০) ।

﴿الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ 'নিরাপদ শহর', দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'মক্কা নগরী'। (*গরীব আল-কোরআন*, ৪৬১) ।

﴿أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ 'হীনতার সর্বনিম্ন স্তর', দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে তাফসীরকারকদের থেকে দুইটি মত পাওয়া যায়:

(ক) অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে, জাহান্নামীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

(খ) ইমাম তবারী (র.) সহ কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, বৃদ্ধ বয়সের মানুষকে বুঝানো হয়েছে, যখন তাদের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়।

ইবনু কাসীর (র.) প্রথম মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (*তাফসীরে ইবনু কাসীর*, ৮/৪৩৫) ।

অত্র সূরার সাথে পূর্বের সূরার সম্পর্ক:

পূর্বের সূরা তথা সূরা আল এনশেরাহ এ আলোচনা করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর আল্লাহর বিশেষ নিয়ামতের কথা এবং অত্র নিয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ তার উচিৎ আল্লাহর দিকে মনযোগী হওয়া এবং অভাবীদের প্রতি খেয়াল রাখা। আর অত্র সূরা অর্থাৎ সূরা তীন এ আশ্চর্যজনক সৃষ্টির বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহর কুদরাতের বর্ণনার পর আলোচনা করা হয়েছে যে, মানুষকে অনন্য আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে, সুতরাং এ নেয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ তাদের উচিৎ জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসারী হওয়া যাতে সে আখিরাতে সৌভাগ্যবান হতে পারে। (*তাফসীরে খতীব*, ৩০/১৭০৫, *তাফসীরে মাওজুয়ী*, ১০/২৪২) ।

অত্র সূরার সাথে পরের সূরার সম্পর্ক:

অত্র সূরা তথা সূরা ত্বীন এ আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করে তাদেরকে সুস্থ থাকার জন্য ম্যানু দিয়েছেন। কিন্তু কিছু মানুষ আল্লাহর গাইডেন্সকে অমান্য করে নিম্ন মানের সৃষ্টিতে পরিণত হয়ে থাকে। আর পরের সূরা তথা সূরা আলাক্ব এ আলোচনা করা হয়েছে মানুষ নিজেদের উন্নতি এবং তাদের মান ঠিক রাখার জন্য কোরআন পড়বে, আর যারা পড়বে না তাদের পদস্খলন ঘটে নিম্ন মানের সৃষ্টিতে পরিণত হবে। সুতরাং উভয় সূরার মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট। (*নাযম আল-দুরার*, আল-বাক্বায়ী, ৮/৪৮০) ।

ছয় নাম্বার আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: 'হীনতার সর্বনিম্ন স্তর' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: বৃদ্ধ বয়সের মানুষ, যাদের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে আল্লাহ তায়ালা ছয় নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করে জানিয়ে দিলেন, তারা বুদ্ধি লোপ পাবার পূর্বে যে ঈমান ও সৎআমল করেছে তার বিনিময়ে তাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে।

(*লুবাব আল-নুকূল*, ৩৬৩) ।

সূরার শিক্ষা:

১। তীন এবং যায়তুনের কিছু গুনাবলী: তীন বা ডুমুর একাধারে খাদ্য, ফল এবং ওষুধ। এটা এক ধরণের উপকারী খাবার, কারণ তা একটি মনোরম খাদ্য, যা দ্রুত হজম হয়, পেটে স্থির থাকে না, কফ কমায় এবং কিডনিকে পরিশুদ্ধ করে। এটি সর্বোত্তম এবং প্রশংসনীয় ফলও বটে। এবং এটা একটি ওষুধ, কারণ শরীরের অতিরিক্ত বিষক্ত পদার্থ বের করে দেওয়ার জন্য এটার মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। যেমন: আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন:

أهدي إلى رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَّم- طبق فيه تين فأكل وقال لأصحابه: كلوا التين فلو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة بلا عجم لقلت هي التين كلوه فإنه يقطع البواسير وينفع من النقرس. (الطب النبوي للأصبهاني، ٤٦٨).

অর্থাৎ: "রাসূলুল্লাহ (সা.) কে এক প্লেট ডুমুর ফল হাদিয়া দেওয়া হলে তিনি নিজে তা থেকে খেলেন এবং সাহাবীদেরকে খাওয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বললেন: আমি যদি বলি জান্নাত থেকে ফল অবতীর্ণ হয়েছে, তাহলে সে ফলটি হবে ডুমুর ফল। তোমরা তা খাও, নিশ্চয় এ ফল অর্শ্বরোগকে নিরাময় করে এবং হাড়ের রোগের জন্যও উপকারী" (*তিব্ব আল-নাভাবী*, ৪৬৮), হাদীসটিকে অনেকে হাসান বলেছেন, আবার অনেকে যয়ীফ বলেছেন।

অনুরূপভাবে, জলপাই একটি ফল, তরকারী এবং ওষুধ। তা থেকে তেল বের করা হয়, যা অনেক দেশের মানুষ তরকারী পাকের কাজে ব্যবহার করে থাকে এবং এটি অনেক রোগের ঔষধ। যেমন: আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾ [سورة النور: ٣٥].

অর্থাৎ: "কাচের আবরণটি হচ্ছে উজ্জ্বল একটি তারার মতো, তা প্রজ্জ্বলিত করা হয় পবিত্র যায়তুন গাছ দ্বারা, যা পূর্ব দিকের নয় এবং পশ্চিম দিকেরও নয়" (*সূরা নূর*, ৩৫) ।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/৩০৪-৩০৫) ।

সূরা তীন এর শিক্ষা:

২। আল্লাহ তায়ালার সকল সৃষ্টিই নিখুঁত এবং সুন্দর হওয়া সত্যেও চার নাম্বার আয়াতে মানুষের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো:

(ক) মানুষের প্রতি গুরুত্বারোপ করার জন্য।

(খ) সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক থাকার কারণে। (*জিলাল ফি আল-কোরআন*, ৬/৩৯৩৩)। এর মধ্যে একটি ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাঁর কাছে উচ্চ এবং মহিমান্বিত অবস্থানে পৌঁছানোর জন্য তাদেরকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে সৃষ্টি করেছেন, যে বৈশিষ্ট্য অন্য কোন প্রাণীকে দেননি। ফলে তারা আল্লাাহর পথ অনুসরণ করে তাঁর সাথে সম্পর্কের এত গভীরতায় পৌঁছে যায় যেখানে অন্য কোন প্রাণী পৌঁছতে পারে না এবং তাঁর পথ ছেড়ে দিয়ে নিকৃষ্টতার এমন নিম্নস্তরে নেমে যায় যেখানে কোন চতুষ্পদপ্রাণীও নামতে পারে না। সুতরাং মানুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত: এক শ্রেণী তার বিশ্বাস ও অনুসরণের মাধ্যমে মহিমান্বিত অবস্থানে পৌঁছে জান্নাতী হয় এবং আরেক শ্রেণী তাদের কুফরী এবং অবাধ্যতার কারণে হীনতার সর্বনিম্ন স্তরে নেমে গিয়ে জাহান্নামী হয়। (*তাফসীর আল-মাওজুয়ী*, ১০/২৪৩)।

৩। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা সীনাই পর্বত, জেরুজালেমের পর্বত এবং মক্কার পর্বতের শপথ করেছেন, কারণ এ জায়গাগুলোত আল্লাহর অহী 'উলুল আযম' রাসূলদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিলো। যেমন: সীনাই পর্বত থেকে মূসা (আ.), জেরুজালেমের পর্বত থেকে ঈসা (আ.) এবং মক্কার হিরা গুহা থেকে মোহাম্মদ (সা.) অহী লাভ করেছিলেন। (*তাফসীর মুনীর*, ওহাবা জুহাইলী, ৩০/৩০৫)।

৪। 'মুকসাম বিহি' বা যার দ্বারা কসম করা হয়েছে এবং 'জাওয়াবে কসম' বা কসমের পরে যে বিষয়ে কথা বলা হয়েছে এ দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক হলো: 'মুকসাম বিহি' তিনটি জায়গা যেখানে মানবজাতির হেদায়েতের মশাল অবতীর্ণ হয়েছে। আর 'জাওয়াবে কসম' এ বলা হয়েছে যে মানবজাতি হেদায়েতের মশাল গ্রহণ করলে জান্নাতী হবে এবং বর্জন করলে জাহান্নামী হবে। সুতরাং 'মুকসাম বিহি' এবং 'জাওয়াবে কসম' এর মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট।

সূরা তীন এর আমল:

১। ইশার সালাতে সূরা তীন তেলাওয়াত করা।

২। এ সূরা তেলাওয়াত শেষে, অথবা কারো থেকে শুনা শেষে নিম্নের বাক্যটি পড়বে:

(بَلَى، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ). অর্থাৎ: "না, বরং তিঁনি একজন শ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক, এবং এ কথার স্বপক্ষে আমি একজন সাক্ষী"। যেমন: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(مَنْ قَرَأَ سُورَةَ "وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ" فَقَرَأَ: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الحَاكِمِينَ﴾ [التين: ٨] فَلْيَقُلْ: بَلَى، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ) [الترمذي: ٣٣٤٧].

অর্থাৎ: "যে ব্যক্তি সূরা তীন তেলাওয়াত শুরু করে সর্বশেষ আয়াত "আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নয়?" পর্যন্ত তেলাওয়াত করে, সে যেন বলে: "না, বরং তিঁনি একজন শ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক, এবং এ কথার স্বপক্ষে আমি একজন সাক্ষী"। (*সুনানে তিরমিযী*, ৩৩৪৭)।

(سُوْرَةُ الْعَلَق)

সূরা আলাক্ব এর পরিচয়:

সূরার নাম: এ সূরার দুইটি নাম পাওয়া যায়: (ক) সূরাতু আল-আলাক্ব এবং (খ) সূরাতু ইক্বরা বিসমি রাব্বিক। আয়েশা সিদ্দীক্বা (রা.) বলেন:

إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [المستدرك للحاكم: ٢٨٧٤].

অর্থাৎ: “কোরআনে প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে সূরা ইক্বরা বিসমি রাব্বিক” (*আল-মোস্তাদরাক লিল হাকিম*, ২৮৭৪) ।

আলোচ্যবিষয়: ইলম অর্জনের ফযিলত।

সূরার ফযিলত: হেরার গুহায় দীর্ঘ অপেক্ষার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর অহীর সূচনা হয় এ সূরার প্রথম পাঁচ আয়াত দিয়ে। আয়েশা সিদ্দীক্বা (রা.) বলেন:

إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [المستدرك للحاكم: ٢٨٧٤].

অর্থাৎ: “কোরআনে প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে সূরা ইক্বরা বিসমি রাব্বিক” (*আল-মোস্তাদরাক লিল হাকিম*, ২৮৭৪)। এছাড়াও অত্র সূরাটি মুফাস্সালাত এর অন্তভূক্ত। মুফাস্সাল সূরার ফযিলত সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন:

(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].

অর্থাৎ: “প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, আর কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্সাল সূরাগুলো”।
(*সুনানে দারিমী*, ৪৩২০) ।

আরো একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةَ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].

অর্থাৎ: “আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিসিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিষিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি”। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪) ।
হাদীসে মুফাস্সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।
মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ৯৬তম সূরা।
অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: প্রথম অবতীর্ণ সূরা।
অবতীর্ণের স্থান: মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা মাক্কিয়্যাহ। (*বিতাকাত আল-তারীফ*, ৩২৮) ।
আয়াত সংখ্যা: ১৯টি।
অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: এ সূরাটি অবতীর্ণের একটি প্রেক্ষাপট পাওয়া যায়, যা সূরার ব্যাখ্যায় আসবে, ইনশাআল্লাহ।

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)﴾ [سورة العلق: ١-٥].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়: মানুষ সৃষ্টি করে তাদেরকে লেখা-পড়া শিক্ষা দেওয়া।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১	হে নবী! পড়	তোমার রবের নামে,	যিনি	সৃষ্টি করেছেন।	২	তিনি সৃষ্টি করেছেন		
	اقْرَأْ	بِاسْمِ رَبِّكَ	الَّذِي	خَلَقَ		خَلَقَ		
মানুষকে	রক্তপিন্ড থেকে।	৩	পড়,	আর তোমার রব	মহামহিম।	৪	যিনি	শিখিয়েছেন
الْإِنْسَانَ	مِنْ عَلَقٍ		اقْرَأْ	وَرَبُّكَ	الْأَكْرَمُ		الَّذِي	عَلَّمَ
কলমের সাহায্যে।	৫	তিনি শিখিয়েছেন	মানুষকে	যা	সে জানতো না।			
بِالْقَلَمِ		عَلَّمَ	الْإِنْسَانَ	مَا	لَمْ يَعْلَمْ			

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

হে নবী! আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হচ্ছে তা একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নামে পড়ুন, যিনি আদমকে পোড়া মাটি থেকে, হাওয়াকে তার পাঁজরের হাড় থেকে এবং তাদের বংশধরকে রক্তপিন্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন। হে নবী! আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হচ্ছে তা পড়ুন, নিশ্চয় আপনার রব মহামহিম। তিনি মানুষকে কলমের সাহায্যে লেখা শিক্ষা দিয়েছেন এবং তারা যা জানতো না, তা শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখিয়েছেন।

সাবধান! মানুষ নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে সীমালঙ্ঘন করে থাকে। নিশ্চয় তাদের জেনে রাখা উচিৎ পৃথিবীর সবকিছু পুনরুত্থানের মাধ্যমে আল্লাহর সামনে বিচারের সম্মুখীন হয়ে পার্থিব জীবনের সকল কৃতকর্মের জন্য পুরষ্কৃত-তিরস্কৃত হবে।

(*আল-আইসার*, ৫/৫৯২, *আল-মোন্তাখাব*, ৯১৭, *আল-মুয়াস্‌সার*, ১/৫৯৭)।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الَّذِي خَلَقَ﴾ 'যিনি সৃষ্টি করেছেন', এ আয়াতাংশের পর 'কর্ম' উহ্য রয়েছে। পূর্ণ আয়াত হলো: 'যিনি আদমকে পোড়া মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন'। (*আল-আইসার*, ৫/৫৯২)।

﴿الْإِنْسَانَ﴾ 'মানুষ', সূরা আলাক্ব এ 'মানুষ' শব্দটি তিন বার এসেছে:

প্রথমত: দ্বিতীয় আয়াতে 'মানুষ' দ্বারা সকল মানবজাতিকে বুঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: পঞ্চম আয়াতে 'মানুষ' দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে তিনটি মত পাওয়া যায়:

(ক) আদম (আ.), এ মতের স্বপক্ষে দলীল হলো সূরা বাক্বারার একত্রিশ নাম্বার আয়াত।

(খ) মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.), সূরা নিসা এর ১১৩ নাম্বার আয়াত এ মতের পক্ষের দলীল।

(গ) সকল মানবজাতি; কারণ আল্লাহ সকলকে শিক্ষা দিয়েছেন। (*আল-কুরতুবী*, ৫/৮২)।

(ক) ও (খ) কে শামিল করার কারণে সর্বশেষ মতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। (*তাফসীর মাওজুয়ী*, ১০/২৫৪) ।

তৃতীয়ত: নবম আয়াতে আবু জাহল কে সম্বোধন করে 'মানুষ' বলা হলেও এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সকল মানবজাতি। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/৩১৫) ।

অত্র সূরার সাথে পূর্বের সূরার সম্পর্ক:

পূর্বের সূরা তথা সূরা ত্বীন এ আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করে তাদেরকে সুস্থ থাকার জন্য ম্যানু দিয়েছেন। কিন্তু কিছু মানুষ আল্লাহর গাইডেন্সকে অমান্য করে নিম্ন মানের সৃষ্টিতে পরিণত হয়ে থাকে। আর অত্র সূরা তথা সূরা আলাক্ব এ আলোচনা করা হয়েছে মানুষ নিজেদের উন্নতির জন্য জন্য পড়ার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করবে এবং যারা পড়বে না তাদের পদস্খলন ঘটবে। আর সুস্থ মস্তিস্কের মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন পদস্খলিত জাতির অনুসরণ না করে। সুতরাং উভয় সূরার মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট। (*নাযম আল-দুরার*, আল-বাক্বায়ী, ৮/৪৮০) ।

অত্র সূরার সাথে পরের সূরার সম্পর্ক:

অত্র সূরা তথা সূরা আলাক্ব এ মোহাম্মদ (সা.) কে এক আল্লাহর নামে কোরআন পড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যিনি মানুষকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন যা তারা জানতো না। আর পরের সূরা তথা সূরা ক্বাদর এ কোরআন অবতীর্ণের দিন-তারিখ এবং তার মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং উভয় সূরার মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট। (*তাফসীর মাওজুয়ী*, ১০/২৬৩) ।

সূরার একাংশ অন্য অংশের সাথে সম্পর্ক:

অত্র সূরার (১-৫) প্রথম পাঁচ আয়াতে অহীর জ্ঞান অর্জন করতে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পরের তিন আয়াতে (৬-৮) যারা পড়বে না তাদেরকে গোমরাহ বলা হয়েছে এবং শেষের এগার আয়াত তথা (৯-১৯) আয়াতে গোমরাহীদের স্বরূপ বর্ণনার পাশাপাশি তাদেরকে অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। (*তাফসীর আল-মাওজুয়ী*, ১০/২৫১) ।

আয়াতের সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

এ সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত দীর্ঘ একটি হাদীস রয়েছে:

أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلاَءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ - وَهُوَ التَّعَبُّدُ - اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، قَالَ: "فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ﴾ [العلق: ٢] "فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَ: «زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي» فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الخَبَرَ: «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي» فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ

حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ العُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الكِتَابَ العِبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ، اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأَى، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ»، قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ، وَفَتَرَ الوَحْيُ. (صحيح البخاري: ٣).

অর্থাৎ: রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর সর্বপ্রথম যে অহী আসে, তা ছিলো নিদ্রাবস্থায় বাস্তব স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে প্রভাতের আলোর ন্যায় প্রকাশিত হতো। অতঃপর তার নিকট নির্জনতা পছন্দনীয় হয়ে দাঁড়ায় এবং তিনি হেরার গুহায় নির্জনে অবস্থান করতেন। আপন পরিবারের নিকট ফিরে এসে কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে এভাবে সেখানে তিনি এক নাগাড়ে বেশ কয়েক দিন ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। অতঃপর খাদীজা (রা.) এর নিকট ফিরে এসে আবার একই সময়ের জন্য খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যেতেন। এভাবে 'হেরা' গুহায় থাকাকালে তার নিকট ওয়াহী আসলো।

তার নিকট ফেরেশতা এসে বললো: 'পাঠ করুন'। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: "আমি বললাম: আমি পড়তে জানি না"। তিনি বলেন: অতঃপর ফেরেশতা আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলো যে, আমার খুব কষ্ট হলো।

অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললো: 'পাঠ করুন'। আমি বললাম: 'আমি তো পড়তে জানি না'। সে দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলো যে, আমার খুব কষ্ট হলো।

অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললো: 'পাঠ করুন'। আমি উত্তর দিলাম, 'আমি তো পড়তে জানি না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: অতঃপর তৃতীয়বারে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। অতঃপর ছেড়ে দিয়ে বললেন: "পাঠ করুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত পিন্ড থেকে। পাঠ করুন, আর আপনার রব অতিশয় দয়ালু" (আলাক, ১-৩) ।

অতঃপর এ আয়াত নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর আত্মা তখন কাঁপছিলো। তিনি খাদীজা বিনতু খুওয়ায়লিদের (রা.) নিকট এসে বললেন: 'আমাকে চাদও দ্বারা আবৃত করো', 'আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত করো'। তারা তাকে চাদর আবৃত করলেন। এমনকি তার শংকা দুর হলো। তখন তিনি খাদীজা (রা.) এর নিকট ঘটনাবৃত্তান্ত জানিয়ে তাকে বললেন: আমি আমার নিজেকে নিয়ে শংকা বোধ করছি। খাদীজা (রা.) বললেন: আল্লাহর কসম, কখনই নয়। আল্লাহ আপনাকে কখনো লাঞ্চিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করেন, অসহায় দুস্থদের দায়িত্ব বহণ করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং হক পথের দুর্দশাগ্রস্থকে সাহায্য করেন।

অতঃপর তাকে নিয়ে খাদীজা (রা.) তার চাচাত ভাই ওয়ারাকাহ ইবনু নওফাল ইবনু আব্দুল আসাদ ইবনু আব্দুল উযযাহর নিকট গেলেন, যিনি জাহেলিয়াত যুগে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, ইবরানী ভাষায় লিখতে পারতেন এবং আল্লাহর তাওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইনজীল হতে ভাষান্তর করতেন। তিনি ছিলেন অতি বৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।
খাদীজা (রা.) তাকে বললেন: 'হে চাচাত ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন'। ওয়ারাকাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাতিজা! তুমি কি দেখো?' রাসূলুল্লাহ (সা.) যা দেখেছিলেন, সবই বর্ণনা করলেন। তখন ওয়ারাকাহ তাকে বললেন: এটা সেই বার্তাবাহক যাকে আল্লাহ মূসা (আ.) এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম, আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বহিষ্কার করবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: "তারা কি আমাকে বের করে দিবে?" তিনি বললে: হ্যা, তুমি যা নিয়ে এসেছো অনুরুপ কিছু যিনিই নিয়ে এসেছেন তার সঙ্গেই বৈরিতাপূর্ণ আচরণ করা হয়েছে। সে দিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে জোরালোভাবে সাহায্য করবো। এর কিছুদিন পর ওয়ারাকাহ ইন্তিকাল করেন। আর ওয়াহীর বিরতী ঘটে। (*সহীহ আল-বুখারী*, ৩) ।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। অহীর সূচনা এবং সর্বপ্রথম অহী: এ বিষয়ে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়:
(ক) বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয়েছে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলেম এ বিষয়ে একমত যে, সূরা আলাক্ব এর প্রথম পাঁচ আয়াতের মাধ্যমে অহীর সূচনা হয়। এর স্বপক্ষে সহীহ বুখারীর তিন নাম্বারে লম্বা একটি হাদীস রয়েছে, যা ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।
(খ) কেউ কেউ সূরা মুদ্দাসি্সরকে প্রথম সূরা বলেছেন।
(গ) আবার কেউ কেউ সূরা ফাতিহাকে প্রথম সূরা হিসেবে অবিহিত করেছেন।
ইমাম সুয়ূতী (র.) প্রথম মতকে বিশুদ্ধ বলেছেন। (*আল-ইতক্বান*, সুয়ূতী, ১/৯১-৯২) ।
২। অত্র সূরা শুরু হয়েছে পড়ার নির্দেশ দিয়ে, যা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত বহণ করে যে, পড়া জ্ঞানার্জনের সর্বোত্তম পদ্ধতি। অনুরুপভাবে পড়তে বলা হয়েছে আল্লাহর নামে, যা দুইটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত বহণ করে:
(ক) মানবজাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে পড়ার দক্ষতা অর্জন করতে পারা আল্লাহ তায়ালার এক ধরনের বিশেষ অনুগ্রহ।
(খ) এর মাধ্যমে এ কথার জানান দেওয়া যে, আল্লাহ তায়ালাই সকলকে জ্ঞান দান করেন। (*মাহাসিন আল-তা'ভীল*, আল-কাসেমী, ১৭/২০২) ।
'যিনি সৃষ্টি করেছেন' এ আয়াতাংশে সৃষ্টি কর্মকে ব্যাপকভাবে উল্লেখ করার পর পরবর্তী আয়াতে বিশেষভাবে মানবজাতিকে উল্লেখ করে তাদের সম্মানের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। (*আল-তাফসীর আল-কাশিফ*, মুগনিয়্যাহ, ৭/৫৮৬) ।
৩। আল্লাহর নামে তেলাওয়াত শুরু করা মর্মে বিধান চালু করা হয়েছে। এজন্যই সূরা তাওবা ছাড়া পবিত্র কোরআনের সকল সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লেখা হয়েছে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, ৫/৫৯৩) ।

৪। দ্বিতীয় আয়াতে মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়ার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা সহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَدْخُلُهَا. (صحيح البخاري: ٣٢٠٨).

অর্থাৎ: "নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান নিজ নিজ মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্যরূপে অবস্থান করে, অতঃপর তা জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত হয়। ঐভাবে চল্লিশ দিন অবস্থান করে। অতঃপর তা মাংসপিন্ডে পরিণত হয়ে আগের মতো চল্লিশ দিন থাকে। অতঃপর আল্লাহ একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন, অতঃপর সে তার মধ্যে আত্মা ফুঁকে দেয়। আর তাকে চারটি বিষয়ে আদেশ দেওয়া হয়। তাকে লিপিবদ্ধ করতে বলা হয়, তার আমল, তার রিযক, তার আয়ু এবং সে কি পাপী হবে না নেককার হবে। সুতরাং ঐ সত্বার শপথ যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, নিশ্চয় তোমাদের কোন ব্যক্তি আমল করতে করতে এমন পর্যায়ে পোঁছে যে, তার এবং জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত পার্থক্য থাকে। এমন সময় তার আমলনামা তার উপর জয়ী হয়। তখন সে জাহান্নামবাসীর মত আমল করে। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর একজন আমল করতে করতে এমন স্তরে পোঁছে যে তার এবং জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত তফাৎ থাকে, এমন সময় তার আমলনামা তার উপর জয়ী হয়। তখন সে জান্নাতবাসীর মত আমল করে। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (*সহীহ আল-বুখারী*, ৩২০৮) ।

৫। আল্লাহ তায়ালা কলমকে সর্ব প্রথম সৃষ্টি করে সৃষ্টিজগতের প্রতিটি জিনিসের ভালো-মন্দ তাকদীর লিখে রেখেছেন। যেমন একটি হাদীসে দেখতে পাই, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ. قَالَ: رَبِّ! وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ. (سنن أبي داود: ٤٧٠٢).

অর্থাৎ: "আল্লাহ তায়ালা প্রথমে কলমকে সৃষ্টি করে তাকে বললেন: লেখ, সে জবাব দিলো হে রব! আমি কি লেখবো? তিনি বললেন: সৃষ্টিজগতের প্রতিটি জিনিসের কিয়ামত পর্যন্ত ভালো-মন্দ তাকদীর লিখে রাখো"। (*সুনান আবু দাউদ*, ৪৭০২) ।

আয়াতাবলীর আমল:

১। কোরআন তেলাওয়াত সহ যে কোন কাজ আল্লাহর নামে আরম্ভ করা। তবে কোরআন তেলাওয়াতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পুরোটা পড়া এবং অন্যান্য কাজে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বললেই চলবে।

২। ভালো-মন্দ তাক্বদীরে বিশ্বাস করা, যা ঈমানের ছয় উসুলের একটি।

﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (٦) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (٧) إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (٨)﴾ [سورة العلق: ١-٨].

আয়াতাবলীর আলোচ্যবিষয়: কোরআন না পড়ার পরিণতি।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

৬	সাবধান!	নিশ্চয়	মানুষ	সীমালঙ্ঘন করে থাকে।	৭	কারণ, সে নিজেকে মনে করে
	كَلَّا	إِنَّ	الْإِنْسَانَ	لَيَطْغَى		أَنْ رَآهُ

সয়ংসম্পূর্ণ।	৮	হে নবী!) নিশ্চয়	তোমার রবের দিকেই	(সকলের) প্রত্যাবর্তন।	
اسْتَغْنَى		إِنَّ	إِلَى رَبِّكَ	الرُّجْعَى	

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

সাবধান! মানুষের জন্য এটা কখনও ঠিক নয়, তারা কোরআন পড়া ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর প্রতি অহংকার বশতঃ সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত হয়; কারণ তারা আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে নিজেদেরকে সয়ংসম্পূর্ণ মনে করে। হে নবী! আপনি জানিয়ে দিন, নিঃসন্দেহে তারা পুনরুত্থানের মাধ্যমে আপনার রবের সাক্ষাত পেতে বাধ্য হবে এবং সীমালঙ্ঘনের পরিনাম ভোগ করবে। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ৫/৫৯৫, *আল-মোন্তাখাব*, ৯১৭)।

অত্র আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্ক:

অত্র সূরার (১-৫) নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে কোরআন পড়ার প্রতি তাগিদ দিয়েছেন। আর উল্লেখিত তিন আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে যে, মানুষ না পড়ার কারণে সীমালঙ্ঘনকারী হয় এবং আখিরাতে এ সীমালঙ্ঘনের শাস্তি ভোগ করবে। সুতরাং অত্র আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্ক স্পষ্ট।

ছয় নাম্বার আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, একদিন আবু জাহল ব্যঙ্গ করে বলেছিলো: মোহাম্মদ সাজদা করে কপাল ময়লা করে ফেলে? তার জবাবে বলা হলো: হ্যা। তখন সে বললো: লাত ও ওজ্জার শপথ করে বলছি: আমি যদি তাকে ক্বাবার চত্বরে সালাত পড়তে দেখি, তাহলে তার ঘাড় পা দিয়ে পিষ্ট করবো এবং তার মুখ মাটির ভিতর গেড়ে ফেলবো। তখন আল্লাহ তায়ালা অত্র সূরার ছয় নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করে তাকে জানিয়ে দিলেন যে সে একজন সীলঙ্ঘনকারী এবং সে তার সীমালঙ্ঘনের শাস্তি অচিরেই আখিরাতে পাবে। (*লুবাব আল-নুকূল*, ৩৬৪)।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। মানুষ যখন কোরআন পড়ার মাধ্যমে ঈমান ও তাক্বওয়ার দ্বারা উজ্জীবিত হয়, তখন তারা ভারসাম্যপূর্ণ জীবন পরিচালনা করতে পারে। কিন্তু কোরআন পড়া ছেড়ে দিলে তারা আস্তে আস্তে মুর্খ হয়ে যায়। ফলে আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত হয়।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, ৫/৫৯৬) ।

২। ইমাম ফখরুদ্দীন আল-রাযী (র.) বলেন: দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা এবং সম্পদের প্রতি অতিরিক্ত মোহের কারণে মানুষ কোরআন থেকে বিমুখ হয়, কোরআন থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে সে আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে যায় এবং আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ার কারণে সে তাঁর বিধি-নিষেধের সীমলঙ্ঘন করে (*মাফাতিহুল গাইব*, ২০/১৭)। যেমনটা হয়েছে আবু জাহল এর ক্ষেত্রে।

৩। আট নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে: (إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ) অর্থাৎ: সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। এ বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে তা বুঝানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা কোরআনের অনেক জায়গাতে বিভিন্ন সিয়াগা বা ভঙ্গি ব্যবহার করেছেন। যেমন: আল্লাহ তায়ালা কোরআনে তিন বার বলেছেন: (إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُم) অর্থাৎ: “আল্লাহরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন”। আরো তিন জায়গায় এসেছে: (ثمَّ إليه تُرجَعون) অর্থাৎ: “অতঃপর তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে”। কখনও বলেছেন: (ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) অর্থাৎ: “অতঃপর তাঁরই দিকে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে”। কখনও বলেছেন: (ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ) অর্থাৎ: “অতঃপর তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন”। আবার কখনও বলেছেন: (يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيْهِ إِلَى اللهِ) অর্থাৎ: “যে দিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে”। এছাড়াও আবার কখনও পশ্ন-উত্তর পদ্ধতিতে উপস্থাপন করার মাধ্যমে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [سورة المؤمنون: ١١٥].

অর্থাৎ: “তোমরা কি ধারণা করছো আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার দিকে ফিরে আসবে না” (*সূরা মুমিনূন*, ১১৫) ।

যারা আখিরাতকে অস্বীকার করে এবং যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে কিন্তু শয়তানী কুমন্ত্রনায় মাঝেমধ্যে আখিরাত বিষয়ে সন্দেহে পতিত হয় তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন ভঙ্গিতে আখিরাতের বর্ণনা দিয়েছেন। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

আয়াতাবলীর আমল:

১। সর্বদা দুনিয়ার উপর আখিরাতকে গুরুত্বারোপ পূর্বক আল্লাহর কাছে নিজেকে অসহায় হিসেবে উপস্থাপন করা।

২। নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াত করা।

৩। আখিরাতের কথা স্মরণ রাখা।

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (٩) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (١٠) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (١١) أَوْ أَمَرَ
بِالتَّقْوَى (١٢) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٣) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (١٤) كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ
لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (١٥) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (١٦) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (١٧) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (١٨)
كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (١٩)﴾ [سورة العلق: ٩-١٩].

আয়াতাবলীর আলোচ্য বিষয়: সীমালঙ্ঘনকারীকে অনুসরণ না করার নির্দেশ।

আয়াতাবলীর সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

৯	(হে নবী!) তুমি কি তাকে দেখেছো	যে	নিষেধ করে	১০	এক বান্দাকে,	যখন	
	أَرَأَيْتَ	الَّذِي	يَنْهَى		عَبْدًا	إِذَا	
সে সালাত আদায় করে?	১১	তুমি কি মনে কর	যদি	সে থাকে	হিদায়েতের উপর,		
صَلَّى		أَرَأَيْتَ	إِنْ	كَانَ	عَلَى الْهُدَى		
১২	অথবা	নির্দেশ দেয়	তাক্বওয়ার?	১৩	তুমি কি মনে কর	যদি	সে মিথ্যারোপ করে
	أَوْ	أَمَرَ	بِالتَّقْوَى		أَرَأَيْتَ	إِنْ	كَذَّبَ
এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়?	১৪	সে কি জানে না যে	আল্লাহ দেখছেন?	১৫	সাবধান!	যদি	
وَتَوَلَّى		أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ	اللَّهَ يَرَى		كَلَّا	لَئِنْ	
সে ক্ষান্ত না হয়,	তবে তাকে টেনে-হিচঁরে নিয়ে যাব	কপালের চুলের ঝুঁটি ধরে।	১৬	যে কপাল			
لَمْ يَنْتَهِ	لَنَسْفَعًا	بِالنَّاصِيَةِ		نَاصِيَةٍ			
মিথ্যাবাদী,	পাপিষ্ঠ।	১৭	তাই, সে আহবান করুক	পরিষদবর্গকে।	১৮	আমিও ডাকবো	
كَاذِبَةٍ	خَاطِئَةٍ		فَلْيَدْعُ	نَادِيَهُ		سَنَدْعُ	
প্রহরীবর্গকে।	১৯	সাবধান!	(হে নবী!) তুমি কখনো তার অনুসরণ করবে না,	আর সাজদা কর			
الزَّبَانِيَةَ		كَلَّا	لَا تُطِعْهُ	وَاسْجُدْ			
এবং নৈকট্য লাভ কর।							
وَاقْتَرِبْ							

আয়াতাবলীর ভাবার্থ:

হে নবী! আপনি কি সালাতে বাধাদানকারী আবু জাহলের চেয়ে ভয়ঙ্কার অত্যাচারী অন্য কাউকে দেখেছেন?

হে আবু জাহল, আমাকে বলো: তুমি যাকে সালাতে বাধা দাও সে যদি হিদায়েতের উপর থাকে, অথবা যদি সে অন্যকে তাক্বওয়ার দিকে আহবান করে থাকে, তাহলে তুমি কিভাবে তাকে ভয় দেখাচ্ছো এবং সালাতে বাধা দিচ্ছো?
হে নবী! এই বাধাদানকারী যালিমকে আপনি যে দিকে আহবান করছেন তা যদি সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাহলে সে কি জানে না যে তার সকল কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা জানেন?
সাবধান! বিষয়টি এমন নয় যেমনটা আবু জাহল মনে করছে। যদি সে যুলম ও নোংরামির পথ ছেড়ে হেদায়েতের দিকে না আসে, তাহলে তার মাথার কপালের চুল ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, যে কপাল কথায় মিথ্যাবাদী এবং কাজে পাপিষ্ট। সুতরাং এ সীমালঙ্ঘনকারী তার সঙ্গাপাঙ্গদেরকে ডেকে নিক যারা দুনিয়ায় তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করতো আর আমিও জাহান্নামের প্রহরী আযাবের ফেরেশতাদেরকে ডেকে নিব।
সাবধান! বিষয়টি এমন নয় যেমনটা আবু জাহল ভাবছে, সে কোনদিন আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। সুতরাং সে সালাত ত্যাগ করার জন্য যে আহবান করছে তা অনুসরণ করবেন না। বরং আপনার রবের অনুরসণ ও ভালোবাসায় সাজদা করুন এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করুন।
(*সফওয়াতু আল-তাফাসীর*, ৩/৫৫৬, *আল-মোয়াস্সার*, ১/৫৯৭-১৯৮)।

আয়াতাবলীর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الَّذِي يَنْهَى﴾ 'যে ব্যক্তি বাধা দেয়', সকল মুফাসসির একমত যে, আয়াতাংশে 'যে ব্যক্তি' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'আবু জাহল'। সে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সালাত পড়তে বাধা দিয়েছিল।
﴿عَبْدًا﴾ 'একজন বান্দা', সকল মুফাসসিরের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)।
﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى - أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى﴾ :
অর্থাৎ: 'তুমি কি দেখেছ, সে যদি হিদায়েতের উপর থাকে, অথবা যদি সে অন্যকে তাক্বওয়ার দিকে আহবান করে থাকে', অত্র আয়াত দুইটি আবু জাহলকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, যেখানে দুইটি শর্ত রয়েছে এবং 'জাওয়াবে শর্ত' উহ্য আছে। সাবিক লাহিক থেকে বুঝা যায় উহ্য জাওয়াবে শর্তটি হবে: "তাহলে তুমি কিভাবে তাকে ভয় দেখাচ্ছো এবং সালাতে বাধা দিচ্ছো?"। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাড়ায়: "হে আবু জাহল, তুমি যাকে সালাতে বাধা দাও সে যদি হিদায়েতের উপর থাকে, অথবা সে যদি অন্যকে তাক্বওয়ার দিকে আহবান করে থাকে, তাহলে তুমি কিভাবে তাকে ভয় দেখাচ্ছো এবং সালাতে বাধা দিচ্ছো?"।
(*সফওয়াতু আল-তাফাসীর*, ৩/৫৫৬)।
﴿نَادِيَهُ﴾ 'তার ক্লাব', আরবী ভাষায় 'নাদী' এর অর্থ হলো ক্লাব বা পরিষদ, যেখানে মানুষ পরামর্শ করার জন্য একত্রিত হয়। তবে এখানে উদ্দেশ্য হলো: পরিষদবর্গ।
(*গরীব আল-কোরআন*, ইবনু কুতাইবা, ৪৬২)।

উল্লেখিত আয়াতাবলীর সাথে পূবের আয়াতাবলীর সম্পর্ক:

(১-৫) নাম্বার আয়াতে কোরআন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং (৬-৮) নাম্বার আয়াতে মানুষ দুনিয়ার মোহে পড়ে কোরআন তেলাওয়াত ছেড়ে দেওয়ার কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর অত্র আয়াতগুলোতে যারা কোরান বিমুখ হয়ে গোমরাহ হয়েছে তাদের উদাহরণ হিসেবে আবু জাহলের সীমালঙ্ঘনের বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/৩২৪)।

সুরা আলাক্ব এর (৯-১৯) নাম্বার আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) একদিন ক্বাবার চত্বরে সালাত আদায় করতেছিলেন। এমতাবস্থায় আবু জাহল এসে তাকে সালাত থেকে বারণ করেন। তখন আল্লাহ তায়ালা সূরা আলাক্ব এর (৯-১৬) নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে শান্তনা প্রদানের পাশাপাশি আবু জাহলকে আখিরাতের কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) আরো বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) আরেকদিন ক্বাবার চত্বরে সালাত আদায়কালে আবু জাহল এসে বললো: আমি কি তোমাকে এখানে সালাত আদায় করতে নিষেধ করিনি? তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে ধমকের ভাষায় সাবধান করে দিলেন। এতে আবু জাহল ক্রোধান্বিত হয়ে বললো: তুমি কি জানো না মক্কায় দলেবলে শক্তিশালী আমার মত আর কেউ নেই। তার এ দাম্ভিকতার জবাবে আল্লাহ তায়ালা (১৭-১৮) নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করে তাকে হুশিয়ার করে দিলেন যে, তুমি তোমার দলবলের ভয় দেখাচ্ছো, অচিরেই আমি তোমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য জাহান্নামের আযাবের ফেরেশতা ডেকে নিব।

(*লুবাব আল-নুকুল*, সুয়ূতী, ৩৬৪)।

আয়াতাবলীর শিক্ষা:

১। আল্লাহ তায়ালার সাথে বান্দার সবচেয়ে আপন ও গভীর সম্পর্ক হলো দাসত্বের সম্পর্ক। কারণ অন্য সকল সম্পর্ক, যেমন: ঈমানদার হওয়া, মুসলিম হওয়া, রাসূল হওয়া, আল্লাহর ওয়ালী হওয়া ইত্যাদির মূলে হলো আল্লাহর দাসত্ব। আল্লাহর দাসত্বকে না মেনে কেউ ঈমানদার, মুসলিম, রাসূল এবং আল্লাহর ওয়ালী হতে পারে না। এজন্য আল্লাহ তায়ালা কোরআনে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সম্মাননা প্রদান, মূল্যবান কিছু প্রদান এবং বিপদে-আপদে শান্তনা প্রদানের ক্ষেত্রে বান্দা বলে সম্বোধন করেছেন। যেমন:

(ক) সম্মাননা প্রদানের ক্ষেত্রে, সূরা ইসরা এর প্রথম আয়াত।

(খ) মূল্যবান বস্তু প্রদান কালে, যেমন: সূরা কাহ্ফ এর প্রথম আয়াত, সূরা ফুরক্বান এর প্রথম আয়াত।

(গ) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পক্ষে চ্যালেঞ্জ ঘোষণাকালে, যেমন: সূরা বাক্বারা এর ২৩ নাম্বার আয়াত।

(ঘ) দাওয়তি কাজে উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে, যেমন: সূরা হাদীদ এর ৯ নাম্বার আয়াতে এবং সূরা জ্বিন এর ১৯ নাম্বার আয়াত।

(ঙ) শান্তনা প্রদান কালে, অত্র সূরার ১০ নাম্বার আয়াত।
এজন্য একজন মুসলিমের মূল লক্ষ হওয়া উচিৎ আল্লাহর যোগ্য বান্দা হওয়া। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) কে একজনে প্রশংসা করতে আসলে তিনি তাকে বললেন: "নিশ্চয় আমি আল্লাহর দাস, সুতরাং বলো "আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল" (*সহীহ আল-বুখারী*, ৩৪৪৫) ।
২। আবু জাহল রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সালাতে বাধা দেওয়া সহ তার সকল দাওয়াতী কাজে বাধা দিতে থাকলে আল্লাহ তায়ালা (৯-১৯) নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করে তার প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে শান্তনা দিয়েছেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে কেউ কষ্ট দিলে আল্লাহ তায়ালা তা সহ্য করতে পারেন না। এজন্য কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাই রাসূলুল্লাহ (সা.) কে যখনই কেউ কষ্ট দিয়েছেন তখনই আল্লাহ তায়ালা আয়াত অবতীর্ণ করে তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং তাকে শান্তনা দিয়েছেন, যা আমরা সূরা লাহাব, সূরা কাওসার, সূরা হুজুরাত, সূরা হুমাযাহ ইত্যাদি সূরাতে দেখতে পাই।
৩। একজন মানুষ সবচেয়ে বেশী ভালবাসবে আল্লাহ তায়ালাকে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) কে, অতঃপর নিজেকে, অতঃপর পিতামাতাকে, অতঃপর সন্তানকে, অতঃপর পর্যায়ক্রমে অন্যদেরকে। যেমন কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾. [سورة البقرة: ١٦٥].

অর্থাৎ: "কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে. তারা তাদেরকে তেমনি ভালবাসে যেমনটি শুধু আল্লাহকেই ভালবাসা উচিৎ; আর ঈমানদারগণ আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভালো বাসে" (*সূরা বাক্বারা*, ১৬৫) ।
একটি হাদীসে এসেছে, জুহরী ইবনু মা'বাদ তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ. قَالَ عُمَرُ: فَأَنْتَ الْآنَ وَاللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْآنَ يَا عُمَرُ. (أمالي ابن بشران: ٨٨).

অর্থাৎ: "আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে ছিলাম, তিনি ওমরের হাত ধরে চলছিলেন। অতঃপর ওমর বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার জীবনের পরে অন্য সকলকিছুর চেয়ে আমার কাছে বেশী প্রিয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: শপথ সেই সত্বার যার হাতে আমার প্রান, তোমাদের মধ্যে কেউ পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার জীবনের চেয়ে অধিক প্রিয়পাত্র হই। তখন ওমর (রা.) বললেন: আপনি এখন থেকে আমার কাছে আমার জীবনের চেয়ে বেশী প্রিয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: হে ওমর! এতক্ষনে বুঝেছো?" (*আমালি ইবনু বিশরান*, ৮৮) ।
সহীহ আল-বুখারীতে এসেছে, আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. (صحيح البخاري: ١٥).

অর্থাৎ: "তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান এবং সব মানুষের অপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র হই" (*সহীহ আল-বুখারী*, ১৫) ।

সুতরাং একজন মুমিন রাসূলুল্লাহ (সা.) কে তার নিজের জীবনের চেয়েও অধিক ভালবাসবে, এটা ঈমানের দাবী। আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শানে বেআদবী করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে জাহান্নামের প্রহরী ফেরেশতা দিয়ে শাস্তি দিবেন, যা অত্র আয়াত থেকে বুঝা যায়। যারা সত্যিকারে রাসূলকে ভালবাসেন তারা তার অপমানকে কোন অবস্থাতেই মেনে নিতে পারেন না। প্রয়োজনে তার ভালবাসায় জীবন দিতে প্রস্তুত থাকে, যা সাহাবীদের জীবন থেকে পরিলক্ষিত হয়। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

৪। অত্র আয়াতগুলো আবু জাহল সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও এতে তার অনুসারী ইসলাম বিদ্বেষীদের জন্য সতর্কবার্তা এবং মুমিনদের জন্য রয়েছে আশার বানী। সুতরাং আবু জাহলের জন্য আল্লাহ তায়ালা যে পরিণতির ঘোষণা দিয়েছেন কিয়ামত পর্যন্ত যারা ওলামাদের প্রতি অত্যাচার করবে এবং দাওয়াতী কাজে বাধা প্রদান করবে তাদের জন্য একই পরিণতি অপেক্ষা করছে। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/৩২৮) ।

৫। (১১-১৪) নাম্বার আয়াতের তিনভাবে অর্থ করা যায়:

(ক) তিনটি শর্ত বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন 'জাওয়াবে শর্ত' রয়েছে, আয়াতগুলোর অর্থ দাড়ায়: "হে নবী! আপনি কি দেখেছেন, সে যদি হিদায়েতের উপর থাকে, তাহলে কিভাবে আপনাকে সালাত আদায় করতে বাধা দেয়, অথবা যদি সে অন্যকে তাক্বওয়ার দিকে আহবানকারী হয়, তাহলে কিভাবে তাক্বওয়ার পথে বাধা দেয়? এই বাধাদানকারী যালিমকে যে দিকে আহবান করছেন তা যদি সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাহলে সে কি জানে না যে তার সকল কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা জানেন?"। (*আল-মোয়াস্সার*, ১/৫৯৭-৫৯৮) । উল্লেখ্য যে, পুরো কথা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে।

(খ) প্রথম দুইটি শর্ত বাক্যের 'জাওয়াবে শর্ত' একটি এবং তৃতীয় শর্ত বাক্যের 'জওয়াবে শর্ত' একটি, আয়াতগুলোর অর্থ দাড়ায়: "হে আবু জাহল, আমাকে বলো: তুমি যাকে সালাতে বাধা দাও সে যদি হিদায়েতের উপর থাকে, অথবা যদি সে অন্যকে তাক্বওয়ার দিকে আহবান করে থাকে, তাহলে তুমি কিভাবে তাকে ভয় দেখাচ্ছো এবং সালাতে বাধা দিচ্ছো? হে নবী! এই বাধাদানকারী যালিমকে আপনি যে দিকে আহবান করছেন তা যদি সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাহলে সে কি জানে না যে তার সকল কর্ম আল্লাহ তায়ালা দেখেন?" (*সফওয়াতু আল-তাফাসীর*, ৩/৫৫৬) । প্রথমাংশ আবু জাহলকে এবং দ্বিতীয় অংশ রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে।

(গ) তিনটি শর্ত বাক্যের 'জাওয়াবে শর্ত' হলো ১৪ নাম্বার আয়াত, আয়াতগুলোর অর্থ দাড়ায়: "হে নবী! আপনি কি দেখছেন যদি আবু জাহল সৎপথের অনুসারী হয়, অথবা সে যদি তাক্বওয়া অবলম্বন করে, অথবা সে যদি হিদায়েত এবং তাক্বওয়াকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে সে কি জানে না আল্লাহ তার সকল কর্ম দেখেন এবং সে অনুযায়ী প্রতিদান দিবেন"?। (*তাফাসীর আল-মুনীর*, ৩০/৩২২) । পুরো কথা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে।

৬। (১৮-১৯) নাম্বার আয়াত থেকে বুঝা যায় ইসলাম বিদ্বেষী শক্তি যতই বড় হোক না কেন এবং তাদের কর্তৃক যতই যুলম-নির্যাতন চালানো হোক না কেন ইসলামের মৌলিক বিষয়ে তাদের অনুসরণ করা যাবে না। বরং এ পরিস্থিতিতে ইবাদতবন্দেগীতে মনোনিবেশ করতে হবে এবং আল্লাহর কুদরতি চরণে সাজদায় লুটিয়ে পড়ে তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কারণ সাজদা হলো মনিব এবং দাসের মধ্যকার সম্পর্কের সর্বোচ্ছ স্তর। রাসূলুল্লাহ (সা.) তার উম্মতকে সাজদার মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হয়ে দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ. (صحيح مسلم: ١١١١).

অর্থাৎ: “বান্দা তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় যখন সে সজদায় থাকে, সুতরাং সাজদায় গিয়ে তোমরা বেশীবেশী দোয়া কর” (*সহীহ মুসলিম*, ১১১১) ।

আয়াতাবলীর আমল:

১। দাওয়াতী কাজে বিরোধীতা না করে যথাসম্ভব সহযোগিতা করা।
২। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নিজের জীবনের চেয়েও বেশী ভালবাসা।
৩। কাফির-মুশরিকদের অনুসরণ না করা।

(سُوْرَةُ الْقَدْر)

সূরা ক্বাদ্‌র এর পরিচয়:

সূরার নাম:
এ সূরার দুইটি নাম পাওয়া যায়: (ক) সূরাতু আল-ক্বাদ্‌র, (খ) সূরাতু লাইলাতু আল-ক্বাদ্‌র। (*নাযমুদ দুরার*, ৮/৪৯০, *তাফসীর ইবনু আতিয়্যাহ*, ৫/৫০৪) ।

আলোচ্যবিষয়: লাইলাতুল ক্বাদ্‌র এর ফযিলত এবং কোরআন অবতীর্ণের সূচনা।

সূরার ফযিলত: এ সূরাটি লাইলাতুল ক্বাদ্‌র এর মর্যাদা বর্ণনা করেছে। এছাড়াও অত্র সূরাটি মুফাস্‌সালাত এর অন্তভূক্ত। মুফাস্‌সাল সূরার ফযিলত সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন:
(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].
অর্থাৎ: “প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, আর কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্‌সাল সূরাগুলো”।
(*সুনানে দারিমী*, ৪৩২০) ।
আরো একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةِ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].
অর্থাৎ: “আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিসিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিষিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্‌সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি”। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪) ।
হাদীসে মুফাস্‌সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ৯৭তম সূরা।

অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ২৪তম সূরা, যা ‘সূরা আবাসা’ এর পরে এবং ‘সূরা শাম্‌স’ এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

অবতীর্ণের স্থান: মক্কা, অথবা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। অধিকাংশ ওলামার মতে, সূরা মাক্কিয়্যাহ। (*বিতাকাত আল-তারীফ*, ৩৩৫) ।

আয়াত সংখ্যা: ৫টি।
অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: এ সূরাটি অবতীর্ণের একটি প্রেক্ষাপট পাওয়া যায়, যা সূরার ব্যাখ্যায় আসবে, ইনশাআল্লাহ।

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ
(٣) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
(٥)﴾ [سورة القدر].

সূরার আলোচ্য বিষয়: লাইলাতুল ক্বাদ্‌র এর ফযিলত এবং কোরআন অবতীর্ণের সূচনা।

সূরার সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১	নিশ্চয় আমি	এটি (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি	ক্বদরের রাতে।	২	আপনি কি জানেন
	إِنَّا	أَنْزَلْنَاهُ	فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ		وَمَا أَدْرَاكَ

‘লাইলাতুল ক্বদর’ কি?	৩	‘লাইলাতুল ক্বদর’	হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।	৪	অবতীর্ণ হন
مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ		لَيْلَةُ الْقَدْرِ	خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ		تَنَزَّلُ

ফেরেশতারা	ও রূহ (জিবরীল)	সে রাতে	তাদের রবের অনুমতিক্রমে	সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে।
الْمَلَائِكَةُ	وَالرُّوحُ	فِيهَا	بِإِذْنِ رَبِّهِمْ	مِنْ كُلِّ أَمْرٍ

৫	শান্তিময় সেই রাতটি,	ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত (স্থায়ী হয়)।	
	سَلَامٌ هِيَ	حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ	

সূরার ভাবার্থ:

১। আমি পুরো কোরআনকে রমযান মাসের ক্বদর রাতে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ করে সেখান থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী দীর্ঘ তেইশ বছরে পর্যায়ক্রমে মোহাম্মদের (সা.) উপর অবতীর্ণ করেছি।

২। হে নবী! আপনি কি ‘লাইলাতুল ক্বদর’ এর ফযিলত সম্পর্কে জানেন?

৩। ‘লাইলাতুল ক্বদর’ খুবই বরকতপূর্ণ রাত, যে রাতের নেকআমল সাধারণ রাতের হিসেবে এক হাজার মাস তথা তিরাশি বছর চার মাস নেকআমলের চেয়ে উত্তম।

৪। এ রাতে জিবরীল (আ.) অসংখ্য ফেরেশতা নিয়ে আল্লাহর অনুমতিক্রমে আগত বছরের তাঁর গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে।

৫। সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এ মহিমান্বিত রাতের শান্তি পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

(*আইসার*, ৫/৫৯৭, *আল-মোন্তাখাব*, ৯১৯, *আল-মোয়াস্‌সার*, ১/৫৯৮)।

সূরার অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ ‘নিশ্চয় আমি তা অবতীর্ণ করেছি’ এখানে ‘সর্বনাম’ দ্বারা ‘কোরআন’ উদ্দেশ্য।

﴿وَالرُّوحُ﴾ ‘রূহ’ দ্বারা জিবরীল (আ.) কে বুঝানো হয়েছে।

﴿مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ ‘সকল বিষয়’ দ্বারা আগত বছরের মানুষের তাক্বদীরকে বুঝানো হয়েছে।

(*আইসার*, ৫/৫৯৭, *আল-হাদী ইলা তাফসীরে গরীব আল-কোরআন*, ২৯২)।

অত্র সূরার সাথে পূর্বের সূরার সম্পর্ক:

পূর্বের সূরা তথা সূরা আলাক্ব এ মোহাম্মদ (সা.) কে এক আল্লাহর নামে কোরআন পড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যিনি মানুষকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন যা তারা জানতো না। আর অত্র সূরা তথা সূরা ক্বাদর এ কোরআন অবতীর্ণের দিন-তারিখ এবং তার মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং উভয় সূরার মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট।

(*তাফসীর মাওজুয়ী*, ১০/২৬৩) ।

অত্র সূরার সাথে পরের সূরার সম্পর্ক:

আল্লাহ তায়ালা সূরা ক্বাদ্‌র এ কোরআন অবতীর্ণের দিন-তারিখ এবং তার মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন আর পরবর্তী সূরা তথা সূরা বায়্যিনাহ এ কুফর-শিরক এবং পূর্ববর্তী ধর্ম থেকে বিরত থেকে কোরআনের অনুসরণকে মুক্তির একমাত্র উপায় হিসেবে তুলে ধরেছেন। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

সূরাটি অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি রাতভর আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করতো এবং দিনের বেলায় আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতো। এভাবে নিয়মিত এক হাজার মাস পালন করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে কিভাবে আপনার উম্মত তাদের চেয়ে উত্তম হয়? তখন আল্লাহ তায়ালা অত্র সূরা অবতীর্ণ করে জানিয়ে দিলেন তারা সশরীরে ময়দানে উপস্থিত হয়ে যা অর্জন করেছে, তোমরা এক রাত তথা লাইলাতুল ক্বাদ্‌র এ ইবাদত-বন্দেগী করলে তার চেয়ে বেশী অর্জন করতে পারবে। (*লুবাব আল-নুকূল*, ৩৬৫) ।

সূরার শিক্ষা:

১। 'লাইলাতুল ক্বাদর' এ কোরআন অবতীর্ণের দুইটি অর্থ রয়েছে:

(ক) আল্লাহ তায়ালা এ রাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এ উপর কোরআন অবতীর্ণ শুরু করেছেন। এরপর সুদীর্ঘ ২৩ বছরে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিপূর্ণ কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর সর্বপ্রথম অহী আসে রমযান মাসে। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/৩৩১) ।

(খ) আল্লাহ তায়ালা এ রাতে পুরো কোরআন প্রথম আসমানে অবতীর্ণ করেছেন। এরপর সেখান থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী দীর্ঘ তেইশ বছরে পর্যায়ক্রমে মোহাম্মদের (সা.) উপর অবতীর্ণ হয়েছে। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ৫/৫৯৭) ।

২। প্রথম আয়াতে তিনটি ইঙ্গিত রয়েছে, যা কোরআনের মহত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ:

(ক) কোরআন অবতীর্ণের কাজকে আল্লাহ তায়ালা তার নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন।
(খ) সরাসরি কোরান শব্দটি উল্লেখ না করে তার সর্বনাম ব্যবহার করেছেন।
(গ) কোরআন অবতীর্ণের সময়টি নির্দিষ্ট না করে গোপন রেখেছেন।

(*তাফসীর আল-কাশশাফ*, ৩/৩৫১) ।

৩। ‘লাইলাতুল ক্বাদ্‌র’ এর ফযিলত:

অত্র সূরায় ‘লাইলাতুল ক্বাদ্‌র’ এর তিনটি ফযিলত বর্ণিত হয়েছে:

(ক) এ রাতের নেকআমল সাধারণ রাতের হিসেবে এক হাজার মাস তথা তিরাশি বছর চার মাস নেকআমলের চেয়ে উত্তম।

(খ) এ রাতে জিবরীল (আ.) অসংখ্য ফেরেশতা নিয়ে আল্লাহর অনুমতিক্রমে আগত বছরের তাঁর গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে।

(গ) সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্র শান্তি ছড়িয়ে পড়ে।

(*তাফসীর মাওজুয়ী*, ১০/২৬৪-২৬৬) ।

(ঘ) চার নং আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে এ রাতে পরবর্তী বছরের জন্য ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয়।

সহীহ হাদীসে ‘লাইলাতুল ক্বাদ্‌র’ এর আরো একটি ফযিলত পাওয়া যায়:

(ঙ) এ রাতে ইবাদত-বন্দেগী করলে পিছনের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) [صحيح البخاري: ١٩٠١].

অর্থাৎ: “যে ব্যক্তি ক্বদরের রাতে ইবাদত-বন্দেগী করে তার পিছনের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয় এবং যে ব্যক্তি রমযান মাসে সিয়াম পালন করে তারও পিছনের সকল গুনাহ মাপ করে দেওয়া হয়” (সহীহ আল-বুখারী, ১৯০১) ।

৪। ‘লাইলাতুল ক্বাদ্‌র’ কখন অনুষ্ঠিত হয়?

অত্র সূরায় ‘লাইলাতুল ক্বাদ্‌র’ কোন তারিখে হবে উল্লেখ করা হয় নাই। অনুরূপভাবে সূরা বাক্বারা এর ১৮৫ নাম্বার আয়াত এবং সূরা দুখানের তিন নাম্বার আয়াতে লাইলাতুল ক্বাদ্‌র সম্পর্কে আলোচনা করা হলেও সেখানে কোন নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করা হয় নাই। তবে কিছু হাদীসে দেখতে পাই রাসূলুল্লাহ (সা.) রমযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে লাইলাতুল ক্বাদ্‌র অন্বেষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: (تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوِتْرِ، مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ) [صحيح البخاري: ٢٠١٧].

অর্থাৎ: আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “তোমরা লাইলাতুল ক্বাদ্‌র রমযানের শেষ দশ দিনের বিজোড় রাতে তালাশ করো” (*সহীহ আল-বুখারী*, ২০১৭) ।

আবার কিছু হাদীসে দেখতে পাই রাসূলুল্লাহ (সা.) রমযানের শেষ সাত রাতে ‘লাইলাতুল ক্বাদ্‌র’ তালাশ করতে বলেছেন। যেমন:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي المَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ) [صحيح البخاري: ٢٠١٥].

অর্থাৎ: “আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) হতে বর্ণিত, কিছু সাহাবী রমযানের শেষ সাত দিনের মধ্যে লাইলাতুল কাদ্‌র হওয়ার ব্যাপরে স্বপ্ন দেখলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: আমিও

একই স্বপ্ন দেখেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি এ রাত তালাশ করতে চায়, সে যেন রমযানের শেষ সাত দিনে তালাশ করে" (*সহীহ আল-বুখারী*, ২০১৫)।
এবং কিছু হাদীসে দেখা যায় রাসূলুল্লাহ (সা.) রমযানের ২৭ তারিখকে 'লাইলাতুল ক্বাদ্‌র' বলেছেন। যেমন:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ) [مسند أحمد: ٤٨٠٨].

অর্থাৎ: আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বাদ্‌র তালাশ করে, সে যেন ২৭ শে রমযানকে লাইলাতুল ক্বাদ্‌র হিসেবে গ্রহণ করে" (*মুসনাদে আহমাদ*, ৪৮০৮, সহীহ)। যির্‌রা ইবনু হুবাইস থেকে একটি হাদীসে এসেছে:

(سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ - رضى الله عنه - فَقُلْتُ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَرَادَ أَنْ لاَ يَتَّكِلَ النَّاسُ أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. ثُمَّ حَلَفَ لاَ يَسْتَثْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ فَقُلْتُ بِأَيِّ شيءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ قَالَ بِالْعَلاَمَةِ أَوْ بِالآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لاَ شُعَاعَ لَهَا) [صحيح مسلم: ٢٨٣٤].

অর্থাৎ: "যির্‌রা ইবনু হুবাইশ বলেন: আমি উবাই ইবনু কা'বকে (রা.) জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন: যে ব্যক্তি সারা বছর প্রতি রাতে জাগতে পারবে সে-ই লাইলাতুল ক্বাদ্‌র পাবে। অতঃপর উবাই (রা.) বললেন: আল্লাহ তাকে রহম করুন! এ কথা দ্বারা তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে, মানুষ যেন এর উপর ভরসা করে নিশ্চেষ্ট না থাকে। অন্যথায় তিনি অবশ্যই জানেন যে, তা রমযান মাসে রমযানের শেষের দশ রাতে অর্থাৎ সাতাশের রাতে। তিনি (উবাই) শপথ করে বললেন: ক্বাদ্‌র নিশ্চয় সাতাশের রাতে। তখন আমি (যির্‌রা) বললাম: হে আবু মুনজির! আপনি এ কথা কোন সূত্রে বলছেন? জবাবে তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে যে আলামত বলেছেন সেই সূত্রে। আর তা হলো: যে রাতে ক্বাদ্‌র অনুষ্ঠিত হয় পরের দিন সকালে যে সূর্য উদিত হয় তার কিরণ থাকে না" (সহীহ মুসলিম, ২৮৩৪)।
উপরোল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের আলোকে বলা যায় যে, 'লাইলাতুল ক্বাদ্‌র' শেষ দশ রাতের যে কোন একটি রাত, তবে ২৭ তারিখ রাত 'লাইলাতুল ক্বাদ্‌র' হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা। (আল্লাহই ভালো জানেন)।
৫। কোন রাত্রিটি 'লাইলাতুল ক্বদ্‌র' তা বোঝার জন্য কিছু নিদর্শন আছে: (ক) এ রাতে আকাশ মেঘলা থাকে ও সামান্য বৃষ্টি হয় এবং (খ) পরদিন সকালের সূর্যের রং লাল হয় ও কিরণ থাকে না। ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) 'লাইলাতুল ক্বাদ্‌র' সম্পর্কে বলেছেন:

لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ طَلْقَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، يُصْبِحُ شَمْسُهَا صَبِيحَتَهَا ضَعِيفَةً حَمْرَاءَ. [شعب الإيمان للبيهقي: ٣٤١٩].

অর্থাৎ: "একটি মনোরম রাত, গরম বা ঠান্ডা নয় এবং যার সূর্য সকালে দুর্বল ও লাল হয়ে যায়" (*শুয়াবুল ঈমান*, আল-বায়হাকী, ৩৪১৯)।

৬। 'লাইলাতুল ক্বাদ্‌র'কে গোপন রাখার হিকমাত হলো: এক রাতের উপর নির্ভর না করে 'লাইলাতুল ক্বাদ্‌র'কে খুজতে গিয়ে মানুষ যেন অলসতা ছেড়ে ইবাদত-বন্দেগীতে বেশী সময় মনযোগ দিতে পারে। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/৩৩৮)।

সূরার আমল:

রমযানের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতে লাইলাতুল ক্বাদর উদযাপন করা।

(سُوْرَةُ الْبَيِّنَة)

সূরা বাইয়্যিনাহ এর পরিচয়:

সূরার নাম: এ সূরার অনেকগুলো নাম পাওয়া যায়, যেমন: (ক) সূরাতু আল-বাইয়্যিনাহ, (খ) সূরাতু লাম ইয়াকুন, (গ) সূরাতু আল-মুনফাক্কীন, (ঙ) সূরাতু আহলিল কিতাব, (চ) সূরাতু আল-বারিয়্যাহ এবং (ছ) আল-ক্বাইয়্যিমাহ। মূলত: এ শব্দগুলো সূরার মধ্যে থাকার কারণে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে এ নামগুলো রাখা হয়েছে। (*তাফসীর মাওজুয়ী*, ১০/২৬৭) ।

আলোচ্যবিষয়: আখিরাতে কাফিরের পরিণাম এবং মুমিনের পুরস্কার।

সূরার ফযিলত: আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) উবাই ইবনু কা’ব কে বললেন:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأُبَيٍّ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ﴾ [البينة: ١]، قَالَ: وَسَمَّانِي؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَبَكَى. (صحيح البخاري: ٣٨٠٩).

অর্থাৎ: “রাসূলুল্লাহ (সা.) উবাই ইবনু কা’বকে বললেন: আল্লাহ ‘সূরা বাইয়্যিনাহ’ তোমাকে পড়ে শুনানোর জন্য আমাকে আদেশ করেছেন। উবাই ইবনু কা’ব জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ কি আমার নাম উল্লেখ করেছেন? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: হ্যা। তখন তিনি আনন্দে কেঁদে ফেললেন” (*সহীহ আল-বুখারী*, ৩৮০৯) ।

এছাড়াও অত্র সূরাটি মুফাস্সালাত এর অন্তর্ভুক্ত। মুফাস্সাল সূরার ফযিলত সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন:

(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].

অর্থাৎ: “প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, আর কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্সাল সূরাগুলো”।

(*সুনানে দারিমী*, ৪৩২০) ।

আরো একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةِ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].

অর্থাৎ: “আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিসিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিষিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি”। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪) ।

হাদীসে মুফাস্সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ৯৮তম সূরা।

অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ১০০তম সূরা, যা ‘সূরা ত্বালাক্ব’ এর পরে এবং ‘সূরা হাশর’ এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

অবতীর্ণের স্থান: মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা মাদানিয়্যাহ। (*বিতাকাত আল-তারীফ*, ৩৩৫) ।

আয়াত সংখ্যা: ৮টি।

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: এ সূরাটি অবতীর্ণের কোন প্রেক্ষাপট পাওয়া যায় না।

﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (١) رَسُولٌ مِنَ
اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً (٢) فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (٣) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (٤) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (٥) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ
جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ
خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (٧) جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (٨)﴾ [سورة البينة: ١-٨].

সূরার আলোচ্য বিষয়: আখিরাতে কাফিরের পরিণাম এবং মুমিনের পুরস্কার।

সূরার সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১	এমন নয় যে	যারা কুফরী করে	আহলে কিতাব	এবং মুশরিকদের মধ্য হতে		
	لَمْ يَكُنِ	الَّذِينَ كَفَرُوا	مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ	وَالْمُشْرِكِينَ		
তারা বিরত থাকবে (কুফরী থেকে),	যতক্ষণ পর্যন্ত না	তাদের কাছে আসে	সম্পষ্ট প্রমাণ।			
مُنْفَكِّينَ	حَتَّىٰ	تَأْتِيَهُمُ	الْبَيِّنَةُ			
২	একজন রাসূল	আল্লাহর পক্ষ থেকে	তিলাওয়াত করবে	পবিত্র গ্রন্থ।	৩	যাতে আছে
	رَسُولٌ	مِنَ اللَّهِ	يَتْلُو	صُحُفًا مُطَهَّرَةً		فِيهَا
সরল-সঠিক বিধান।	৪	বিভক্ত হয়েছে	আহলে কিতাবগণ	তাদের কাছে আসার পর		
كُتُبٌ قَيِّمَةٌ		وَمَا تَفَرَّقَ	الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ	إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ		
স্পষ্ট প্রমাণ।	৫	আর তারা আদিষ্ট হয়েছিলো	কেবল	আল্লাহর ইবাদত করতে		
الْبَيِّنَةُ		وَمَا أُمِرُوا	إِلَّا	لِيَعْبُدُوا اللَّهَ		
একনিষ্ঠভাবে	তাঁর আনুগত্যে	বিশুদ্ধচিত্তে,	সালাত কায়েম করতে	এবং যাকাত দিতে;		
مُخْلِصِينَ	لَهُ الدِّينَ	حُنَفَاءَ	وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ	وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ		
আর এটাই হলো	সঠিক ধর্ম।					
وَذَٰلِكَ	دِينُ الْقَيِّمَةِ					

৬	নিশ্চয়	যারা কুফরী করেছে	আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে	এবং মুশরিকরা	
	إِنَّ	الَّذِينَ كَفَرُوا	مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ	وَالْمُشْرِكِينَ	
জাহান্নামের আগুনে থাকবে	স্থায়ীভাবে,	তারাই হলো	নিকৃষ্ট সৃষ্টি।	৭	নিশ্চয় যারা
فِي نَارِ جَهَنَّمَ	خَالِدِينَ فِيهَا	أُولَٰئِكَ هُمْ	شَرُّ الْبَرِيَّةِ		إِنَّ الَّذِينَ
ঈমান এনেছে	এবং সৎআমল করেছে	তারাই	সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ।	৮	তাদের পুরস্কার হবে
آمَنُوا	وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ	أُولَٰئِكَ هُمْ	خَيْرُ الْبَرِيَّةِ		جَزَاؤُهُمْ
তাদের রবের কাছে	স্থায়ী জান্নাত,	যার পাদদেশে প্রবাহমান রয়েছে	নহরসমূহ		
عِنْدَ رَبِّهِمْ	جَنَّاتُ عَدْنٍ	تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا	الْأَنْهَارُ		
সেখানে তারা থাকবে স্থায়ীভাবে।	আল্লাহ সন্তুষ্ট	তাদের প্রতি	এবং তারাও সন্তুষ্ট		
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا	رَضِيَ اللَّهُ	عَنْهُمْ	وَرَضُوا		
তাঁর প্রতি,	এ (প্রতিদান)	তার জন্য	যে ভয় করে	তার রবকে।	
عَنْهُ	ذَٰلِكَ	لِمَنْ	خَشِيَ	رَبَّهُ	

সূরার ভাবার্থ:

(১) ইহুদী-খৃষ্টান এবং মুশরিকরা কুফ্‌র এবং শিরক থেকে ফিরে আসে নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত না মোহাম্মদ (সা.) তাদের নিকট পবিত্র কোরআন সহ এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং তাদের ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতা ব্যক্ত করে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করেছেন।

(২,৩) মোহাম্মদ (সা.) আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়ে তাদের নিকট এমন পবিত্র গ্রন্থ তিলাওয়াত করেছেন যাতে রয়েছে সরল-সঠিক তথা মধ্যমপন্থী বিধান।

(৪) ইহুদী-খৃষ্টানরা মোহাম্মদ (সা.) এর সত্য নবী হওয়ার বিষয়ে তাওরাত-ইনজীল থেকে নিশ্চিতভাবে অবগত হওয়ার পরও তার বিষয়ে মতবিরোধ করেছে ঠিক সে সময়, যখন তারা দেখলো তিনি তাদের মধ্য থেকে প্রেরিত না হয়ে কোরাইশ গোত্র থেকে প্রেরিত হয়েছে। ফলে তাদের একদল তাকে নবী হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং আরেকদল তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

(৫) অথচ আহলে কিতাব সহ পূর্ববর্তী সকল উম্মত তিনটি বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছিলো: (ক) শিরক ও কুফরী থেকে পুতপবিত্র আত্মা নিয়ে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা, (খ) সালাত কায়েম করা এবং (গ) যাকাত আদায় করা। আর এটাই হলো মধ্যমপন্থী ধর্ম ইসলাম।

৬। নিশ্চয় ইহুদী-খৃষ্টান এবং মুশরিকদের মধ্য থেকে যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং কোরআনকে অস্বীকার করে তারা অচিরেই আখিরাতে জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে জ্বলতে থাকবে, তারাই হলো নিকৃষ্ট সৃষ্টি।

৭। আর যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং কোরআনের প্রতি ঈমান আনে এবং সৎআমল করে তারাই সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

৮। রবের কাছে তাদের পুরস্কার হবে এমন স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত রয়েছে, যেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের ঈমান ও সৎআমলের কারণে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে পুরস্কৃত করবেন এবং তারাও পুরস্কার পেয়ে আল্লাহ তায়ালার প্রতি সন্তুষ্ট হবে। এ প্রতিদান তাদের জন্য যারা তাকওয়া ভিত্তিক জীবন গড়ে।

(*আহসানুল বয়ান*, ১০৯৭, *আল-মোন্তাখাব*, ৯২০, *আল-মোয়াস্সার*, ১/৫৯৮-৫৯৯)।

সূরার অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الْبَيِّنَةُ﴾ প্রথম এবং চতুর্থ আয়াতে এ শব্দটি এসেছে, যার অর্থ ‘স্পষ্ট প্রমাণ’। অত্র সূরায় এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: আল্লাহর পক্ষ থেকে মোহাম্মদ (সা.) রাসূল হিসেবে প্রেরিত হওয়া।

(*তাফসীর আল-ওয়াসীত*, ১৫/৪৫৯-৪৬০)।

﴿رَسُولٌ﴾ ‘একজন রাসূল’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)।

﴿صُحُفًا مُطَهَّرَةً﴾ ‘পবিত্র পান্ডুলিপি’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: কোরআনুল কারীম।

﴿كُتُبٌ قَيِّمَةٌ﴾ ‘মধ্যমপন্থী কিতাব’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ‘মধ্যমপন্থী বিধান’।

﴿حُنَفَاءَ﴾ অর্থাৎ: শিরক-কুফরী এবং পূর্ববর্তী সকল ধর্ম থেকে বিরত থেকে ইসলাম মুখী হওয়া।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, ৫/৫৯৯-৬০০)।

সূরা বায়্যিনাহ এর সাথে সূরা যিলযাল এর সম্পর্ক:

সূরা বায়্যিনাহ এ আল্লাহ তায়ালা মানুষের মুক্তির উপায় বর্ণনার পাশাপাশি মুমিনদের পুরস্কার এবং কাফিরদের তিরষ্কার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আর ‘সূরা যিলযাল’ এ তারা পুরস্কার এবং তিরষ্কার কোথায় কিভাবে পাবে সে বিষয়ে কথা বলেছেন। সুতরাং উভয় সূরার মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট। (*তাফসীর আল-সাওজুয়ী*, ১০/২৮৭)।

সূরা বায়্যিনাহ এর সাথে সূরা ক্বদর এর সম্পর্ক:

আল্লাহ তায়ালা সূরা ক্বদর এ কোরআন অবতীর্ণের দিন-তারিখ এবং মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন আর সূরা বায়্যিনাহ এ কুফর-শিরক এবং পূর্ববর্তী ধর্ম থেকে বিরত থেকে কোরআনের অনুসরণকে মুক্তির উপায় হিসেবে তুলে ধরেছেন। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

সূরার শিক্ষা:

১। আল্লাহ তায়ালা অত্র সূরার প্রথম চার আয়াতে একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ঘটনাটি হলো: ইহুদী-খৃষ্টান এবং মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আগমণের পূর্বে বলে বেড়াতো যে, তাওরাত এবং ইনজীল এ অঙ্গীকারকৃত নবী মোহাম্মদ (সা.) না আসা পর্যন্ত আমরা আমাদের দ্বীন থেকে ফিরে আসবো না। এমনকি তারা যুদ্ধের ময়দানেও মোহাম্মদ (সা.) এর ওয়াসীলা দিয়ে বিজয়ের জন্য দোয়া করতো। কিন্তু মোহাম্মদ (সা.) এর আগমণ হলে, তিনি তাদের গোত্রের না হয়ে ভিন্ন গোত্রের হওয়ার কারণে তাদের একদল তাকে প্রত্যাখ্যান করলো এবং কিছুসংখ্যক তাকে নবী হিসেবে গ্রহণ করলো। (*তাফসীর আল-কাশ্শাফ*, ৪/৭৮২)। এ ঘটনা সূরা বাক্বারার ৮৯ নাম্বার আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

২। পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আহলে কিতাব ও মুশরিকদের হটকারিতার উত্তর দিয়েছেন, তারা মূলত তিনটি বিষয়ের জন্য আদিষ্ট হয়েছিলো: (ক) শিরক ও কুফরী থেকে পুতপবিত্র আত্মা নিয়ে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা, (খ) সালাত কায়েম করা এবং (গ) যাকাত আদায় করা। কিন্তু তারা হিংসার বশবর্তী হয়ে এ বিষয়গুলোকে অমান্য করে পথভ্রষ্ট হয়েছে। (*আহসানুল বয়ান*, ১০৯৭, *তাফসীর মুয়াস্‌সার*, ১/৫৯৮) ।

৩। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মতে, ঈমান হলো অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি এবং আমলে বাস্তবায়নের নাম। তারা অত্র সূরার পঞ্চম আয়াত দিয়ে দলীল পেশ করেন। এখানে বিশ্বাস, স্বীকৃতি এবং আমলকে দ্বীন বলা হয়েছে। আর দ্বীন হলো ইসলাম এবং ইসলাম হলো ঈমান। সুতরাং ঈমান হলো অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি এবং আমলে বাস্তবায়নের নাম।
(*তাফসীরুল কাবীর*, ৩২/২৪৫) ।

৪। ইমাম আবু বকর আল-জাজ্বায়িরী (র.) বলেন: চারটি আমল মানুষকে মুক্তি দিবে:
(ক) শিরক ও কুফরী থেকে পুতপবিত্র আত্মা নিয়ে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা।
(খ) পূর্ববর্তী ধর্ম থেকে ফিরে এসে ইসলামে প্রবেশ করা।
(গ) সালাত কায়েম করা।
(ঘ) যাকাত আদায় করা। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ৫/৬০১) ।

৫। অত্র সূরার (৬-৮) নাম্বার আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) ও কোরআনকে বিশ্বাস করে না এবং তাকওয়া ভিত্তিক জীবন গড়ে না তাদের দুইটি পরিণতি:
(ক) তারা সৃষ্টি জগতের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসেবে বিবেচিত হবে।
(খ) আখিরাতে তাদের আবাসস্থল হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম।
অপরদিকে যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) ও কোরানকে বিশ্বাস করে এবং তার নির্দেশিত পথে তাকওয়া ভিত্তিক জীবন গড়ে তাদের জন্য তিনটি পুরস্কার রয়েছে:
(ক) তারা সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বিবেচিত হবে।
(খ) আখিরাতে তাদের আবাসস্থল হবে চিরস্থায়ী জান্নাত।
(গ) আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে।
(*সফওয়াতুত তাফাসীর*, ৩/৫৮৬) ।

৬। মুমিনদের পুরস্কার বর্ণনার পূর্বে কাফিরদের পরিণতি বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা একটি চিরাচারিত নিয়মের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, তা হলো: “কল্যান প্রবাহিত করার চেয়ে ক্ষতি প্রতিহত করা উত্তম”। (*তাফসীর মাওজুয়ী*, ১০/২৭৭) ।

৭। এ সূরাতে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা) এর আগমণের সুসংবাদ এবং তাকে অমান্য করার শাস্তির বর্ণনা আল্লাহ তায়ালা পূর্ববতী আসমানী কিতাবে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার নিয়ম হলো কাউকে দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্বে বিবৃতি দেওয়া এবং কাউকে শাস্তি দেওয়ার পূর্বে তাকে সতর্ক করা। এটা থেকে মানব জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা হলো: বিবৃতি ছাড়া দায়িত্ব প্রদান অর্থহীন ও সতর্কবাণী ছাড়া শাস্তি প্রদান অযৌক্তিক। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

(سُورَةُ الزَّلْزَلَةِ)

সূরা যিলযাল এর পরিচয়:

সূরার নাম: (ক) সূরাতু আল-যালযালাহ (তাওকীফী নাম), কিছু মুসহাফ এবং তাফসীর গ্রন্থে সূরাটি এ নামে পরিচিতি লাভ করেছে। (খ) সূরাতু 'ইজা যুলযিলাত' (তাওকীফী নাম), আনাস এবং ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত দুইটি হাদীসে এ নাম এসেছে। (গ) সূরাতু আল-যিলযাল (ইজতিহাদী নাম), কতিপয় মোফাসসির এবং কিছু মুসহাফে এ নামটি এসেছে। (ঘ) সূরাতু যালযালাত (ইজতিহাদী নাম), কিছু মুসহাফে এবং ইমাম সাখাভী (র.) এ নাম ব্যবহার করেছেন। (*তাফসীর মাওজুয়ী*, মোস্তফা মুসলিম, ১০/২৮১-২৮২) ।

সূরার আলোচ্যবিষয়: কিয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মানুষের ভালো-মন্দ কর্ম উন্মোচন।

সূরার ফযিলত:

(ক) অত্র সূরাটি কোরআনের অর্ধেক, অথবা এক চতুর্থাংশের সমান, আনাস (রা.) বলেন:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: (هَلْ تَزَوَّجْتَ يَا فُلَانُ)؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا عِنْدِي مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ، قَالَ: (أَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ؟) قَالَ: بَلَى، قَالَ: (ثُلُثُ الْقُرْآنِ)، قَالَ: (أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ؟) قَالَ: بَلَى، قَالَ: (رُبُعُ الْقُرْآنِ) قَالَ: (أَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)» قَالَ: بَلَى، قَالَ: (رُبُعُ الْقُرْآنِ) قَالَ: (أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ؟) قَالَ: بَلَى، قَالَ: (رُبُعُ الْقُرْآنِ) قَالَ: (تَزَوَّجْ تَزَوَّجْ). [الترمذي: ٢٨٩٥].

অর্থাৎ: "রাসূলুল্লাহ (সা.) তার এক সাহাবীকে বললেন: তুমি কি বিবাহ করেছো? সাহবী উত্তরে বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে এখনও বিবাহ করিনি। রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তর দিলেন: তোমার কি সূরা 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' মুখস্ত আছে? সে বললো: হ্যা, মুখস্ত আছে। তখন তিনি বললেন: এটাতো কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: তোমার কি সূরা 'ইজা যাাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহ্' মুখস্ত আছে? সে বললো: হ্যা, মুখস্ত আছে। তখন তিনি বললেন: এটাতো কোরআনের এক চতুর্থাংশের সমান। এবারে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: তোমার কি সূরা 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন' মুখস্ত আছে? সে বললো: হ্যা, মুখস্ত আছে। তখন তিনি বললেন: এটা কোরআনের এক চতুর্থাংশের সমান। সর্বশেষ তিনি বললেন: তোমার কি সূরা 'ইজা ঝুলঝিলাতিল আর্দ' মুখস্ত আছে? সে বললো: হ্যা, মুখস্ত আছে। তখন তিনি বললেন: এটাতো কোরআনের এক চতুর্থাংশের সমান। সুতরাং বিবাহ করো..বিবাহ করো.."। (*সুনান আল-তিরমিযী*, ১৮৯৫, হাদীসটি হাসান) । এবং সূরাটি কোরআনের অর্ধেক হওয়ার বর্ণনাটি সুনানে তিরমিযী এর ২৮৯৪ নাম্বার হাদীস।

(খ) অত্র সূরাটি কোরআনের সকল সূরাকে অন্তর্ভুক্তকারী (*মুসনাদে আহমাদ*, ৬৫৭৫, সহীহ) ।

(গ) ফজরের দুই রাকাতেই অত্র সূরা পাঠ করা (সুনানে আবু দাউদ, সহীহ, ৬৯৩) ।

(ঘ) অত্র সূরাটি মুফাস্সালাত এর অন্তভুক্ত। মুফাস্সাল সূরার ফযিলত সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন:

(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].

অর্থাৎ: "প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, আর কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্সাল সূরাগুলো"।

(*সুনানে দারিমী*, ৪৩২০) ।

আরো একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةَ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].

অর্থাৎ: "আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিসিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিষিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি"। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪) ।

হাদীসে মুফাস্সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ৯৯তম সূরা।

অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ৯৩তম সূরা, 'নিসা' এর পরে এবং 'হাদীদ' এর পূর্বে।

অবতীর্ণের স্থান: অধিকাংশ মুফাসসির এর মতে, মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা মাদানিয়্যাহ।

আয়াত সংখ্যা: ৮টি।

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে, যা সূরার ব্যাখ্যায় আসবে, ইনশাআল্লাহ।

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذٍ
تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٥) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (٦) فَمَنْ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)﴾ [سورة الزلزلة].

সূরার আলোচ্য বিষয়: কিয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মানুষের ভালো-মন্দ কর্মের উন্মোচন।

সূরার সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১	যখন	পৃথিবী প্রকম্পিত হবে	প্রচন্ড কম্পনে।	২	আর বের করে দিবে	পৃথিবী
	إِذَا	زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ	زِلْزَالَهَا		وَأَخْرَجَتِ	الْأَرْضُ

তার বোঝাসমূহ।	৩	এবং মানুষ বলবে	এর কি হলো?	৪	সেদিন	পৃথিবী বর্ণনা করবে
أَثْقَالَهَا		وَقَالَ الْإِنْسَانُ	مَا لَهَا		يَوْمَئِذٍ	تُحَدِّثُ

তার বৃত্তান্ত।	৫	কারণ	তোমার রব	তাকে আদেশ দিবেন।	৬	সেদিন	বের হবে
أَخْبَارَهَا		بِأَنَّ	رَبَّكَ	أَوْحَى لَهَا		يَوْمَئِذٍ	يَصْدُرُ

মানুষ	বিক্ষিপ্তভাবে,	যাতে তাদেরকে দেখানো যায়	তাদের কৃতকর্ম।	৭	সুতরাং কেউ
النَّاسُ	أَشْتَاتًا	لِيُرَوْا	أَعْمَالَهُمْ		فَمَنْ

করলে	অণু পরিমাণ	ভালকাজ,	সে তা দেখতে পাবে।	৮	এবং কেউ	করলে
يَعْمَلْ	مِثْقَالَ ذَرَّةٍ	خَيْرًا	يَرَهُ		وَمَنْ	يَعْمَلْ

অণু পরিমাণ	মন্দ কাজ,	সে তা দেখতে পাবে।	
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ	شَرًّا	يَرَهُ	

সূরার ভাবার্থ:

শিঙ্গার প্রথম ফুৎকারের পর প্রচন্ডভাবে প্রকম্পিত হয়ে পৃথিবীর সবকিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় ফুৎকারের পর পৃথিবী তার ভিতর থেকে মৃত প্রানী, খনিজ পদার্থ এবং গুপ্তধন সহ সবকিছু বের করে দিবে। সে সময় মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলতে থাকবে পৃথিবীর কি হলো? সে কেন এমনভাবে কাঁপছে এবং ভিতরের সবকিছু বের করে দিচ্ছে। তখন আল্লাহর নির্দেশে পৃথিবী তার উপর ঘটে যাওয়া সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে।

সেদিন মানুষ তাদের কৃতকর্ম দেখার জন্য পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে বিক্ষিপ্তভাবে বের হয়ে আসবে। সুতরাং কেউ অণু পরিমাণ ভালকাজ করলে, তা সে দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে, তাও সে দেখতে পাবে। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ৫/৬০৪) ।

সূরার অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿وَقَالَ الْإِنْسَانُ﴾ 'এবং মানুষ বলবে', অত্র আয়াতাংশে 'মানুষ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'কাফির' যারা আখিরাতকে অস্বীকার করতো। কারণ মুমিনরা পূর্বেই জেনেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন যে কিয়ামতের পর পুনরুত্থানের মাধ্যমে সকলকে বিচারের সম্মুখীন করা হবে।

﴿أَثْقَالَهَا﴾ 'তার বোঝাসমূহ', আরবীতে 'আসক্বাল' বলা হয় ঘরের সামগ্রীকে। অত্র আয়াতাংশে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'পৃথিবীর মাটির ভিতরে লুকায়িত খনিজ পদার্থ এবং দাফনকৃত লাশ সহ সকল কিছু।

﴿أَوْحَىٰ لَهَا﴾ 'আল্লাহ তাকে অহী করেছেন', এখানে 'অহী' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'ইলহাম', যার অর্থ হলো গোপনে জানিয়ে দেওয়া। সাধারণ নিয়ম হলো 'অহী' শব্দটি নবী-রাসূল ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে তা 'ইলহাম' অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন: সূরা ক্বাসাস এর ৭ নাম্বার আয়াতে মূসা (আ.) এর মা এবং সূরা নাহল এর ৬৮ নাম্বার আয়াতে মৌমাছিকে আল্লাহ তায়ালা 'অহী' শব্দ ব্যবহার করে সম্বোধন করেছেন, যা 'ইলহাম' অর্থে এসেছে।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/৩৫৮-৩৫৯)।

অত্র সূরার সাথে পূর্বের সূরার সম্পর্ক:

পূর্বের সূরা তথা 'সূরা বাইয়্যেনা' এ আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের পুরস্কার এবং কাফিরদের তিরষ্কার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আর অত্র সূরা তথা 'সূরা যিলযাল' এ তারা পুরস্কার এবং তিরষ্কার কোথায় কিভাবে পাবে সে বিষয়ে কথা বলেছেন। সুতরাং উভয় সূরার মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট। (*তাফসীর আল-সাওজুয়ী*, ১০/২৮৭)।

অত্র সূরার সাথে পরের সূরার সম্পর্ক:

অত্র সূরায় আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের ভয়াবহ চিত্র এবং মানুষের সামনে তাদের ভালো-মন্দ কর্ম উন্মোচিত হওয়া প্রসংগে আলোচনা করেছেন। আর পরের সূরা অর্থাৎ সূরা আদিয়াত এ কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে মুক্তির তিনটি করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেছেন তা হলো: (ক) আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, (খ) সকল কাজে আখিরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেওয়া এবং (গ) মৃত্যু ও কবরের কথা বেশীবেশী স্মরণ করা। সুতরাং উভয় সূরার মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট। (*তাফসীর আল-মাওজুয়ী*, ১০/২৮৭)।

সূরাটি অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

মুকাতিল (র.) বলেন: সূরা ইনসান এর ৭ম আয়াত 'তারা প্রিয় খাবার খাওয়ায়' অবতীর্ণ হওয়ার পর এক ব্যক্তির কাছে ভিক্ষুক এসে খেজুর, এক টুকরা রুটি এবং বাদাম ভিক্ষা চাইলে সে উত্তরে বললো: এ ধরণের তুচ্ছ জিনিস ভিক্ষা দেওয়া যায় নাকি? আমরা পছন্দসই দামি জিনিস ভিক্ষা দিব। আরেক ব্যক্তির অবস্থা ছিলো সে সগীরা গুনাহ, ছোট-খাটো বিষয়ে মিথ্যা বলা এবং গীবত করাকে অপরাদ মনে করতো না। সে বিশ্বাস করতো কেবল কবীরা গুনাহ করলে মানুষ জাহান্নামী হবে। তখন আল্লাহ অত্র সূরার শেষের দুই আয়াত অবতীর্ণ করে জানিয়ে দিলেন যে, ভালো-মন্দ কাজ যতই ছোট হোক তার হিসাব নেওয়া হবে।

(*আসবাব আল-নুযুল*, *ওয়াহেদী*, ৩৩৫)।

সূরার শিক্ষা:

১। এ সূরায় আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত এবং হাশরের ময়দানকে চিত্রায়িত করতে পাঁচটি অংশে আলোচনা করেছেন:

(ক) সিংগায় প্রথম ফুঁকের পর কিয়ামতের দৃশ্য:

প্রথম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দৃশ্য তুলে ধরেছেন। ইশ্রফীল (আ.) কর্তৃক সিংগায় প্রথম ফুঁক দেওয়া মাত্রই এক প্রচন্ড কম্পনে পৃথিবী সহ সারা বিশ্ব মুহূর্তেই ধ্বংসলীলায় পরিণত হয়ে যাবে। যেমন সূরা যুমার এর ৬৮ নাম্বার আয়াতে এসেছে:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [سورة الزمر: ٦٨].

অর্থাৎ: "এবং সিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, ফলে আসমান এবং যমীনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন। অতঃপর আবার সিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, তৎক্ষনাৎ তারা দান্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে" (সূরা যুমার, ৬৮) ।

কিয়ামতের দিনের চিত্রটা কেমন হবে? পৃথিবী সহ সারা বিশ্ব প্রকম্পিত হতে থাকবে, পৃথিবী সম্প্রসারিত হবে, আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, মানুষ বিক্ষিপ্ত পতংগের মত উড়তে থাকবে, পর্বতমালা ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ধুনিত রঙ্গীন পশমের মত উড়তে থাকবে, সূর্য আলোকহীন হয়ে যাবে, নক্ষত্ররাজী মলিন হয়ে ঝরে পড়বে, প্রচন্ড আওয়াজে গর্ববতী প্রাণীর গর্বপাত হয়ে যাবে, সকল প্রাণী একত্র হয়ে যাবে এবং সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে। এভাবে চল্লিশ বছর/ চল্লিশ মাস/ চল্লিশ দিন কেটে যাবে। যেমন একটি হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيرةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ)، قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ، وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الإِنْسَانِ، إِلَّا عَجْبَ ذَنَبِهِ، فِيهِ يُرَكَّبُ الخَلْقُ. [البخاري، ٤٨١٤].

অর্থাৎ: "আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: (দুইবার ফুঁৎকারের মাঝে ব্যবধান চল্লিশ)। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আবু হুরাইরা! চল্লিশ দিন? তিনি বললেন: আমার জানা নেই। তারপর তারা জিজ্ঞেস করলো চল্লিশ বছর? তিনি বললেন: আমার জানা নেই। এরপর তারা আবার জিজ্ঞেস করলো, তাহলে কি চল্লিশ মাস? তিনি একই উত্তর দিলেন আমার জানা নেই। শিরদাঁড়ার হাড় বাদে মানুষের সর্বকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। এ হাড় থেকেই তাকে আবার সৃষ্টি করা হবে"। (*সহীহ আল-বুখারী*, ৪৮১৪) ।

(খ) সিংগায় দ্বিতীয় ফুঁকের পর হাশরের ময়দানের দৃশ্য:

দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা হাশরের ময়দানের দৃশ্য তুলে ধরেছেন। প্রথম ফুঁকের চল্লিশ বছর পরে ইশ্রফীল (আ.) কর্তৃক সিংগায় দ্বিতীয় ফুঁক দেওয়া মাত্রই পৃথিবী তার ভিতর থেকে সর্বকিছু বের করে দিবে। সকল প্রাণী এক নুতন জগতে পদার্পণ করে পরবর্তীতে কি হয় তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে। (সূরা যুমার, ৬৮) ।

হাশরের ময়দানের চিত্র কেমন হবে? পৃথিবী সহ মহাবিশ্বকে ধ্বংস করে সকল সৃষ্টিকে ধারনক্ষমতাসম্পন্ন একটি বিশালাকারের মাঠ তৈরি করা হবে, যার আকৃতি হবে ধবধবে সাদা রুটির মতো (*সহীহ আল-বুখারী*, ৬৫২১)।

সূর্য মানুষের মাথার এক মাইল উপরে থাকবে, সূর্যের তাপে আমল অনুযায়ী কেউ পায়ের গীড়া পর্যন্ত, কেউ হাটু পর্যন্ত, কেউ কোমড় পর্যন্ত, কেউ গলা পর্যন্ত আবার কেউ ঘামের ভিতরে সাতার কাটবে (*সহীহ মুসলিম*, ২৮৬৪) ।

হাশরের ময়দানের উপর আল্লাহর আরশ থাকবে (সূরা হাক্কাহ, ১৭) এবং তার একপাশে হাওজে কাওসার থাকবে (*সহীহ আল-বুখারী*, ৬৫৭৬) । সূর্যের অতিরিক্ত তাপ থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা সাত প্রকার মানুষকে আরশের নীচে ছায়া প্রদান করবেন (*সহীহ আল-বুখারী*, ৬৬০)।

হাশরের ময়দানকে চতুর্দিক থেকে জাহান্নাম দিয়ে ঘিরে রাখা হবে (*সূরা ফাজর*, ২৩) ।

কাফেরদের বিচার কার্য সম্পন্ন হতে পঞ্চাশ হাজার বছর লেগে যাবে, তবে মুমিনদের ক্ষেত্রে খুবই কম সময়ে বিচার কার্য সম্পন্ন হয়ে যাবে, এমনকি এক ওয়াক্ত ফরজ সালাত আদায় করতে যতটুকু সময় প্রয়োজন হয় ঐ সময়ের মধ্যে তাদের ফয়সালা হয়ে যাবে (*মুসনাদে আহমদ*, ১১৭১৭) ।

বিচার কার্য সম্পন্ন হওয়া মাত্র অলো নিভে যাবে। এ ঘোর অন্ধকারে জাহান্নামের উপর অপস্থিত পুলসিরাত পাড় হয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে হবে। এ সময় ঈমানের আলো ছাড়া অন্য কোন আলো থাকবে না। ঈমনদাররা সহজেই পুলসিরাত পাড় হয়ে জান্নাতে চলে যাবে। আর কাফির, মোনাফিক এবং মুশরিকরা একদিকে যেমন গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে, অপরদিকে পুলসিরাত হবে তাদের জন্য চুলের চেয়ে চিকণ এবং তলোয়ারের চেয়ে ধারালো। এ অবস্থায় পুলসিরাত পাড় হতে গিয়ে তাদের বিভিন্ন অঙ্গ কেটে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (*সূরা আল-হাদীদ*, ১২-১৫/ *সূরা মারয়াম*, ৭১-৭২/ *সহীহ আল-বুখারী*, ৭৪৩৯) ।

(গ) মানুষের আর্তনাদের দৃশ্য:

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন মানুষের আর্তনাদের কথা তুলে ধরেছেন। সেদিন কাফিররা হতভম্ব হয়ে চিৎকার করে বলতে থাকবে এ পৃথিবীর কি হলো? সে কাপছে কেন? সে তার অভ্যন্তরের সবকিছু বের করে দিচ্ছে কেন? তারা এ অবস্থা থেকে বাঁচতে চাইবে এবং এখান থেকে পালাবার পথ খুজবে, কিন্তু কোন কিছুতেই বাঁচতে পারবে না (*সূরা কিয়ামাহ*, ১০/ সূরা হাজ্জ, ২) ।

এছাড়াও হাশরের ময়দানের ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে আর্তনাদ করতে থাকবে, যাতে তারা ভালো কাজ করে পুনরায় প্রস্তুতি গ্রহণ করে আসতে পারে, কিন্তু তাদের এ আর্তনাদকে ভ্রুক্ষেপ করা হবে না (সূরা আনয়াম, ২৭/ সূরা আরাফ, ৫৩)।

যখন কোন আর্তনাদে কাজ হবে না, তখন তারা মাটি হয়ে যাওয়ার জন্য সজোরে চিৎকার করতে থাকবে (সূরা নাবা, ৪০)।

দায়িত্বশীল ফেরেশতার কাছে চেয়ে যখন ব্যর্থ হবে, তখন জান্নাতী ঈমানদারদের কাছে কখনও আলো চাইবে আবার কখনও জান্নাতের খবার-পানীয় চাইবে, কিন্তু জান্নাতীরা তা প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানাবে (*সূরা আল-হাদীদ*, ১২-১৫/ *সূরা আল-আরাফ*, ৫০) ।

(ঘ) হাশরের ময়দানে বিচারের দৃশ্য:

চতুর্থ এবং পঞ্চম আয়াত থেকে বুঝা যায় আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট সাক্ষ্য এবং প্রমাণের আলোকে মানুষের কৃতকর্মের বিচার করবেন। কারো প্রতি এক বিন্দু পরিমাণ অন্যায় করা হবে না। সে দিন আল্লাহর নির্দেশে পৃথিবী নিজেই মানুষের ভালমন্দ কর্মের সাক্ষী হয়ে সে কোথায় কোন অপকর্ম করেছে তার সংবাদ দিবে। অন্য এক আয়াতে এসেছে, হাশরের ময়দানে আল্লাহ মানুষের মুখ বন্ধ করে দিয়ে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে তার যাবতীয় কৃতকর্মের বর্ণনা শুনবেন (*সূরা ইয়াসীন*, ৬৫) ।

এছাড়াও সেদিন মানুষের আমলনামা পরিমাপ করার জন্য হাশরের ময়দানে মীযান বা দাড়িপালা বসানো হবে (*সূরা আল-আম্বিয়া*, ৪৭/ *সূরা আল-আরাফ*, ৮-৯) । আমলনামা পরিমাপ করতে গিয়ে দেখা যাবে একটি কনা পরিমাণ নেকআমলের ঘাটতি হওয়ার কারণে জাহান্নামী হয়ে যাবে। তখন তাকে এক কনা নেকআমল সন্ধান করার সুযোগ দেওয়া হবে। পিতামাতা, স্ত্রীপরিজন, বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের কাছে ছুটে যাবে সামান্য নেক আমলের সন্ধানে, কিন্তু কেউ দিতে সম্মতি হবে না, বরং একে অপর থেকে পলায়ন করবে। (*সূরা আবাসা*, ৩৪-৩৭/ *সহীহ আল-বুখারী*, ৬৪০৬) ।

(ঙ) মানুষের কৃতকর্মের উন্মোচন:

সপ্তম এবং অষ্টম আয়াত থেকে বোঝা যায় হাশরের ময়দানে মানুষ তাদের সারা জীবনের কৃতকর্ম দেখতে পাবে। সে তার আমলনামা অন্যের থেকে আড়াল করতে চাইবে, কিন্তু আড়াল করতে পারবে না (*সূরা ইসরা*, ১৩-১৪)। এ জন্য সেদিন অপরাধীদের মাথা লজ্জায় নত হয়ে যাবে। ঈমানদারগণকে তাদের আমলনামা ডানদিক থেকে প্রদান করা হবে এবং কাফিরদেরকে প্রদান করা হবে বাম দিক থেকে। (*সূরা ইনশিক্বাক*, ৭-১২/ *সূরা হাক্কাহ*, ১৯-২৭) ।

২। অত্র সূরার সপ্তম এবং অষ্টম আয়াতের আলোকে বুঝা যায় যে, হাশরের ময়দানে যত ছোট আমলই হোক না কেন তা বিচারের আওতায় আনা হবে। এ জন্য কোন আমলকে তুচ্ছজ্ঞান করা এক ধরণের বোকামী। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমরা এক টুকরা খেজুর সদকা করে হলেও জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা করো" (সহীহ আল-বুখারী, ১৪১৭)। আরেকটি হাদীসে দেখতে পাই, "আমি যে বিষয়ে আদেশ করি তা যথাসম্ভব পালন কর, আর যা থেকে নিষেধ করি তা পরিপূর্ণভাবে বর্জন করো" (*মুসনাদে আহমাদ*, ৭৩৬৭) ।

সূরার আমল:

১। অত্র সূরা তেলওয়াত করে কিয়ামত ও হাশরের ময়দানকে মনে মনে চিত্রায়িত করে অনুধাবন করা। এ সূরাটি বেশীবেশী পড়ার প্রতি উৎসাহিত করার জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: এটা কোরআনের অর্ধেকের সমান অন্য বর্ণনা মতে একচতুর্থাংশের সমান।

২। মাঝেমধ্যে এ সূরাকে ফজরের ফরজ সালাতের দুই রাকাতেই সূরা ফাতিহার পরে তেলওয়াত করা। এর মাধ্যমে একটি সুন্নাতের প্রতি আমল হবে।

(سُوْرَةُ الْعَادِيَات)

সূরা 'আদিয়াত এর পরিচয়:

সূরার নাম: এ সূরার নাম হলো: সূরাতু আল-'আদিয়াত (তাওকীফী নাম)। সূরাটি এ নামেই পরিচিত। সকল মুসহাফ, তাফসীর গ্রন্থ এবং হাদীস গ্রন্থে এ নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কিছু তাফসীর গ্রন্থে সূরাতু "ওয়াল-'আদিয়াত" নামে উল্লেখ করা হয়েছে।
এ শব্দটি সূরার শুরুতে থাকার কারণে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে। আল-'আদিয়াত এর অর্থ হলো: জিহাদের ঘোড়া। এ শব্দটি অত্র সূরা ছাড়া কোরআনের কোথাও পাওয়া যায় না।
(*তাফসীর মাওজূয়ী*, ১০/২৯৩) ।

সূরার আলোচ্যবিষয়: প্রাচুর্যের সময় আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া থেকে মানুষকে সতর্কীকরণ।

সূরার ফযিলত: বিশুদ্ধ হাদীস অনুযায়ী সূরাটির সতন্ত্র কোন ফযিলত পাওয়া যায় না। তবে এটি মুফাস্সালাত এর অন্তর্ভুক্ত। মুফাস্সাল সূরার ফযিলত সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন:
(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].
অর্থাৎ: "প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, আর কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্সাল সূরাগুলো"।
(*সুনানে দারিমী*, ৪৩২০) ।
আরো একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةِ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].
অর্থাৎ: "আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিসিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিষিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি"। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪) ।
হাদীসে মুফাস্সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ১০০তম সূরা।

অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ১৩তম সূরা, যা 'সূরা আস্‌র' এর পরে এবং 'সূরা কাওসার' এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

অবতীর্ণের স্থান: মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা মাক্কিয়্যাহ। (*বিতাকাত আল-তারীফ*, ৩৪১) ।

আয়াত সংখ্যা: ১১টি।

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: এ সূরাটি অবতীর্ণের একটি প্রেক্ষাপট পাওয়া যায়।

﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (١) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (٢) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (٣) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا (٤)
فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (٥) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (٦) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (٧) وَإِنَّهُ لِحُبِّ
الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (٨) أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (٩) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (١٠) إِنَّ رَبَّهُمْ
بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (١١)﴾ [سورة العاديات].

সূরার আলোচ্য বিষয়: প্রাচুর্যের সময় আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া থেকে সতর্কীকরণ।

সূরার সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১	অশ্বরাজির শপথ	যা উর্ধশ্বাসে ছুটে যায়।	২	অতঃপর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়ায়	ক্ষুরাঘাতে।			
	وَالْعَادِيَاتِ	ضَبْحًا		فَالْمُورِيَاتِ	قَدْحًا			
৩	অতঃপর হানা দেয়	প্রভাতে।	৪	অতঃপর উড়ায়	তা দ্বারা	ধুলি।	৫	অতঃপর
	فَالْمُغِيرَاتِ	صُبْحًا		فَأَثَرْنَ	بِهِ	نَقْعًا		فَ
ঢুকে পড়ে	শত্রু দলের (ভিতরে)।	৬	নিশ্চয়	মানুষ	তার রবের প্রতি	বড়ই অকৃতজ্ঞ।		
وَسَطْنَ بِهِ	جَمْعًا		إِنَّ	الْإِنْسَانَ	لِرَبِّهِ	لَكَنُودٌ		
৭	এবং নিশ্চয় সে নিজেই	এ বিষয়ে	সাক্ষী হবে।	৮	এবং অবশ্যই সে	সম্পদের লোভে		
	وَإِنَّهُ	عَلَى ذَلِكَ	لَشَهِيدٌ		وَإِنَّهُ	لِحُبِّ الْخَيْرِ		
অত্যন্ত প্রবল।	৯	তবে কি সে (ঐ খবর) জানে না	যখন	উত্থিত হবে	কবরে যা আছে?			
لَشَدِيدٌ		أَفَلَا يَعْلَمُ	إِذَا	بُعْثِرَ	مَا فِي الْقُبُورِ			
১০	এবং প্রকাশ করা হবে	অন্তরের খবর।	১১	নিশ্চয়	তাদের রব	তাদের ব্যাপারে		
	وَحُصِّلَ	مَا فِي الصُّدُورِ		إِنَّ	رَبَّهُمْ	بِهِمْ		
সে দিন	সবিশেষ অবহিত।							
يَوْمَئِذٍ	لَخَبِيرٌ							

সূরার ভাবার্থ:

আল্লাহ তায়ালা পাঁচটি গুণ বিশিষ্ট ঘোড়ার শপথ করেছেন: (ক) যা উর্ধশ্বাসে ছুটে যায়, (খ) যা ক্ষুরাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়ায়, (গ) যা প্রভাতে শত্রু বাহিনীর উপর আক্রমণ করে, (ঘ) যা অতি দ্রুত গতির কারণে ধুলি উড়ায় এবং (ঙ) শত্রুদলের ভিতর ঢুকে পড়ে।

শপথের পর আল্লাহ বলেন: নিশ্চয় মানুষ সম্পদের প্রাচুর্য এবং অতিরিক্ত লোভের কারণে তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ হয়ে উঠে, যে বিষয়ে সে নিজেই আখিরাতে সাক্ষী হবে। তবে কি সে কবরের খবর জানে না, যখন কবরের সবকিছু উত্থিত হবে এবং তাদের অন্তরনিহিত সকল

বিষয় প্রকাশিত হবে? নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাদের কর্ম এবং সেদিনে তাদের পরিণতি সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ৫/৬০৬, *আল-মোন্তাখাব*, ৯২৩) ।

সূরার অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿وَالْعَادِيَاتِ﴾ ‘অস্বরাজি’ দ্বারা কোন ঘোড়াকে বুঝানো হয়েছে? তা নিয়ে তিনটি মত পাওয়া যায়:

(ক) আবু হাইয়্যান আল-আন্দালুসী (র.) একটি সূত্র থেকে বলেন: উল্লেখিত গুনের অধিকারী সকল ঘোড়াকে ব্যাপকভাবে বুঝানো হয়েছে। (*আল-মুনীর*, ৩০/৪৬৮) ।

(খ) অত্র সূরা অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট থেকে বুঝা যায় ‘কেনানা’ গোত্রের উদ্দেশ্যে অভিযানে পাঠানো অশ্বরাজিকে বুঝানো হয়েছে।

(গ) আলী (রা.) থেকে একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, বদরের যুদ্ধে ব্যবহৃত উট ও ঘোড়াকে বুঝানো হয়েছে। (*গরীব আল-কোরআন*, ইবনু কুতাইবাহ, ৪৬৬) ।

তবে মুস্তফা মুসলিম প্রথম মতকে প্রাধান্য দিয়ে বলেন: যুদ্ধে, ভ্রমণে এবং হজ্জে ব্যবহৃত উল্লেখিত গুনের সকল অশ্বকে ব্যাপকভাবে বুঝানো হয়েছে। (তাফসীর মাওজূয়ী, ১০/৩০৩)।

﴿الْإِنْسَانَ﴾ ‘মানুষ’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সকল মানুষ। যদিও কিছু তাফসীরকারক এর দ্বারা কাফির-মোনাফেকদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/৩৬৯) ।

অত্র সূরার সাথে পূর্বের সূরার সম্পর্ক:

পূর্বের সূরা তথা সূরা যিলযাল এ আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের ভয়াবহ চিত্র এবং মানুষের ভালো-মন্দ কর্মের পুরস্কার-তিরষ্কার নিয়ে আলোচনা করেছেন। আর অত্র সূরাতে যে বিষয়ে আলোচনা করেছেন তা হলো: মানুষ সম্পদের প্রাচুর্য ও অধিক লোভের কারণে আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে উঠে। পাশাপাশি এ ব্যাধি থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে তিনটি চিকিৎসা দিয়েছেন: (ক) আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, (খ) সকল কাজে আখিরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেওয়া এবং (গ) মৃত্যু ও কবরের কথা বেশীবেশী স্মরণ করা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সূরা যিলযাল এ সাধারণভাবে কিয়ামতের চিত্র এবং মানুষের সফলতা ও ব্যর্থতার কথা তুলে ধরা হয়েছে, আর অত্র সূরায় কিয়ামতে মানুষের ব্যর্থতার কারণ এবং তা থেকে মুক্তির উপায় বা চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(*তাফসীর আল-মাওজূয়ী*, ১০/২৯৭) ।

অত্র সূরার সাথে পরের সূরার সম্পর্ক:

অত্র সূরায় আল্লাহ তায়ালা মানুষের কুফরী ও নেফাকী কাজে জড়িয়ে পড়ার কারণ এবং তার চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আর পরবর্তী সূরা তথা সূরা ক্বারিয়াতে আলোচনা করেছেন দুই দল মানুষ সম্পর্কে যাদের এক দল ভালো কাজ করে জান্নাতি হবে এবং অপর দল কুফরী করে জাহান্নামী হবে। সুতরাং দুইটি সূরাতেই মানুষের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। (*তাফসীর আল-মাওজূয়ী*, ১০/২৯৯) ।

সূরাটি অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) কেনানা গোত্রের উদ্দেশ্যে অভিযানে অশ্ববাহিনী পাঠিয়ে এক মাস অপেক্ষা করার পরও সেখান থেকে কোন খবর আসেনি। তখন মোনাফিকরা বলতে শুরু করে অভিযানের সকল সদস্য নিহত হয়েছে, তা না হলে কোন সংবাদ আসবে না কেন? এতে রাসূলুল্লাহ (সা.) একটু চিন্তিত হয়ে পড়লে আল্লাহ তায়ালা অত্র সূরা অবতীর্ণ করে উক্ত অভিযানে পাঠানো অশ্ব বাহিনীর সংবাদ তুলে ধরার পাশাপাশি অকৃতজ্ঞ মোনাফেকের অবস্থাও তুলে ধরেছেন। (আল-ইতকান/ *লুবাব আল-নুকুল*, ৩৬৭) ।

সূরার শিক্ষা ও আমল:

১। শপথের বিধান সম্পর্কে ২২৪ এবং ২২৫ নাম্বার আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কথা হলো: মানুষের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন বস্তুর শপথ করা জায়েজ নেই। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে ধরাবাঁধা কোন নিয়ম নেই। তিনি যে বিষয়ে কথা বলতে চান সে বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রেখে কোন বস্তুর শপথ করে কথা বলেন। অত্র সূরায় দেখা যায় পাঁচটি গুন বিশিষ্ট ঘোড়ার শপথ করে আল্লাহর প্রতি মানুষের অকৃতজ্ঞতার কারণ হিসেবে সম্পদকে উল্লেখ করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো: উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক কি? তাফসীরকারকগণ দুইটি সম্পর্ক তুলে ধরেছেন:

(ক) সূরায় বর্ণিত পাঁচটি গুন বিশিষ্ট ঘোড়া আরব সহ গোটা বিশ্বের মানুষের কাছে খুব দামী সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। আর সূরায় আলোচনার বিষয় হলো সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে মানুষ আল্লাহর অকৃতজ্ঞ হয়। সুতরাং শপথের বস্তু এবং আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট।

(*তাফসীর মাওজুয়ী*, ১০/২৯৬) ।

(খ) ঘোড়া এমন এক প্রানী যা মানুষের থেকে একটু আদরযত্ন, ভালোবাসা এবং খাবার পেলে সে মনিবের কৃতজ্ঞতায় তার আদেশের বাহিরে যায় না। এমনকি মনিবের নির্দেশ পালনের জন্য জীবন বাজী রেখে যুদ্ধের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ে। অপরদিকে মানুষ বেঁচে আছে আল্লাহর দয়ায়। খানাপিনা, সুস্থতা এবং শ্বাস-নিঃশ্বাস থেকে আরম্ভ করে জীবনের প্রতিটি কদমই চলে আল্লাহর করুনায়। এরপরেও সে যখন একটু সম্পসশালী হয়, তখন আল্লাহকে ভুলে গিয়ে তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। সুতরাং শপথের বস্তু এবং আলোচ্যবিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট।

(*মায়ারেফুল কোরআন*, ১৪৭১) ।

২। আবু বকর আল-জাজ্বায়িরী (র.) এ সূরার তিনটি শিক্ষা উল্লেখ করেছেন:

(ক) পুনরুত্থান দিবস সত্য। (৯-১১) নাম্বার আয়াতে এ বিষয়ে আলোচনা রয়েছে।

(খ) (১-৫) নাম্বার আয়াতে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের প্রতি প্রেরণা যোগানো হয়েছে।

(গ) মানুষ স্বভাবগতভাবে সম্পদের প্রাচুর্যতার কারণে আল্লাহকে ভুলে যায়। আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার মূল কারণ হলো: মৃতু ও কবরকে ভুলে যাওয়া। সুতরাং এ ব্যধি থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ প্রদত্ব চিকিৎসা হলো মৃত্যুর কথা স্মরণ রেখে আখিরাত ভিত্তিক জীবন গড়া। (৬-১১) নাম্বার আয়াতে এ বিষয়ের ইঙ্গিত রয়েছে। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ৫/৬০৭) ।

(سُوْرَةُ الْقَارِعَة)

সূরা ক্বারিয়াহ এর পরিচয়:

সূরার নাম: এ সূরার নাম হলো: সূরাতু আল-ক্বারিয়াহ (তাওকীফী নাম)। সূরাটি এ নামেই পরিচিত। সকল মুসহাফ, তাফসীর গ্রন্থ এবং হাদীস গ্রন্থে এ নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। এ শব্দটি সূরার শুরুতে থাকার কারণে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে। 'আল-ক্বারিয়াহ' কেয়ামতের নামসমূহের একটি নাম। এ শব্দটি সূরা হাক্কাহ এর ৪ এবং সূরা রাদ এর ৩১ নাম্বার আয়াতে এসেছে। (*তাফসীর মাওজূয়ী*, ১০/৩০৫)।

সূরার আলোচ্যবিষয়: কিয়ামতের ভয়াবহতা এবং মানুষের বিভক্তি।

সূরার ফযিলত: বিশুদ্ধ হাদীস অনুযায়ী সূরাটির সতন্ত্র কোন ফযিলত পাওয়া যায় না। তবে এটি মুফাস্‌সালাত এর অন্তভূক্ত। মুফাস্‌সাল সূরার ফযিলত সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন:
(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].
অর্থাৎ: "প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্‌সাল সূরাগুলো"।
(*সুনানে দারিমী*, ৪৩২০)।
আরো একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةِ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].
অর্থাৎ: "আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিসিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিসিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্‌সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি"। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪)।
হাদীসে মুফাস্‌সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ১০১তম সূরা।

অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ২৯তম সূরা, যা 'সূরা কুরাইশ' এর পরে এবং 'সূরা কিয়ামহ' এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

অবতীর্ণের স্থান: মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা মাক্কিয়্যাহ। (*বিতাকাত আল-তারীফ*, ৩৪৪)।

আয়াত সংখ্যা: ১১টি।

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: এ সূরাটি অবতীর্ণের কোন প্রেক্ষাপট পাওয়া যায় না।

﴿الْقَارِعَةُ (١) مَا الْقَارِعَةُ (٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (٣) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ
(٤) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (٥) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (٦) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
(٧) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (٨) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (٩) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (١٠) نَارٌ حَامِيَةٌ
(١١)﴾ [سورة القارعة].

সূরার আলোচ্য বিষয়: কিয়ামতের ভয়াবহতা এবং মানুষের বিভক্তি।

সূরার সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১	আল-ক্বারিয়াহ (মহাপ্রলয়)।	২	মহাপ্রলয় কি?	৩	তুমি কি জানো	মহাপ্রলয় কি?
	الْقَارِعَةُ		مَا الْقَارِعَةُ		وَمَا أَدْرَاكَ	مَا الْقَارِعَةُ
৪	সেদিন	মানুষ হবে	বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত।	৫	এবং পর্বত হবে	রঙ্গিন পশমের মত।
	يَوْمَ	يَكُونُ النَّاسُ	كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ		وَتَكُونُ الْجِبَالُ	كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ
৬	তখন (প্রলয়ের দিন)	যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে।	৭	সে থাকবে	সন্তোষময় জীবনে।	
	فَأَمَّا	مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ		فَهُوَ	فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ	
৮	কিন্তু	যার নেকীর পাল্লা হালকা হবে।	৯	তার ঠিকানা হবে	হাভিয়াতে।	
	وَأَمَّا	مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ		فَأُمُّهُ	هَاوِيَةٌ	
১০	তুমি জানো	তা কি?	১১	(এটা হলো) অতি উত্তপ্ত অগ্নি।		
	وَمَا أَدْرَاكَ	مَا هِيَهْ		نَارٌ حَامِيَةٌ		

সূরার ভাবার্থ:

মহাপ্রলয়, যার ভয়াবহতা মানুষের অন্তরকে জাগ্রত করে তুলবে। তার ভয়াবহতার মধ্যে এমন কি বিস্ময়কর অবস্থা রয়েছে? তুমি কি জান এ মহাপ্রলয়ের ভয়াবহ চিত্রটা কেমন হবে? তার বাস্তব চিত্রটি হবে এ রকম যে, সে দিন মানবজাতি ধ্বংস হওয়ার ভয়ে আত্মরক্ষার তাগিদে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো এদিকওদিক ছুটতে থাকবে। আর পাহাড়সমূহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে রঙ্গিন পশমের ন্যায় উড়তে থাকবে। সেদিন মানুষ তাদের আমল অনুযায়ী দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। যাদের নেক আমলের পাল্লা ভারী হবে, তারা সন্তোষময় জীবন-জাপন করবে। অপরদিকে যাদের নেকের পাল্লা হালকা হবে তারা হাভিয়া নামক জাহান্নামে অবস্থান করবে। হে আল্লাহর নবী আপনি কি জানেন ‘হাভিয়া’ কি? নিশ্চয় তা হলো অতি উত্তপ্ত অগ্নি। (*আল-মোন্তাখাব*, ৯২৪, *আল-মোয়াস্‌সার*, ১/৬০০) ।

সূরার অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الْقَارِعَةُ﴾ 'আল-ক্বারিয়াহ' এটা কিয়ামতের নামসমূহের একটি। পবিত্র কোরআনের অনেক সূরাতে কিয়ামতের অনেক নাম রয়েছে। যেমন: আল-হাক্বাহ, আল-ত্বাম্মাহ, আল-সাাখ্খাহ, আল-গাশিয়াহ, আল-সাা'আহ এবং আল-ওয়াক্বিয়াহ। আল-ক্বারিয়াহ (ঠক্ঠক্কারী) নামকরনের কারণ হলো: কিয়ামত নিজ ভয়াবহতায় মানুষের অন্তরকে জাগ্রত করে তুলবে।

(*তাফসীর আহসানুল বয়ান*, ১১০১) ।

﴿فَأُمُّهُ﴾ 'অতএব তার মা হবে', অত্র আয়াতাংশে 'মা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: আবাসস্থল বা আশ্রয়স্থল। জাহান্নামীকে জাহান্নাম এমনভাবে আশ্রয় দিবে যেমনিভাবে মা তার সন্তানকে আশ্রয় দিয়ে থাকে। (*গরীব আল-কোরআন*, ৪৬৭) ।

অত্র সূরার সাথে পূর্বের সূরার সম্পর্ক:

পূর্বের সূরা তথা 'সূরা আল-আদিয়াত' এর শেষাংশে কিয়ামত এবং পুনরুত্থান সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয়েছে, আর অত্র সূরাতে কিয়ামতের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং পূর্বের সূরার সাথে অত্র সূরার সম্পর্ক স্পষ্ট। (*তাফসীর মাওজুয়ী*, ৩০৮) ।

সূরার শিক্ষা ও আমল:

১। ইমাম আবু বকর জাজ্বায়িরী (র.) অত্র সূরায় চারটি শিক্ষা উল্লেখ করেছেন:

(ক) পুনরুত্থান এবং আখেরাত সত্য।
(খ) কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা এবং তাতে আল্লাহর সাস্তি থেকে সতর্ক করা হয়েছে।
(গ) মানুষ তার ভালোমন্দ কর্মের ফল ভোগ করবে।
(ঘ) কিয়ামতে মানুষ দুই গ্রুপে বিভক্ত হবে, একদল জান্নাতী এবং অপর দল জাহান্নামী।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, ৫/৬০৯) ।

২। জাহান্নামের আগুনকে 'হামিয়াহ' বলা হয়েছে, যার অর্থ হলো অত্যন্ত তাপ ও দাহযুক্ত। সুতরাং দুনিয়ায় আমরা যে আগুন ব্যবহার করি তা 'হামিয়াহ' নয়। জাহান্নামের হামিয়াহ আগুন সম্পর্কে আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تُوقِدُ بَنُو آدَمَ جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، فَقِيلَ: وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا، كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا) [الشريعة: ٩٣٣].

অর্থাৎ: "এ দুনিয়ার আগুন, যা আদম সন্তান ব্যবহার করে, তার তাপের পরিমান হলো জাহান্নামের আগুনের ৭০ ভাগের এক ভাগ। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, দুনিয়ার আগুনের মত হলেই তো জাহান্নামীদেরকে সাস্তি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তরে বললেন: জাহান্নামের আগুনের দাহ ক্ষমতা দুনিয়ার আগুনের চেয়ে ৬৯ গুণ বেশী। আর দুনিয়ার সকল জ্বালানী এবং আগুন একত্র করে প্রজ্বলন করা হলে যে তাপ হয় তা জাহান্নামের প্রতি এক গুণ দাহ ক্ষমতার সমান" (*সহীহ মুসলিম*, ৭৩৪৪) । (*তাফসীর মাওজুয়ী*, ১০/৩১২) ।

৩। অত্র সূরায় কিয়ামত দিনের দুইটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে:

(ক) সেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত ছুটতে থাকবে।
(খ) পাহাড়সমূহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে রঙ্গিন পশমের ন্যায় উড়তে থাকবে। (আল্লাহ ভালো জানেন)।

(سورة التَّكاثر)

সূরা তাকাসুর এর পরিচয়:

সূরার নাম: এ সূরার তিনটি নাম পাওয়া যায়:

(ক) সূরাতু আল-তাকাসুর (তাওকীফী নাম), সূরাটি এ নামেই পরিচিত। সকল মুসহাফে এবং অধিকাংশ তাফসীর গ্রন্থে এ নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। এ শব্দটি সূরার শুরুতে থাকার কারণে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

(খ) সূরাতু ‘আলহাকুমুত তাকাসুর’ (তাওকীফী নাম), সূরার ফযীলত বর্ণনায় এ নামটি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তবারী তার তাফসীর গ্রন্থে এ নামটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী (র.) এবং ইমাম আল-হাকীম এ নামে শিরোনাম করেছেন।

(গ) সূরাতু ‘আল-মাক্ববারাহ’ (ইজতেহাদী নাম), ইমাম আলূসী এ নাম উল্লেখ করেছেন। কতিপয় সাহাবী এ নাম দিয়েছেন। (*তাফসীর মাওজুয়ী*, ১০/৩১৫) ।

সূরার আলোচ্যবিষয়: সম্পদের মোহে বেপরোয়া হওয়ার শাস্তি ও কিয়ামতে জিজ্ঞাসাবাদ।

সূরার ফযিলত: (ক) সূরাটি মুফাস্‌সালাত এর অন্তভুক্ত। ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন:

(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].

অর্থাৎ: “প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্‌সাল সূরাগুলো”।

(*সুনানে দারিমী*, ৪৩২০) ।

হাদীসে মুফাস্‌সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

(খ) এ সূরার তিলওয়াত এক হাজার আয়াত বা কোরআনের একষষ্ঠাংশ তিলাওয়াতের সমান। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(أَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَ آيَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ؟ قَالُوا: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَ آيَةٍ؟ قَالَ: مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ؟) [شعب الإيمان للبيهقي: ٢٢٨٧].

অর্থাৎ: “তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করতে সক্ষম? সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন: আমাদের মধ্যে কেউ নেই, যে প্রত্যহ এক হাজার আয়াত পড়তে সক্ষম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: তোমরা কি প্রতি দিন সূরা তাকাসুর পড়তে সক্ষম নয়? সূরা তাকাসুর পড়লে এক হাজার আয়াত পড়ার সওয়াব পাবে” [*শুয়াবুল ঈমান*, ২২৮৭]।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ১০২তম সূরা।

অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ১৫তম সূরা, যা ‘সূরা কাওসার’ এর পরে এবং ‘সূরা মাউন’ এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

অবতীর্ণের স্থান: মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা মাক্কিয়্যাহ। (*তাফসীর মওজুয়ী*, ১০/৩১৭) ।

আয়াত সংখ্যা: ৮টি।

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: এ সূরাটি অবতীর্ণের একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে।

﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (١) حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤)
كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (٦) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (٧) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ
عَنِ النَّعِيمِ (٨)﴾ [سورة التكاثر].

সূরার আলোচ্য বিষয়: সম্পদের মোহে বেপরোয়া হওয়ার শাস্তি ও কিয়ামতে জিজ্ঞাসাবাদ।

সূরার সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১	তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে	প্রচুর্যের বড়াই।	২	যতক্ষণ না	সাক্ষাত করবে
	أَلْهَاكُمُ	التَّكَاثُرُ		حَتَّىٰ	زُرْتُمُ

কবরের।	৩	(এটা) কখনও (ঠিক) নয়,	শীঘ্রই	তোমরা জানতে পারবে।	৪	আবারো
الْمَقَابِرَ		كَلَّا	سَوْفَ	تَعْلَمُونَ		ثُمَّ

(বলি, এটা) কখনও (ঠিক) নয়,	শীঘ্রই	তোমরা জানতে পারবে।	৫	সত্যিই	যদি
كَلَّا	سَوْفَ	تَعْلَمُونَ		كَلَّا	لَوْ

তোমরা (এর পরিণাম) জানতে	নিশ্চিতভাবে।	৬	তোমরা অবশ্যই দেখবে	জাহান্নাম।
تَعْلَمُونَ	عِلْمَ الْيَقِينِ		لَتَرَوُنَّ	الْجَحِيمَ

৭	আবারো বলি	অবশ্যই তা দেখতে পাবে	চাক্ষুষ প্রত্যয়ে।	৮	অতঃপর	অবশ্যই
	ثُمَّ	لَتَرَوُنَّهَا	عَيْنَ الْيَقِينِ		ثُمَّ	لَ

তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে	সেদিন	নেয়ামত সম্পর্কে।	
تُسْأَلُنَّ	يَوْمَئِذٍ	عَنِ النَّعِيمِ	

সূরার ভাবার্থ:

যারা সম্পদের মোহে বিভোর হয়ে আছে, তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে: সম্পদের প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ থেকে বিরত রাখছে। এমনকি তোমরা মৃত্যু পর্যন্ত পাগল হয়ে সম্পদের পিছে ছুটে চলছো।

এভাবে সম্পদের পিছে বেপরোয়া হয়ে ছুটা তোমাদের জন্য মোটেই ঠিক নয়, অচিরেই মৃত্যুর পর কবরে বুঝতে পারবে এ ক্ষণিকের দুনিয়ার চেয়ে স্থায়ী আখিরাতই তোমাদের জন্য উত্তম।

আবারো বলছি: সতর্ক হয়ে যাও, শীঘ্রই এর পরিণতি সম্পর্কে কবরে জানতে পারবে।

সাবধান! সম্পদের পিছনে বেপরোয়া হয়ে ছুটো না, যদি এর পরিণতি সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান থাকতো, তাহলে তোমরা সম্পদের মোহে বেপরোয়া হতে পারতে না। তোমরা অবশ্যই জাহান্নামকে দেখতে পাবে। আবারো বলছি: সাবধান! দুনিয়ার মোহ থেকে ফিরে না আসলে,

তোমরা জাহান্নামকে স্বচক্ষে দেখতে পাবে। অতঃপর তোমাদেরকে সম্পদ কোন পথে উপার্জন করেছো এবং কোথায় ব্যয় করেছো তা জিজ্ঞাসা করা হবে। (আইসার, ৫/৬১১) ।

সূরার অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿التَّكَاثُرُ﴾ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'সম্পদের প্রাচুর্যের বড়াই' অথবা 'সম্পদ প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা'।

﴿النَّعِيمِ﴾ 'নেয়ামত' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'সুস্থতা, সম্পদের প্রাচুর্যতা এবং নিরাপত্তা'।

(*গরীব আল-কোরআন*, ইবনু কুতাইবাহ (৪৬৮) ।

অত্র সূরার সাথে পূর্বের সূরার সম্পর্ক:

পূর্বের সূরা অর্থাৎ সূরা ক্বারিয়াতে কিয়ামতের ভয়াবহ চিত্র বর্ণনার পর মানুষকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে: (ক) একটি দল যারা কিয়ামতে সৌভাগ্যবান হবে এবং (খ) আরেকটি দল যারা ঐ দিন দুর্ভাগা হবে। আর অত্র সূরাতে দ্বিতীয় দল যারা দুর্ভাগা হবে তাদের দুর্ভাগ্যের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। (*তাফসীরে মাওজুয়ী*, ১০/৩১৯) ।

অত্র সূরার সাথে পরের সূরার সম্পর্ক:

অত্র সূরাতে দুনিয়ার মায়াজালে আটকে পড়ে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের আলোচনার পর পরবর্তী সূরা অর্থাৎ সূরা আস্‌রএ আল্লাহ তায়ালা উক্ত ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য চার দফা কর্মসূচী নির্ধারণ করে দিয়েছেন। (*তাফসীর মাওজুয়ী*, ১০/৩২০) ।

সূরাটি অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুর রহমান ইবনু আবি হাতিম (র.) ইবনু বুরাইদাহ হতে বর্ণনা করেন, অত্র সূরা আনসারদের দুইটি গোত্র বনী হারিসা এবং বনী আল-হারিস সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা তাদের বংশ মর্যাদা ও ধনসম্পদ নিয়ে বড়াই করে এক গোত্র অন্য গোত্রকে বলতো: আমাদের গোত্রে অমুক আছে অমুক আছে, তাদের সমকক্ষ কি তোমাদের গোত্রে আছে? অনুরূপ প্রশ্ন প্রতিপক্ষ গোত্রও তাদের দিকে ছুরে মারতো। এক পর্যায়ে এক গোত্র অপর গোত্রকে নিয়ে গোরস্থানে গিয়ে মৃত প্রভাবশালী পূর্বপুরুষদের কবরের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে অনুরূপ প্রশ্ন ছুড়ে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠলে আল্লাহ তায়ালা অত্র সূরা অবতীর্ণ করে তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন যে আখিরাত বর্জন করে দুনিয়ার মোহে বেপরোয়া হলে তাদের জন্য জাহান্নামের কঠিন শাস্তি রয়েছে। (*লুবাব আল-নুকুল*, ৩৬৮) ।

সূরার শিক্ষা:

১। ইমাম জাজ্বায়িরী (র.) এ সূরায় চারটি শিক্ষা বর্ণনা করেছেন:

(ক) আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুসরণ বাদ দিয়ে সম্পদ অর্জনে মত্ত হওয়া হারাম।

(খ) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বীদাহ হলো: কবরের আযাব সত্য, কারণ অত্র সূরায় বলা হয়েছে: শীঘ্রই কবরে জানতে পারবে।

(গ) পুনরুত্থান দিবস সত্য, কারণ অত্র সূরার শেষের তিন আয়াত এ বিষয় স্পষ্ট করেছে।

(ঘ) মানুষ আল্লাহ প্রদত্ব যত নেয়ামত ভোগ করছে তার জন্য সে জিজ্ঞাসিত হবে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, ৫/৬১১-৬১২) ।

২। অত্র সূরার প্রথমাংশের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) মানুষের স্বভাব তুলে ধরে বলেছেন:

(لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى ثَالِثًا، وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ) [صحيح البخاري: ٦٤٣٦].

অর্থাৎ: "আদম সন্তানের স্বভাব হলো: যদি তার দুইটি সম্পদের উপত্যকা থাকে, তাহলে সে তৃতীয় আরেকটি সম্পদের উপত্যকা গড়ার জন্য উদগ্রীব থাকে। তাদের পেট কবরের মাটি ছাড়া অন্য কিছুতেই ভরে না। আর যে তাওবা করবে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করে নেন" (*সহীহ আল-বুখারী*, ৬৪৩৬)।

৩। সূরার শেষাংশের ব্যাখ্যায় মুয়াজ ইবনু জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(مَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ) [شعب الإيمان للبيهقي: ١٦٤٨].

অর্থাৎ: "কিয়ামতের দিন চারটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কোন বান্দা এক পা সামনে অগ্রসর হতে পারবে না: (ক) তার বয়সকে কোন পথে শেষ করেছে? (খ) তার যৌবনকে কোন পথে ব্যয় করেছে? (গ) তার মাল কোন পন্থায় উপার্জন করেছে ও কোথায় ব্যয় করেছে? এবং (ঘ) সে তার ইলম অনুযায়ী আমল করেছে কিনা?" [*শুয়াবুল ঈমান*, আল-বায়হাক্বী, ১৬৪৮)।

সূরার আমল:

(ক) জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে দুনিয়ার উপর আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়া।
(খ) দুনিয়াকে আখেরাত অর্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা।

(سُوْرَةُ الْعَصْرِ)

সূরা আস্‌র এর পরিচয়:

সূরার নাম: এ সূরার নাম হলো সূরাতু 'আল-আস্‌র', অথবা সূরাতু 'ওয়াল-আস্‌র' (তাওকীফী নাম)। সকল মুসহাফ এবং তাফসীর গ্রন্থে এ নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

(*তাফসীর মাওজুয়ী*, ১০/৩২৫) ।

সূরার আলোচ্যবিষয়: মানব জীবনের চার দফা কর্মসূচী।

সূরার ফযিলত: সূরাটি মুফাস্‌সালাত এর অন্তভূক্ত। মুফাস্‌সাল সূরার ফযিলত সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন:

(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].

অর্থাৎ: "প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্‌সাল সূরাগুলো"।

(*সুনানে দারিমী*, ৪৩২০) ।

আরো একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةِ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].

অর্থাৎ: "আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিসিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিসিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্‌সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি"। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪) ।

হাদীসে মুফাস্‌সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

এ সূরার ফজিলাত সম্পর্কে আবু হুজাইফা (রা.) থেকে একটি হাদীস পাওয়া যায়, তিনি বলেন:

كَانَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ' إِذَا الْتَقَيَا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَقْرَأَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ: ﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾، ثُمَّ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ. [المعجم الأوسط للطبراني: ٥١٢٤].

অর্থাৎ: "রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দুই সাহাবী ছিলো, যাদের মধ্যে সাক্ষাত হলে একে অপরের উপর সূরা আস্‌র না পড়া পর্যন্ত পৃথক হতো না। সূরা আস্‌র পড়ার পর একে অপরকে সালাম দিয়ে বিদায় নিতো" [*মু'যাম আল-আউসাত*, তিবরানী, ৫১২৪] ।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ১০৩তম সূরা।

অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ১২তম সূরা, যা 'সূরা সারহ' এর পরে এবং 'সূরা আদিয়াত' এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

অবতীর্ণের স্থান: মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা মাক্কিয়্যাহ। (*বিতাকাত আল-তারীফ*, ৩৫০) ।

আয়াত সংখ্যা: ৩টি।

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: এ সূরাটি অবতীর্ণের কোনো প্রেক্ষাপট পাওয়া যায় না।

﴿وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)﴾ [سورة العصر].

সূরার আলোচ্য বিষয়: মানব জীবনের চার দফা কর্মসূচী।

সূরার সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১	মহাকালের শপথ।	২	নিশ্চয়	সকল মানুষ	ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে রয়েছে।	৩	কিন্তু
	وَالْعَصْرِ		إِنَّ	الْإِنْسَانَ	لَفِي خُسْرٍ		إِلَّا

(তারা নয়) যারা	ঈমান আনে,	আমলে সালিহ করে,	পরস্পরকে হকের উপদেশ দেয়
الَّذِينَ	آمَنُوا	وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ	وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ

এবং পরস্পরকে সবরের উপদেশ দেয়।	
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ	

সূরার ভাবার্থ:

আল্লাহ তায়ালা এমন এক মহাকালের শপথ করে মানুষের শ্রেনীবিন্যাস করেছেন যে কালে দিবারাত্রির আবর্তন-বিবর্তন সহ মানুষের উপর দিয়ে ঘটে যাওয়া অসংখ্য বিস্ময়কর বিষয় রয়েছে যা তাঁর মহত্মের প্রমান বহন করে। শপথ করার পর তিনি বলেছেন, নিশ্চয় মানব জাতি দুই প্রকার: এক দল ক্ষতিগ্রস্ত এবং অপর দল ক্ষতিগ্রস্ত নয়। যারা ক্ষতিগ্রস্ত নয় তাদের বৈশিষ্ট হলো চারটি: (ক) ঈমান গ্রহণ করা, (খ) সৎআমল করা, (গ) পরস্পরে সৎআমল এবং সত্যেকে কথায়, কাজে ও বিশ্বাসে আকড়ে ধরার প্রতি উপদেশ দেয়া এবং (ঘ) পরস্পররে সৎআমল ও হক পথে অটুট থাকতে সবরের উপদেশ দেয়া।

(*আল-মোন্তাখাব*, ৯২৬, *আল-মোয়াস্সার*, ১/৬০১)।

অত্র সূরার সাথে পূর্বের ও পরের সূরার সম্পর্ক:

অত্র সূরাতে মানুষকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে: (ক) যারা ক্ষতিগ্রস্ত এবং (খ) যারা ক্ষতিগ্রস্ত নয়। দ্বিতীয় প্রকারের চার দফা কর্মসূচী হলো: (ক) তারা দুনিয়ার মায়া উপেক্ষা করে ঈমান গ্রহণ করে, (খ) সৎআমল করে, (গ) অন্যকে হকের দিকে আহবান করে এবং (গ) সৎআমল ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে আগত যুলম-নির্যাতনে ধৈর্যধারণ করে।

আর পূর্বের সূরা অর্থাৎ সূরা তাকাসুর এ আলোচনা করা হয়েছে প্রথম প্রকার তথা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ সম্পর্কে, যারা দুনিয়ার সম্পদের মোহে বিভোর হয়ে তা অর্জনের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত ব্যস্ত থাকে, তারা অচিরেই স্বচোক্ষে জাহান্নামের শাস্তি দেখতে পাবে।

এবং পরের সূরা অর্থাৎ সূরা 'হুমাযাহ'এ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের শাস্তির বর্ণনার পাশাপাশি তাদের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে: (ক) দুনিয়া পাওয়ার নেশায় সামনাসামনি অন্যের নিন্দা করে, (খ) পিছনে গীবত করে এবং (গ) দুনিয়ার সম্পদের মোহে পড়ে তা নিয়ে মত্ত থাকে। সুতরাং সূরাগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

সূরার শিক্ষা:

১। অত্র সূরাতে আল্লাহ তায়ালা আসর সময়ের শপথ করার মাধ্যমে তার গুরুত্ব, ফযিলত ও মহত্বের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। যেমন একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ يَعْنِي كَاذِبًا، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ) [أبو داود: ٣٤٧٤].

অর্থাৎ: "তিন শ্রেনীর মানুষের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, (ক) এমন ব্যক্তি, যে অতিরিক্ত পানি থাকা সত্বেও পথিককে পানি প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়, (খ) এমন ব্যক্তি, যে আসরের পরে মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রয় করে এবং (গ) এমন ব্যক্তি, যে শাসকের হাতে বয়াত গ্রহণের পর তাকে সুযোগ-সুবিধা দিলে শপথ বহাল রাখে অন্যথায় বয়াত ভংগ করে" (*সুনানে আবু দাউদ*, ৩৪৭৪) । এছাড়াও আল্লাহ তায়ালা কখনও রাতের, কখনও দিনের, কখনও ফজরের আবার কখনও দিপ্রহারের শপথ করে সাধারনভাবে সময়ের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। ইবনু মাসউদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ) [سنن الترمذي: ٢٦٠١].

অর্থাৎ: "বনী আদম কিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এক পা সামনে অগ্রসর হতে পারবে না: (ক) সে তার জীবনকে কোন পথে পরিচালনা করেছে? (খ) সে তার যৌবনকে কোন পথে ব্যয় করেছে? (গ) সে কোন পন্থায় সম্পদ অর্জন করেছে? (ঘ) অর্জিত সম্পদ কোন পথে ব্যয় করেছে? এবং (ঙ) অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কি আমল করেছে?" (সুনানে তিরমিযী, ২৬০১) । এছাড়াও অনেক হাদীস রয়েছে, যা সময়কে মূল্যায়ন না করার ক্ষতি সম্পর্কে কথা বলেছে।

২। মানুষের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন বস্তুর শপথ করা জায়েজ নেই। আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে ধরাবাঁধা কোন নিয়ম নেই। তবে তিনি যে বিষয়ে কথা বলতে চান সে বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কোন বস্তুর শপথ করে কথা বলেন। (*তাফসীর আহসানুল বয়ান*, ১১০৪) ।

৩। মানুষের মুক্তির একমাত্র উপায় হলো, আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ব চার দফা কর্মসূচী জীবনে বাস্তবায়ন করা। কর্মসূচীসমূহ হলো: (ক) ছয়টি বিষয়ের প্রতি ঈমান গ্রহণ করা, (খ) রাসূলুল্লাহর (সা.) তরিকায় সৎআমল করা (গ) অন্যকে ঈমান ও সৎআমলের দিকে আহবান করা এবং (গ) ঈমান ও সৎআমলকে প্রতিষ্ঠা করতে আগত যুলম-নির্যাতনে ধৈর্যধারণ করা। আর যারা এ চার দফা কর্মসূচীকে গ্রহণ করবে না তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(*তাফসীর মাওজুয়ী*, ১০/৩৩৭) ।

সূরার আমল:

১। সূরায় বর্ণিত চার দফা কর্মসূচী দিয়ে জীবনকে রঞ্জিত করা।

২। কারো সাথে সাক্ষাত হলে এ সূরাটি তিলাওয়াত করে তার মর্মার্থ উপলব্দি করা।

(سُورَةُ الْهُمَزَة)

সূরা হুমাযাহ এর পরিচয়:

সূরার নাম: এ সূরার চারটি নাম পাওয়া যায়:
(ক) সূরাতু আল-হুমাযাহ (তাওকীফী নাম), সূরাটি এ নামেই পরিচিত। সকল মুসহাফে এবং অধিকাংশ তাফসীর গ্রন্থে এ নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। এ শব্দটি সূরার শুরুতে থাকার কারণে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে। হুমাযাহ এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে পরনিন্দা করে।
(খ) সূরাতু ‘ওয়াইলুল লিকুল্লি হুমাযাতিল লুমাযাহ’ (ইজতেহাদী নাম), ইমাম তবারী (র.) এ নামটি তার তাফসীরে উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম বুখারী শিরোনাম করেছেন।
(গ) সূরাতু ‘আল-হুতামাহ’ (ইজতেহাদী নাম), ফাইরুজ আবাদী এ নাম উল্লেখ করেছেন।
(ঘ) সূরাতু ‘আল-লুমাযাহ’ (ইজতেহাদী নাম), কিছু মুসহাফে এ নামটি উল্লেখ করা হয়েছে।
(*তাফসীর মাওজুয়ী*, ১০/৩৩৯-৩৪০)।

সূরার আলোচ্যবিষয়: নিন্দাকারী ও গীবতকারীর শাস্তি।

সূরার ফযিলত: বিশুদ্ধ হাদীস অনুযায়ী সূরাটির সতন্ত্র কোন ফযিলত পাওয়া যায় না। তবে এটি মুফাস্সালাত এর অন্তর্ভুক্ত। মুফাস্সাল সূরার ফযিলত সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন:
(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].
অর্থাৎ: “প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্সাল সূরাগুলো”।
(*সুনানে দারিমী*, ৪৩২০)।
আরো একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةِ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].
অর্থাৎ: “আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিসিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিসিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি”। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪)।
হাদীসে মুফাস্সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ১০৪তম সূরা।
অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ৩১তম সূরা, যা ‘সূরা কিয়ামাহ’ এর পরে এবং ‘সূরা মুরসালাত’ এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।
অবতীর্ণের স্থান: মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা মাক্কিয়্যাহ। (*বিতাকাত আল-তারীফ*, ৩৫৩)।
আয়াত সংখ্যা: ৯টি।
অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: এ সূরাটি অবতীর্ণের একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে।

﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (١) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (٢) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٣) كَلَّا
لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (٤) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (٥) نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ (٦) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى
الْأَفْئِدَةِ (٧) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (٨) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (٩)﴾ [سورة الهمزة].

সূরার আলোচ্য বিষয়: নিন্দাকারী ও গীবতকারীর শাস্তি।

সূরার সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১	দুর্ভোগ	প্রত্যেক	পশ্চাতে গীবতকারী	(এবং) সামনে নিন্দাকারী জন্য।	২	যে (ব্যক্তি)
	وَيْلٌ	لِكُلِّ	هُمَزَةٍ	لُمَزَةٍ		الَّذِي
জমা করে	সম্পদ	এবং তা গণনা করে।	৩	সে ধারনা পোষণ করে	যে	তার সম্পদ
جَمَعَ	مَالًا	وَعَدَّدَهُ		يَحْسَبُ	أَنَّ	مَالَهُ
তাকে স্থায়ী করে রাখবে।	৪	কখনো নয়,	অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে	হুতামা (জাহান্নামে)।		
أَخْلَدَهُ		كَلَّا	لَيُنْبَذَنَّ	فِي الْحُطَمَةِ		
৫	হে নবী! তুমি কি জানো	হুতামাহ কি?	৬	তা হলো আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি।	৭	যা
	وَمَا أَدْرَاكَ	مَا الْحُطَمَةُ		نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ		الَّتِي
পৌঁছে যাবে	অন্তর পর্যন্ত।	৮	নিশ্চয় তা	তাদেরকে	পরিবেষ্টন করে রাখবে।	
تَطَّلِعُ	عَلَى الْأَفْئِدَةِ		إِنَّهَا	عَلَيْهِمْ	مُؤْصَدَةٌ	
৯	প্রলম্বিত স্তম্ভসমূহে।					
	فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ					

সূরার ভাবার্থ:

প্রত্যেক নিন্দাকারী ও গীবতকারীর জন্য ধ্বংস অবধারিত। যে অঢেল সম্পদ জমিয়ে তার মোহে পড়ে গরীবের হক আদায় না করে বার বার তা গণনা করে। আর ধারনা করে এ সম্পদ তাকে দুনিয়াতে স্থায়ী করে রাখবে এবং সকল ধরণের মুসিবত থেকে তাকে রক্ষা করবে। আল্লাহ তায়ালা জবাবে বলেন: তাদের এ ধারনা মোটেই ঠিক নয়, বরং তারা তাদের অপকর্মের জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। হে রাসূল আপনি কি জানেন ‘হুতামাহ’ কি? তা হলো প্রজ্বলিত অগ্নি, যার দাহ অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। যা জাহান্নামীদেরকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে রাখবে, সেখানে তাদেরকে প্রলম্বিত স্তম্ভের সাথে বেধে রাখা হবে, ফলে জাহান্নাম থেকে কেউ বের হতে পারবে না এবং বাহির থেকে কেউ প্রবেশও করতে পারবে না। (*আল-মোন্তাখাব*, ৯২৭, *আল-মোয়াস্‌সার*, ১/৬০১)।

সূরার অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿وَيْلٌ﴾ 'ধ্বংস', এ আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে দুইটি মত পাওয়া যায়:

(ক) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে বুঝানো হয়েছে।

(খ) জাহান্নামের তলদেশে অবস্থিত উপত্যকাকে বুঝানো হয়েছে, যেখানে দাগি আসামীদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। (*তাফসীর গরীব আল-কোরআন*, কাওয়ারী: ৮৩/১)।

﴿هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ 'গিবতকারী, নিন্দাকারী', আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: 'হুমাযাহ' হলো: গিবতকারী এবং 'লুমাযাহ' হলো: নিন্দাকারী। (দুররুল মানসূর, সুয়ূতী: ৮/৬২৪)।

সূরার সাথে আগে-পরের সূরার সম্পর্ক:

পূর্বের সূরা অর্থাৎ সূরা 'আসর'এ মানুষকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে: যারা ক্ষতিগ্রস্ত এবং যারা ক্ষতিগ্রস্ত নয়। যারা ক্ষতিগ্রস্ত নয়, তাদের বৈশিষ্ট্য হলো: ঈমান গ্রহণ করা, সৎআমল করা, হকের দিকে আহবান করা এবং বিপদে ধৈর্যধারণ করা। আর অত্র সূরাতে বলা হয়েছে: যারা ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। তাদের বৈশিষ্ট্য হলো: সামনাসামনি অন্যের নিন্দা করা, পিছনে গীবত করা এবং দুনিয়ার মোহে পড়া। সুতরাং দুই সূরার মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট। (*রূহুল মায়ানী*, ৩০/২২৯)।

সূরাটি অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

ইবনু ইসহাক (র.) বলেন: উমাইয়্যাহ ইবনু খালফ রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দেখলে নিন্দা করতো এবং তার অনুপস্থিতে গীবত করতো। এ অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা অত্র সূরা অবতীর্ণ করে উমাইয়্যাহকে সতর্ক করে দিলেন। (*লুবাব আল-নুকূল*, ৩৬৯)।

আবু হাইয়্যান (র.) বলেন: অত্র সূরা আখনাস ইবনু সুরাইক, অথবা আস ইবনু ওয়াইল, অথবা জামীল ইবু মা'মার, অথবা ওয়ালিদ ইবনু মুগীরা, অথবা উমাইয়্যাহ ইবনু খালফ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। বলা যায় যে, সূরাটি উল্লেখিত সকলের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। (*আল-বাহর আল-মুহীত*, ৮/৫১০)।

সূরার শিক্ষা:

১। সাইয়্যেদ কুতুব (র.) বলেন: যারা অন্যের নিন্দা করে, অন্যের কুৎসা রটিয়ে বেড়ায় এবং দুনিয়ার সম্পদের মোহে অহংকারী ও বেপরোয়া হয়ে উঠে; তাদের জন্য সম্পদ অর্জনই হয় জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, সম্পদ উপার্জন করতে হালাল আর হারামের কোনো বাচবিচার করে না, সম্পদ অর্জনের পথে যে বাধা হয় তাকে হত্যা করতে একটু বিবেকে বাধে না, সম্পদের দাপটে অন্যকে মূল্যায়ন করার প্রয়োজন মনে করে না, সম্পদই তাদেরকে অমর করে রাখবে বলে বিশ্বাস করে এবং এ সম্পদই বিপদে-আপদে রক্ষা করবে। অত্র সূরাতে আল্লাহ তায়ালা এ চিত্রটিকে চিত্রয়িত করেছেন এবং তাদের ভয়াবহ শাস্তির কথা বর্ণনা করেছেন। (*তাফসীর মাওজুয়ী*, ১০/৩৪২)।

২। আবু বকর আল-জাজায়িরী (র.) এ সূরার তিনটি শিক্ষা বর্ণনা করেছেন: (ক) দুনিয়ার ভালো-মন্দ কর্মের পুরস্কার ও তিরষ্কারের জন্য পুনর্জীবন দিবস সত্য। (খ) নিন্দা করা, কুৎসা

রটনা এবং গীবত চর্চাকে হারাম করা হয়েছে। (গ) দুনিয়ার সম্পদের মোহে পড়ে বেপরোয়া হওয়াকে হারাম করা হয়েছে। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ৫/৬১৫) ।

৩। নিন্দা করা, গীবত চর্চা এবং সম্পদের মোহে বেপরোয়া হওয়া কাফিরদের বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য ধারণ করার শাস্তি হলো: তাদেরকে জাহান্নামের দীর্ঘ পিলারের সাথে বেধে জ্বলন্ত আগুণ দিয়ে বেষ্টন করে ফেলা হবে। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/৪০২) ।

৪। ইসলাম সর্বদাই আদর্শ সমাজ গঠনের পক্ষে কথা বলে। অত্র সূরাতেও সুন্দর সমাজ গঠন করতে তিনটি পরিত্যায্য গুনের বর্ণনা রয়েছে: কুৎসা, গীবত এবং শুধু আমি চাই।

৫। জাহান্নামের আগুনের কিছু বৈশিষ্ট্য:

(ক) জাহান্নামের আগুনের ইন্ধন হবে পাথর এবং মানুষ। যা ২৪ নাম্বার আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে।

(খ) জাহান্নামের আগুন অত্যন্ত তাপ ও দাহযুক্ত হবে, সূরা ক্বারিয়াতে জাহান্নামের আগুনকে 'হামিয়াহ' বলা হয়েছে, যার অর্থ হলো অত্যন্ত তাপ ও দাহযুক্ত। সুতরাং দুনিয়ায় আমরা যে আগুন ব্যবহার করি তা 'হামিয়াহ' নয়। জাহান্নামের হামিয়াহ আগুন সম্পর্কে আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تُوقِدُ بَنُو آدَمَ جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، فَقِيلَ: وَاللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا، كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا) [الشريعة: ٩٣٣].

অর্থাৎ: "এ দুনিয়ার আগুন, যা আদম সন্তান ব্যবহার করে, তার তাপের পরিমান হলো জাহান্নামের আগুনের ৭০ ভাগের এক ভাগ। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, দুনিয়ার আগুনের মত হলেই তো জাহান্নামীদেরকে সাস্তি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তরে বললেন: জাহান্নামের আগুনের দাহ ক্ষমতা দুনিয়ার আগুনের চেয়ে ৯৯ গুণ বেশী। আর দুনিয়ার সকল জ্বালানী এবং আগুন একত্র করে প্রজ্বলন করা হলে যে তাপ হয় তা জাহান্নামের এক গুণ দাহ ক্ষমতার সমান" (*সহীহ মুসলিম*, ৭৩৪৪) । (*তাফসীর মাওজুয়ী*, ১০/৩১২) ।

(গ) জাহান্নামের আগুন অন্তরকে জ্বালাবে, যেমন: সূরা হুমাযাতে জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে বলা হয়েছে:

﴿ نَارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ (٦) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (٧) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (٨) ﴾ [سورة الهمزة: ٦-٨].

অর্থাৎ: "তা হলো প্রজ্বলিত অগ্নি। যার দাহ অন্তর পর্যন্ত পোঁছে যাবে। যা জাহান্নামীদেরকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে রাখবে" (*সূরা হুমাযাহ*, ৬-৮)।

৬। অত্র সূরায় রাসূলুল্লাহ (সা.) কে শান্তনা দেওয়া হয়েছে।

সূরার আমল:

(ক) কারো নিন্দা করা, গীবত চর্চা এবং সম্পদের মোহে বেপরোয়া হওয়া থেকে বিরত থাকা।

(খ) জাহান্নামে আগুনের কথা ভয় করে আখেরাত ভিত্তিক জীবন যাপন করা।

(سُوْرَةُ الْفِيْلِ)

সূরা ফীল এর পরিচয়:

সূরার নাম: এ সূরার চারটি নাম পাওয়া যায়:
(ক) সূরাতু ফীল (তাওকীফী নাম), সূরাটি এ নামেই পরিচিত। সকল মুসহাফে এবং অধিকাংশ তাফসীর গ্রন্থে এ নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। হস্তী বাহিনীর ঘটনা এ সূরায় থাকার কারণে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।
(খ) সূরাতু ‘আলাম তারা কাইফা’ (ইজতেহাদী নাম), কতিপয় সাহাবী এ নাম দিয়েছেন।
(গ) সূরাতু ‘আলাম তারা’ (ইজতেহাদী নাম), ইমাম বুখারী (র.) তার সহীহ গ্রন্থে এ নামে শিরোনাম করেছেন।
(ঘ) ‘আল-মানজিলাতু আলা আসহাবিল ফীল’ (ইজতেহাদী নাম), ইবনুল আরাবী তার তাফসীর এ নামটি উল্লেখ করেছেন। (*তাফসীর মাওজুয়ী*, ১০/৪৭-৩৪৮) ।

সূরার আলোচ্যবিষয়: হস্তী বাহিনীর ঘটনা।

সূরার ফযিলত: বিশুদ্ধ হাদীস অনুযায়ী সূরাটির সতন্ত্র কোন ফযিলত পাওয়া যায় না। তবে এটি মুফাস্সালাত এর অন্তভূক্ত। মুফাস্সাল সূরার ফযিলত সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন:
(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].
অর্থাৎ: “প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্সাল সূরাগুলো”।
(*সুনানে দারিমী*, ৪৩২০)।
আরো একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةَ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].
অর্থাৎ: “আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিসিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিসিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি”। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪) ।
হাদীসে মুফাস্সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ১০৫তম সূরা।
অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ১৮তম সূরা, যা ‘সূরা কাফিরূন’ এর পরে এবং ‘সূরা ফালাক্ব’ এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।
অবতীর্ণের স্থান: মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা মাক্কিয়্যাহ। (*তাফসীর মাওজুয়ী*, ৩৪৮) ।
আয়াত সংখ্যা: ৫টি।
অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: এ সূরাটি অবতীর্ণের কোনো প্রেক্ষাপট পাওয়া যায় না।

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (٢) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (٣) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (٥)﴾ [سورة الفيل].

সূরার আলোচ্য বিষয়: হস্তী বাহিনীর ঘটনা।

সূরার সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১	আপনি কি দেখেননি	কিরূপ	আচরণ করেছিলেন	আপনার রব	হস্তী বাহিনীর সাথে?
	أَلَمْ تَرَ	كَيْفَ	فَعَلَ	رَبُّكَ	بِأَصْحَابِ الْفِيلِ
২	তিনি কি করেননি	তাদের ষড়যন্ত্রকে	ব্যর্থতায় পর্যবসিত?	৩	আর তিনি পাঠিয়েছিলেন
	أَلَمْ يَجْعَلْ	كَيْدَهُمْ	فِي تَضْلِيلٍ		وَأَرْسَلَ
তাদের বিরুদ্ধে	ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী।	৪	তারা তাদেরকে নিক্ষেপ করে	পোড়ামাটির পাথর।	
عَلَيْهِمْ	طَيْرًا أَبَابِيلَ		تَرْمِيهِمْ	بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ	
৫	অতঃপর তিনি তাদেরকে করেছিলেন	ভক্ষিত ঘাসের মত।			
	فَجَعَلَهُمْ	كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ			

সূরার ভাবার্থ:

হে নবী! কা’বা ঘর ধ্বংস করার জন্য ইয়ামান থেকে আসা আবরাহা এবং তার হস্তী বাহিনীর সাথে আপনার রবের আচরণের ইতিহাস আপনি অবশ্যই অবগত আছেন। তিনি কা’বা ধ্বংসের সকল নীলনকশাকে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাঠিয়েছিলেন, যারা তাদের উপর পোড়া মাটির পাথর নিক্ষেপ করে তাদের পরিণতি খেয়ে ফেলা ঘাসের মতো করে দিয়েছিলেন।

(*আল-মোন্তাখাব*, ৯২৮, *আল-মোয়াস্সার*, ১/৬০১)।

সূরা সংশ্লিষ্ট ঘটনা:

হাবশার বাদশাহর পক্ষ থেকে ইয়ামান দেশে গভর্ণর ছিলো ‘আবরাহা’। সে ইয়ামানের বর্তমান রাজধানী ‘সানআ’তে বিশাল একটি গীর্জা তৈরি করে। উদ্দেশ্য ছিলো লোকেরা কা’বা ত্যাগ করে ইবাদত ও হাজ্জ-ওমরা পালনের জন্য এ গীর্জায় জড়ো হবে। তার এ কাজে কোরাইশ গোত্রের একজন ক্রোধ হয়ে তার ভিতর পায়খানা করে নোংরা করে ফেলে। এতে ‘আবারাহা’ ক্ষিপ্ত হয়ে কা’বা ঘর ধ্বংস করার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করে। এ উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যক হস্তী বাহিনী নিয়ে মক্কার দিকে রওয়ানা দেয়। মক্কার নিকটে পৌঁছে মক্কার সর্দার রাসূলুল্লাহর (সা.) দাদা আব্দুল মোত্তালেবের দুই শত উট দখল করে নেয়। আব্দুল মোত্তালেব তার উটগুলো ছাড়িয়ে আনার জন্য গেলে ‘আবরাহা’ তাকে বললো: আমরা তোমাদের কা’বা ধ্বংস করতে এসেছি তা নিয়ে তোমার কোন মাথা ব্যাথা দেখছি না, তুমি তোমার উটের জন্য দিশেহারা হয়ে পড়েছো। উত্তরে আব্দুল মোত্তালেব বললো: আমার উট আমাকে দিয়ে দাও। কা’বার

মালিকতো আমি না, কা'বার মালিক যিনি, তিনিই তা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবেন। অতঃপর তারা মীনায় পৌঁছলে আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি পাখীর ঠোটে ও দুই পায়ে তিনটি করে পাথর টুকরা সহ ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাঠিয়ে তাদেরকে নির্মমভাবে ধ্বংস করার মাধ্যমে কা'বাকে রক্ষা করলেন। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ৫/৬১৬) ।

এ সূরার সাথে পূর্বের সূরার সম্পর্ক:

যারা দুনিয়ার ধনসম্পদের মোহে পরে এ বিশ্বাস লালন করে যে, এ সম্পদ তাদেরকে স্থায়ী করে রাখবে, তাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সূরা হুমাযাহ এ আলোচনা করা হয়েছে। আর অত্র সূরায় আল্লাহ তায়ালা আবরাহা ও হস্তী বাহিনীর পরিণতি বর্ণনার মাধ্যমে তার উদাহরণ বা বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। (*তাফসীর মাওজুয়ী*, ১০/৩৫২-৩৫৩) ।

এ সূরার সাথে পরের সূরার সম্পর্ক:

অত্র সূরাতে আবরাহা সহ তার হস্তী বাহিনীকে নির্মমভাবে ধ্বংস করে সমুচিৎ জবাব দেওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়েছে। হস্তী বাহিনী ধ্বংসের খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে মক্কাবাসীর মর্যাদা বিশ্বদরবারে বহুগুণে বেড়ে গেলো। এমনকি ইয়ামান-সিরিয়াও তাদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে ব্যবসার জন্য অবাধে সফর করার স্থায়ী অনুমতি দিয়ে দিলেন। এবং পরের সূরাতে কোরাইশকে অত্র নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে কেবল আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সূরা ফিল এবং সূরা কুরাইশ দুইটি মিলেই কেমন যেন একটি সূরা, যদিও পরের সূরাটিকে বাসমালাহ দিয়ে শুরু করার মাধ্যমে আলাদা করা হয়েছে।

(*তাফসীর মওজুয়ী*, ১০/৩৬৭) ।

সূরায় বর্ণিত উপমার ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তায়ালার নিয়ম হলো: অদৃশ্য বা অস্পষ্ট বিষয়কে দৃশ্যমান বা স্পষ্ট বিষয়ের সাথে উপমা দিয়ে বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া। লক্ষনীয় যে, বালাগাতের পরিভাষায় একটি উপমাতে চারটি বিষয় থাকে: (ক) যাকে উপমা দেওয়া হয়, (খ) যার সাথে উপমা দেওয়া হয়, (গ) উপমা দেওয়ার হরফ এবং (ঘ) উপমার উদ্দেশ্য।

অত্র সূরার উপমাটি হলো:

- যাকে উপমা দেওয়া হয়েছে: হস্তী বাহিনীর ধ্বংসস্তুপ।
- যার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে: ভক্ষিত ঘাস।
- উপমা প্রদানের হরফ: (ك) 'কাফ' (মত)।
- উপমা প্রদানের উদ্দেশ্য: ধ্বংসের ভয়াবহতা।

অর্থাৎ: হস্তী বাহিনীর ধ্বংসস্তুপ ভয়াবহতার দৃষ্টিকোন থেকে ভক্ষিত ঘাসের মতো।

(*তাফসীর আল-মোয়াস্সার*, ১/৬০১) ।

সূরার শিক্ষা:

১। অত্র সূরাতে মোহাম্মদ (সা.) কে সম্বোধন করে আবরাহা ও তার হস্তী বাহিনীর ঘটনা বর্ণনা করা হলেও, মূলত এ সম্বোধন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সকল মানুষ। আল্লাহ তায়ালা কেমন যেন বলেছেন: হে মানব জাতি! তোমরাতো আবরাহা ও তার হস্তী বাহিনীর ধ্বংসের ইতিহাস জানো, কিভাবে আমি তাদের যুলমকে প্রতিহত করে তোমাদের উপর দয়া করেছি। সুতরাং এরপরেও কিভাবে তোমরা অবাধ্য হতে পারো?!

২। হস্তি বাহিনী ধ্বংসের ইতিহাস নিম্নোল্লেখিত বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত বহণ করে:

(ক) আল্লাহর অপরিসীম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ।

(খ) মোহাম্মদ (সা.) এর প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন। কারণ, এ ঘটনার বছর তার জন্ম হয়েছিল।

(গ) কা'বা শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং কোরাইশদের প্রতি আল্লাহর দয়ার বহিঃপ্রকাশ।

(*আল-বাহ্‌র*, ৩২/৯৭; *আল-রাজী*, ৮/৫১২; *আল-মুনীর*, ৩০/৪০৯-৪১০) ।

৩। এখানে দুইটি উহ্য প্রশ্ন ও তার উত্তর:

(ক) আল্লাহ তায়ালা আবরাহা ও তার হস্তী বাহিনীকে কা'বা ধ্বংস করতে আসার কারণে সমূলে ধ্বংস করেছিলেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফও কা'বা ধ্বংস করতে এসেছিলো তাকে কেন ধ্বংস করলেন না? এর উত্তর হলো: আবরাহা স্বেচ্ছায় বুঝে-শুনে কা'বা ঘর ধ্বংস করতে এসেছিলো, অপরদিকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কা'বা ধ্বংসের ইচ্ছা ছিলো না, সে মূলত ইবনু জুবায়েরকে হত্যা করতে চেয়েছিলো।

(খ) কা'বাকে ধ্বংস করতে আসার কারণে আবরাহা ও তার হস্তী বাহিনীকে নির্মমভাবে ধ্বংস করা হলো, অথচ কোরাইশরা কা'বা ঘরে ৩৬০টি মূর্তি রেখে আল্লাহর ইবাদত বাদ দিয়ে যুগের পর যুগ মুর্তিপুজা করছিলো তাদের ব্যাপারে কোনো কিছুই করা হলো না। এর কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তর হলো: আবরাহা কা'বা ধ্বংস করার মাধ্যমে বান্দার অধিকার নষ্ট করতে চাচ্ছিলো, অপরদিকে কোরাইশরা কা'বার মধ্যে মূর্তি রেখেছিলো মূলত নিজেদের বানানো পদ্ধতিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য, যার মাধ্যমে আল্লাহর অধিকার নষ্ট করেছিলো। আল্লাহর অধিকার নষ্ট হলে তিনি চাইলে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু কেউ বান্দার অধিকার নষ্ট করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না। (*আল-মুনীর*, ৩০/৪১০) ।

৪। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন: ঝাঁকেঝাঁকে পাখী যখন পাথর টুকরাগুলো মেরেছিলো, তখন আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি পাথরের সাথে দ্রুতগামী বাতাশকে নিয়োজিত করে দিলেন, যা পাথরের গতিকে বহুগুনে বাড়িয়ে দিয়ে শত্রু বাহিনীকে প্রচন্ডভাবে আঘাত করতে সক্ষম হয়েছিলো। ফলে নিক্ষিপ্ত পাথরগুলো যাকে স্পর্শ করেছিলো, সে জায়গাতেই দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। (*তাফসীর আল-কুরতুবী*, ২০/২৯৯) ।

সূরার আমল:

আল্লাহর ক্ষমতার কথা মনেপ্রানে বিশ্বাস করে একত্ববাদের দিকে ফিরে আসা।

(سُوْرَةُ قُرَيش)

সূরা কুরাইশ এর পরিচয়:

সূরার নাম: এ সূরার তিনটি নাম পাওয়া যায়:
(ক) সূরাতু কুরাইশ (তাওকীফী নাম), সকল মুসহাফে এবং অধিকাংশ তাফসীর গ্রন্থে এ নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। শব্দটি সূরায় থাকার কারণে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।
(খ) সূরাতু 'লিইলাফি কুরাইশ' (তাওকিফী নাম), কতিপয় সাহাবী এ নাম দিয়েছেন। ইমাম বুখারী (র.) তার সহীহ গ্রন্থে এ নামে শিরোনাম করেছেন। তাছাড়া ইবনু আরাবী, ইমাম আলূসী তাদের তাফসীর গ্রন্থে এ নামটি উল্লেখ করেছেন।
(গ) সূরাতু 'লিইলাফ' (ইজতেহাদী নাম), এ নামটি ইমাম সাওকানী তার তাফসীর গ্রন্থ 'ফাতহুল ক্বাদীর' এ এবং ইবনু জাওযী 'যাদ আল-মাসীর'এ অত্র নামটি উল্লেখ করেছেন।
(*তাফসীর মাওজুয়ী*, ১০/৩৬৩-৩৬৪) ।

সূরার আলোচ্যবিষয়: নেয়ামতের শুকরিয়ায় একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করার নির্দেশ।

সূরার ফযিলত: বিশুদ্ধ হাদীস অনুযায়ী সূরাটির সতন্ত্র কোন ফযিলত পাওয়া যায় না। তবে এটি মুফাস্সালাত এর অন্তভুক্ত। মুফাস্সাল সূরার ফযিলত সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন:
(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].
অর্থাৎ: "প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্সাল সূরাগুলো"।
(*সুনানে দারিমী*, ৪৩২০)।
আরো একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةَ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].
অর্থাৎ: "আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিসিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিসিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি"। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪) ।
হাদীসে মুফাস্সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ১০৬তম সূরা।
অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ২৮তম সূরা, যা 'সূরা ত্বীন' এর পরে এবং 'সূরা ক্বারিয়াহ' এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।
অবতীর্ণের স্থান: মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা মাক্কিয়্যাহ। (*তাফসীর মাওজুয়ী*, ৩৬৪) ।
আয়াত সংখ্যা: ৪টি।
অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। যা সূরার ব্যাখ্যায় আসবে, ইনশাআল্লাহ।

﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (١) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣)
الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤)﴾ [سورة قريش].

সূরার আলোচ্য বিষয়: নেয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ।

সূরার সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

১	যেহেতু অভ্যাস আছে	কোরাইশ (গোত্রের)	২	তাদের অভ্যাস আছে	সফর করার	
	لِإِيلَافِ	قُرَيْشٍ		إِيلَافِهِمْ	رِحْلَةَ	
শীত	এবং গ্রীষ্মে।	৩	অতএব তারা যেন ইবাদত করে	এই ঘরের রবের,	৪	যিনি
الشِّتَاءِ	وَالصَّيْفِ		فَلْيَعْبُدُوا	رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ		الَّذِي
তাদেরকে আহার দিয়েছেন	ক্ষুধার সময়	এবং তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছেন	ভয় হতে।			
أَطْعَمَهُمْ	مِنْ جُوعٍ	وَآمَنَهُمْ	مِنْ خَوْفٍ			

সূরার ভাবার্থ:

কোরাইশদের জন্য শীতকালে ইয়ামানে এবং গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় ব্যবসা-বানিজ্য এবং রিযক অন্বেষণের জন্য সফরকে নিরাপদ ও সহজ করে দেওয়ার জন্য ইয়ামান ও সিরিয়া বাসীরা মুগ্ধ হয়েছে। সুতরাং তাদের উচিৎ যেই কা’বার জন্য তারা বিশ্বদরবারে সম্মানিত হয়েছে সেই কা’বার প্রতিপালকের শুকরিয়া আদায় করা এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করা। যিনি তাদেরকে চাষাবাদ অনুপযোগী উপত্যকায় ক্ষুধার সময় আহার দিয়েছেন এবং তাদের চারদিকে বিরাজমান অপহরণকারীদের ভীতি-সন্ত্রস্ত থেকে নিরাপদ রেখেছেন।

(*আল-মোন্তাখাব*, ৯২৯, *আল-মোয়াস্সার*, ১/৬০২) ।

এ সূরার সাথে পূর্বের সূরার সম্পর্ক:

যখন আল্লাহ তায়ালা হস্তী বাহিনীকে নির্মমভাবে ধ্বংস করে সমুচিৎ জবাব দিলেন, তখন মক্কাবাসীর মর্যাদা বিশ্বদরবারে বহুগুণে বেড়ে গেলো। এমনকি ইয়ামান-সিরিয়াও তাদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে ব্যবসার জন্য অবাধে সফর করার স্থায়ী অনুমতি দিয়ে দিলেন। এ সূরাতে কুরাইশকে অত্র নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে কেবল আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সূরা ফিল এবং সূরা কুরাইশ দুইটি মিলেই কেমন যেন একটি সূরা, যদিও এ সূরাটিকে বাসমালাহ দিয়ে শুরু করার মাধ্যমে আলাদা করা হয়েছে।

(*তাফসীর মওজুয়ী*, ১০/৩৬৭) ।

সূরাটি অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

উম্মু হানী বিনতু আবু তালিব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: আল্লাহ তায়ালা কুরাইশ গোত্রকে সাতটি বৈশিষ্ট্য দিয়ে সম্মানিত করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো: তাদের সম্পর্কে আল্লাহ একটি সতন্ত্র সূরা অবতীর্ণ করেছেন, যা অন্য কোনো গোত্রের জন্য করেননি। অতঃপর তিনি সূরা কুরাইশ তিলাওয়াত করলেন। (*লুবাব আল-নুকূল*, ৩৭০) ।

সূরার শিক্ষা:

১। অত্র সূরায় কয়েকটি নেয়ামত স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কাফের-মোশরেকদের অত্যাচারে জর্জড়িত মোহাম্মদ (সা.) কে শান্তনা দেওয়া হয়েছে।

(*তাফসীরে মওজুয়ী*, ১০/৩৭২)।

২। কুরাইশ গোত্রের প্রতি আল্লাহর কয়েকটি নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে:

(ক) আবরাহার হস্তী বাহিনীকে ধ্বংস করে কা'বাকে তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা।

(খ) ইয়ামান ও সিরিয়ায় ব্যবসা-বানিজ্যের মাধ্যমে রিযকের ব্যবস্থা করা।

(গ) মক্কার অভ্যন্তরীণে এবং বহিঃবিশ্বে তাদের নিরাপত্তা বিধান করা।

(ঘ) কা'বাকে কুরাইশ গোত্রের তত্বাবধানে রেখে তাদেরকে মর্যাদাবান করা।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/৪১৭)।

৩। ইমাম মলিক (র.) এ সূরার মাধ্যমে দলীল পেশ করেছেন যে, পৃথিবীর জলবায়ুতে ঋতু মুলত দুইটি: শীত এবং গ্রীষ্ম। কারণ আল্লাহ তায়ালা এখানে দুইটি ঋতু উল্লেখ করেছেন। এজন্য আমরা দেখতে পাই মানুষ স্বভাবগতভাবে তাদের কার্যাবলীকে সময়ের উপযোগীতায় দুই ভাগে ভাগ করে নেয়। যেমন: পোষাকের ক্ষেত্রে বলা হয় শীতের কাপড় এবং গরমের কাপর, আনন্দ-প্রণোদনের সফর শীতের সময়ে না করে গ্রীষ্মে করা হয় ইত্যাদি। এখানে লক্ষণীয় যে, কাগজে-কলমে ঋতু অনেকগুলো থাকলেও বাস্তবে শীত-গ্রীষ্ম ছাড়া অন্যগুলো উল্লেখ করা হয় না। (*তাফসীর কুরতুবী*, ২০/২০৭)।

৪। তিন নাম্বার আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (র.) বলেন: নেয়ামত দুই প্রকার: (ক) কাউকে ক্ষতি থেকে প্রতিরক্ষা দেওয়া এবং (খ) উপকার প্রদান করা। সূরা ফীল এ প্রথম প্রকার নেয়ামতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং অত্র সূরায় দ্বিতীয় প্রকার নেয়ামতের বর্ণনা এসেছে। দুই প্রকার নেয়ামত উল্লেখ করার পর নেয়ামত প্রাপ্তদের করণীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের উচিৎ এ সকল নেয়ামতের শুকরিয়া স্বরুপ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা।

(*তাফসীর আল-কাবীর*, ৩২/১০৭)।

৫। অত্র সূরাটি "কুরাইশ গোত্রের অভ্যাসের কারণে, শীত-গ্রীষ্মে তাদের সফরের অভ্যাসের কারণে" বাক্য দিয়ে শুরু করা হয়েছে, যা 'ক্রিয়া' ও 'কর্তা' উহ্য রাখা একটি অসম্পূর্ণ বাক্য। উহ্য বাক্যাংশ কি হবে? এ ব্যাপারে তাফসীরকারকগণ দুইটি মত দিয়েছেন: (ক) উহ্য বাক্যাংশ হলো: 'ইয়ামান ও সিরিয়াবাসী মুগ্ধ হয়েছে'। তাহলে পরিপূর্ণ বাক্যটি হবে "কুরাইশ গোত্রের অভ্যাসের কারণে, শীত-গ্রীষ্মে তাদের সফরের অভ্যাসের কারণে ইয়ামান ও সিরিয়াবাসী মুগ্ধ হয়েছে"। (খ) উহ্য বাক্যাংশ হলো: 'হস্তী বাহিনীর সাথে আল্লাহ যা করেছেন'। পরিপূর্ণ বাক্যটি হবে "হস্তী বাহিনীর সাথে আল্লাহ যা করেছেন তা কুরাইশ গোত্রের অভ্যাসের কারণে, শীত-গ্রীষ্মে তাদের সফরের অভ্যাসের কারণে" (*আইসার আল-তাফাসীর*, ৫/৬১৮)। আমি অত্র সূরার ভাবার্থ লিখেছি প্রথম মতের আলোকে।

সূরার আমল:

আল্লাহ তায়ালার যত ধরণের নেয়ামত ভোগ করছি তার শুকরিয়া আদায়ের জন্য একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। এছাড়া কোন মানুষ থেকে উপকৃত হলে তার বিনিময়ে তাকে ক্ষতি না করে ভালো বদলা প্রদান করা। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

(سُوْرَةُ الـمَاعُون)

সূরা মাউন এর পরিচয়:

সূরার নাম: এ সূরার পাঁচটি নাম পাওয়া যায়:

(ক) সূরাতু আল-মাউন (তাওকীফী নাম), সকল মুসহাফে এবং অধিকাংশ তাফসীর গ্রন্থে এ নামটি উল্লেখ করা হয়েছে।

(খ) সূরাতু 'আরাআইতা' (ইজতেহাদী নাম), কতিপয় সাহাবী এ নাম দিয়েছেন। ইমাম বুখারী (র.) তার সহীহ গ্রন্থে এ নামে শিরোনাম করেছেন। তাছাড়া ইমাম তাবারী, ইবনু জাওযী, ইবনু আতিয়্যাহ এবং আল-জাস্সাস তাদের তাফসীর গ্রন্থে এ নামটি উল্লেখ করেছেন।

(গ) সূরাতু আল-দ্বীন (ইজতেহাদী নাম), এ নামটি কিছু মুসহাফে পাওয়া যায়। তাছাড়া ইমাম সাখাভী এবং সুয়ূতীও এ নামটি ব্যবহার করেছেন।

(ঘ) সূরাতু আল-ইয়াতীম (ইজতেহাদী নাম), ইমাম বাকাভী এবং শাওকানী এ নাম তাদের তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

(ঙ) এ সূরার আরেকটি ইজতেহাদী নাম রয়েছে 'আল-তাকযীব', যা ইবনু আশুর, আলুসী এবং খাফাজী তাদের তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছন।

(*তাফসীর মাওজুয়ী*, ১০/৩৭৫) ।

সূরার আলোচ্যবিষয়: কাফির ও মোনাফেকের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের পরিণতি।

সূরার ফযিলত: সূরাটির সতন্ত্র কোন ফযিলত নেই। তবে এটি মুফাস্সালাত এর অন্তভুক্ত। মুফাস্সাল সূরার ফযিলত সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন:

(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].

অর্থাৎ: "প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্সাল সূরাগুলো"।

(*সুনানে দারিমী*, ৪৩২০)।

হাদীসে মুফাস্সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ১০৭তম সূরা।

অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ১৬তম সূরা, যা 'সূরা তাকাসুর' এর পরে এবং 'সূরা কাফিরূন' এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

অবতীর্ণের স্থান: অধিকাংশ মুফাসসির এর মতে, মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা মাক্কিয়্যাহ।

(*তাফসীর মাওজুয়ী*, ৩৭৬) ।

আয়াত সংখ্যা: ৭টি।

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: দুইটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। যা সূরার ব্যাখ্যায় আসবে, ইনশাআল্লাহ।

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (٢) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)﴾ [سورة الماعون].

সূরার আলোচ্যবিষয়: কাফির ও মোনাফেকের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের পরিণতি।

সূরার সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:

১	তুমি কি (তাকে) দেখেছো	যে (ব্যক্তি),	অস্বীকার করে	হিসাব-প্রতিদানকে।		
	أَرَأَيْتَ	الَّذِي	يُكَذِّبُ	بِالدِّينِ		
২	সে তো ঐ (ব্যক্তি),	যে	কঠোরভাবে তাড়িয়ে দেয়	ইয়াতিমকে।	৩	সে উৎসাহ দেয় না
	فَذَلِكَ	الَّذِي	يَدُعُّ	الْيَتِيمَ		وَلَا يَحُضُّ
মিসকীনকে খাদ্য দানের প্রতি।	৪	সুতরাং দুর্ভোগ	ঐ সকল মুসল্লীদের জন্য	৫	যারা	
عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ		فَوَيْلٌ	لِلْمُصَلِّينَ		الَّذِينَ هُمْ	
নিজেদের সালাতে ব্যাপারে	উদাসীন।	৬	যারা	লোক দেখানোর জন্য তা করে।		
عَنْ صَلَاتِهِمْ	سَاهُونَ		الَّذِينَ هُمْ	يُرَاءُونَ		
৭	এবং বিরত থাকে	গৃহস্থালীর ছোট-খাট সামগ্রী (প্রদান করা থেকে)।				
	وَيَمْنَعُونَ	الْمَاعُونَ				

সূরার ভাবার্থ:

১। হে নবী! আপনি কি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে অবগত আছেন, যে ব্যক্তি আখিরাতের হিসাব ও প্রতিদানকে অস্বীকার করে।

২। তার সম্পর্কে যদি জানতে চান, তাহলে জেনে রাখুন সে তো ঐ ব্যক্তি, যে ইয়াতিমের প্রতি তুচ্ছজ্ঞানপূর্বক অহংকারবশত তাকে কঠোরভাবে তাড়িয়ে দেয়।

৩। যে অন্যকে অসহায় মিসকীনের জন্য খাদ্য দানের প্রতি উৎসাহিত করে না এবং নিজেও ইয়াতিম-মিসকীনকে খাবার দান করে না।

৪। সুতরাং ঐ সকল মুসল্লীর জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে, যারা সালাতে উদাসীন।

৫। যারা লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে।

৬। এবং গৃহস্থালীর ছোট-খাট সামগ্রী প্রদান করা থেকে বিরত থাকে।

(আইসার, ৫/৬২০, আল-মোন্তাখাব, ৯৩০, *আল-মোয়াস্সার*, ১/৬০২)।

সূরার অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الْمَاعُونَ﴾ আরবী শব্দ 'আউন' থেকে নির্গত 'ইসমুন জামিউন', যা গৃহস্থালী কাজে প্রয়োজন হয় এমন ছোট-খাট সামগ্রীকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন: বালতি, পাতিল, সুইচ, দাঁও, কুড়াল ইত্যাদি। (*তাফসীর গরীব আল-কোরআন*, আল-কাওয়ারী, ৭/১০৮) ।

সূরাটি অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

ইমাম মুকাতিল এবং ক্বালবী (র.) বলেন: প্রথম দুই আয়াত 'আস ইবনু ওয়াইল আল-সাহমী' সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। ইবনু জুরাইজ (র.) বলেন: আবু সুফিয়ান ইবনু হারাব প্রত্যেক সপ্তাহে দুইটি ছাগল যবেহ করতো। অতঃপর একজন ইয়াতিম এসে তার কাছে গোস্ত চাইলে, তাকে লাঠি দিয়ে প্রহর করে বিদায় দিলে অত্র সূরার প্রথম ও দুই নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করে আল্লাহ তায়ালা তাকে সতর্ক করে দিলেন। (*আসাবাব আল-নুযুল*, ওয়াহিদী, ৪৯৩) ।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: অত্র সূরার ৪র্থ আয়াতটি মোনাফিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। তারা মুমিনদেরকে দেখানোর জন্য তাদের সাথে থাকলে সালাত কায়েম করতো এবং তাদের অনুপস্থিতে সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকতো। এছাড়াও গৃহস্থালী কাজে প্রয়োজনীয় ছোট-খাট সামগ্রী মুমিনদেরকে ধার দিতো না। (*লুবাব আল-নুকুল*, ৩৭০) ।

সূরার শিক্ষা:

১। অত্র সূরায় কাফিরদের তিনটি এবং মোনাফেকদেরও তিনটি খারাপ বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। কাফেরের তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো:

(ক) হাশরের ময়দানে দুনিয়ার কর্মসমূহের হিসাব-নিকাশ ও কর্মফলকে অস্বীকার করা।
(খ) ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা এবং তুচ্ছজ্ঞানপূর্বক তাদেরকে অধিকার বঞ্চিত করা।
(গ) ফকীর-মিসকীনকে খাদ্য দান করা থেকে বিরত থাকা।

এবং মোনাফেকের তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো:

(ক) সালাতে অমনোযোগী থাকা।
(খ) লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করা।
(গ) গৃহস্থালী কাজে প্রয়োজনীয় ছোট-খাট সামগ্রী অন্যকে প্রদান না করা।

(*তাফসীরে মাওজুয়ী*, মোস্তফা মুসলিম, ১০/৩৮৩-৩৮৬) ।

(২) অত্র সূরায় আল্লাহ তায়ালা সমাজ সংহতির প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, সমাজের ধনী শ্রেনী যেন ইয়াতিম, ফকীর-মিসকীন ও অসহায় মানুষের প্রতি সদয় হয় এবং কারো প্রয়োজনে যেন তার পাশে দাঁড়ায়। এর মাধ্যমে একটি সমাজ সুন্দর হবে, ধনী-গরীবের মধ্যে দুরত্ব কমে আসবে, সকলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবে, সর্বত্র ভালবাসা ছড়িয়ে পড়বে এবং সবাই সবার জন্য হয়ে যাবে, যার ফলে প্রতিষ্ঠিত হবে একটি আদর্শ সমাজ। ইসলাম শুধু ইবাদতখানার ধর্ম নয়, বরং ইবাদত খানা থেকে শুরু করে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাস্ট্র এবং বিশ্ব পরিমন্ডল পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্র কিভাবে সুন্দর হবে সে পরিকল্পনা ইসলাম দিয়েছে।

সূরার আমল:

এ সূরার অন্যতম আমল হলো: একজন মুসলিম সর্বদা উল্লেখিত কাফের-মোনাফেকের স্বভাবগুলোকে পরিত্যাগ করে চলবে।

(سُوْرَةُ الكَوْثَر)

সূরা কাওসার এর পরিচয়:

সূরার নাম: এ সূরার তিনটি নাম পাওয়া যায়:

(ক) সূরাতু আল-কাওসার (তাওকীফী নাম), সকল মুসহাফে এবং বেশীর ভাগ তাফসীর গ্রন্থে এ নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র.) তার সুনানে এ নামে শিরোনাম করেছেন।

(খ) সূরাতু ইন্না আ'তাইনাকা আল-কাওছার (ইজতেহাদী নাম), সালাফদের কাছে এ নামটি প্রশিদ্ধ। ইমাম বুখারী (র.) তার সহীহ গ্রন্থে এ নামে শিরোনাম করেছেন। ইমাম সাখাভী (র.) তার ‘জামাল আল-কুররা’ কিতাবে এ নাম উল্লেখ করেছেন।

(গ) সূরাতু আল-নাহ্‌র (ইজতেহাদী নাম), ইমাম আলূসী (র.) তার তাফসীর গ্রন্থে এবং ইমাম বাকাভী তার ‘নাযম আল-দুরার’ গ্রন্থে এ নামটি উল্লেখ করেছেন।

(*তাফসীর মাওজুয়ী*, ১০/৩৮৭) ।

সূরার আলোচ্যবিষয়: রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যানের সুসংবাদ প্রদান।

সূরার ফযিলত: সূরাটির সতন্ত্র কোন ফযিলত নেই। **তবে এটি** মুফাস্‌সালাত এর অন্তভুক্ত। মুফাস্‌সাল সূরার ফযিলত সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন:

(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].

অর্থাৎ: “প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্‌সাল সূরাগুলো”।

(*সুনানে দারিমী*, ৪৩২০)।

আরো একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةِ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].

অর্থাৎ: “আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিসিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিসিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্‌সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি”। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪) ।

হাদীসে মুফাস্‌সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ১০৮তম সূরা।

অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ১৪তম সূরা, যা ‘সূরা আদিয়াত’ এর পরে এবং ‘সূরা তাকাসুর’ এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

অবতীর্ণের স্থান: সকল মোফাসসের একমত যে, মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা মাক্কিয়্যাহ। (*তাফসীর মাওজুয়ী*, ৩৮৮) ।

আয়াত সংখ্যা: ৩টি।

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। যা সূরার ব্যাখ্যায় আসবে, ইনশাআল্লাহ।

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣)﴾ [سورة الكوثر].

সূরার আলোচ্যবিষয়: রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যানের সুসংবাদ প্রদান।

সূরার সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:

১	হে নবী! নিশ্চয় আমি	তোমাকে দান করেছি	(প্রভুত কল্যান) কাওসার।	২	সুতরাং
	إِنَّا	أَعْطَيْنَاكَ	الْكَوْثَرَ		فَـ
তুমি সালাত কায়েম করো	তোমার রবের স্মরণে	এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে কোরবানী করো।			
صَلِّ	لِرَبِّكَ	وَانْحَرْ			
৩	ওদেরকে জানিয়ে দেন, নিশ্চয়	যে তোমার নিন্দুক	সেই হলো:	নির্বংশ।	
	إِنَّ	شَانِئَكَ	هُوَ	الْأَبْتَرُ	

সূরার ভাবার্থ:

হে আল্লাহর নবী! আমি আপনাকে দুনিয়া-আখিরাতে প্রভুত কল্যান দান করেছি। তার মধ্যে অন্যতম হলো জান্নাতের হাওযে কাওসার যা মনি-মুক্তার তাবু দিয়ে আচ্ছাদিত থাকবে এবং যার মাটি থেকে কস্তুরীর সুঘ্রাণ ছড়াবে। সুতরাং এর শুকরিয়া স্বরুপ তুমি একনিষ্টভাবে কেবল তোমার রবের জন্য সালাত কায়েম করো এবং কেবল তার নামে কোরবানী করো। আর যারা আপনাকে নির্বংশ বলে গালি দিচ্ছে, তাদেরকে জানিয়ে দিন নিঃসন্দেহে তারাই হবে লেজকাটা নির্বংশ, তাদের পরিচয় বহণ করার মতো কাউকে খুজে পাওয়া যাবে না।

(*আল-মোয়স্সার*, ১/৬০২)।

সূরার অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الْكَوْثَرَ﴾ ‘হাওযে কাওসার’ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে দুইটি মত পাওয়া যায়, **প্রথমত:** ‘কাওসার’ শব্দটি আরবী, যা ‘কাসীর’ অর্থাৎ ‘অনেক’ থেকে নির্গত ‘ফাওয়াল’ ওজনে ইসমু ফায়িল মুবালাগাহ এর শব্দ। যার অর্থ হলো প্রভুত, এখানে উদ্দেশ্য হলো: প্রভুত কল্যান, অর্থাৎ: আল্লাহ মোহাম্মদ (সা.) কে দুনিয়-আখিরাতে প্রভুত কল্যান দান করবেন। ইবনু কাসীর (র.) এ মতটিকে গ্রহণ করেছেন। **দ্বিতীয়ত:** আয়াতে ‘আল-কাওসার’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: হাওজে কাওসার, যার পানি হবে দুধের চেয়ে সাদা এবং মধুর চেয়ে মিষ্টি, যা পান করার জন্য অগণিত পান পেয়ালা থাকবে, এটাকে আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে হাশরের ময়দানে তৃষ্ণা মিটানোর জন্য প্রদান করা হবে এবং সর্বশেষ স্থায়ীভাবে তাকে জান্নাতে দেওয়া হবে। এখান থেকে তিনি তার নেক্কার উম্মতকে পানি পান করাবেন। (*আহসানুল বয়ান*, ১১০৭)।
দ্বিতীয় মতটি প্রথম মতের মধ্যে শামিল থাকার কারণে প্রথম মতটি গ্রহণের জন্য উত্তম।

﴿الْأَبْتَرُ﴾ ‘লেজকাটা’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: এমন ব্যক্তি যে নির্বংশ, যার বংশধর কেউ নেই, অথবা যার নাম নেওয়ার কেউ নেই। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ৫/৬২১)।

সূরাটি অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: কা`ব বিন আশরাফ নামক ইহুদী মক্কায় গমণ করলে কোরাইশরা তাকে বললো: আমরা তোমাকে মদীনাবাসীদের নেতা মনে করি। মোহাম্মদ নির্বংশ লোকটা দাবী করে, সে নাকি আমাদের চেয়ে উত্তম, অথচ আমরা হাজীদের খেদমতে নিয়োজিত। কা`ব বিন আশরাফ তাদের কথার উত্তরে বললো: তোমরাইতো তার চেয়ে উত্তম। তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের গালির জবাবে অত্র সূরা অবতীর্ণ করেন।

ইকরিমাহ এবং আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পুত্র ইব্রাহীম মারা গেলে আবু লাহাব এবং আসি ইবনু ওয়াইল সহ মক্কার মুশরিকরা তাকে লেজ কাটা বা নির্বংশ বলে ভৎসনা করতে শুরু করে। তখন আল্লাহ তায়ালা অত্র সূরা অবতীর্ণ করে জানিয়ে দিলেন যে, মোহাম্মদ (সা.) নির্বংশ নয়, বরং যারা তাকে নির্বংশ বলে গালি দেয় তারাই প্রকৃত নির্বংশ। (*লুবাব আল-নুকূল*, সুয়ূতী, ৩৭১-৩৭২) ।

সূরার শিক্ষা ও আমল:

১। প্রথম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে শান্তনা দিয়েছেন যে তিনি নির্বংশ এবং নিঃস্ব নয়, বরং তিনি অচিরেই হাওযে কাওসার সহ দুনিয়া-আখিরাতের প্রভুত কল্যান দ্বারা ভূষিত হবেন। দ্বিতীয় আয়াতে নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় স্বরূপ তাকে সালাত কায়েম এবং কোরবানী করতে বলা হয়েছে। এবং সর্বশেষ আয়াতে যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নির্বংশ বলে গালি দিয়েছে, তাদেরকেই নির্বংশ বলা হয়েছে। এ সূরার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখতে পাই, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নির্বংশ বলেছিলো আজ তাদের নাম নেওয়ার কেউ নেই। সারা পৃথিবীর মানুষ তাদেরকে এক গুচ্ছ অভিসম্পাত দিয়ে স্মরণ করে। অপরদিকে মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ঈমানী সম্পর্কের প্রায় দেড়শত কোটি অনুসারী রয়েছে, যারা প্রতিনিয়ত তাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে এবং আখিরাতে তিনি হাওযে কাওসার পাওয়ার মাধ্যমে বিশেষভাবে সম্মানিত হবেন। (*তাফসীর মওজুয়ী*, ১০/৩৯৫-৩৯৭) ।

২। দ্বিতীয় আয়াতে সালাত দ্বারা ঈদুল আযহার সালাত এবং নাহ্‌র দ্বারা কোরবানীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এতে আরো ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈদুল আযহার সালাতের পরে কোরবানী করতে হয়। (আল-কুরতুবী, ২০/২১৯, আইসার আল-তাফাসীর, ৫/৬২২) ।

৩। সকল মাযহাবে ঈদুল আযহা এ কোরবানী করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। তবে হানাফী মাযহাবে ঈদুল আযহার কোরবানী অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল সকলের উপর ওয়াজিব। তারা দ্বিতীয় আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করেন।

৪। রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে অশোভনীয় কথা বলা কবীরা গুনাহ। তাকে কষ্ট দিলে আল্লাহ তায়ালা তা সহ্য করেন না। এ জন্য কেউ তাকে কষ্ট দিলে সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা তার জবাবে আয়াত অবতীর্ণ করে তাদেরকে কঠিনভাবে ধোলাই করেছেন, যা আমরা সূরা হুজরাত ও মাসাদ সহ কোরআনের অনেক জায়গায় দেখতে পাই।

৬। বংশীয় পরিচয়ের জন্য রক্তের সম্পর্কের চেয়ে ঈমানী সম্পর্ক বেশী শক্তিশালী। এ জন্য নূহ (আ.) প্রিয় সন্তানকে তার বংশের দাবী করলে আল্লাহ তা প্রত্যাখ্যান করেন। (সূরা হুদ, ৪৬)।

(سُوْرَةُ الكَافِرونَ)

সূরা কাফিরূন এর পরিচয়:

সূরার নাম: এ সূরার অনেকগুলো নাম রয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ নামসমূহ নিম্নে:
(ক) সূরাতু আল-কাফিরুন (তাওকীফী নাম), সকল মুসহাফে এবং বেশীর ভাগ তাফসীর গ্রন্থে এ নামটি উল্লেখ করা হয়েছে।
(খ) সূরাতু কুল ইয়া আয়্যুহা আল-কাফিরুন (তওকীফী নাম), এ নামটি বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া ইমাম বুখারী (র.) তার সহীহ গ্রন্থে এবং ইমাম সাখাভী তার কিতাব 'জামাল আল-কুর্রা' তে এ নামে শিরোনাম করেছেন।
(গ) সূরাতু আল-মুকাশকাশাহ (ইজতিহাদী নাম), ইমাম জামাখশরী, ইবনুল জাওযী, ইমাম রাজী, সুয়ূতী এবং আলুসী তাদের তাফসীর গ্রন্থে এ নাম উল্লেখ করেছেন।
(ঘ) সূরাতু আল-ইখলাস (ইজতিহাদী নাম), ইমাম রাজী এবং আলুসী এ নাম উল্লেখ করেছেন।
(ঙ) সূরাতু আল-ইবাদাহ (ইজতিহদী নাম), ইমাম সাখাভী, আলুসী এবং সুয়ূতী এ নাম ব্যবাহর করেছেন।

সূরার আলোচ্যবিষয়: দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে কাফিরের সাথে কোন আপোষ নেই।

সূরার ফযিলত: এ সূরার অনেক ফযিলত রয়েছে, সহীহ সুন্নাহর আলোকে গুরুত্বপূর্ণ ফযিলতগুলো হলো:
(ক) এ সূরাটি পবিত্র কোরআনের এক চতুর্থাংশের সমান, (*আল-তিরমিযী*, ১৮৯৫, হাদীসটি হাসান) । হাদীসটি সূরা নাস্‌র এ বর্ণনা করা হয়েছে।
(খ) রাসূলুল্লাহ (সা.) ফজরের সুন্নাত এবং তাওয়াফের সালাতের প্রথম রাকয়াতে সূরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকয়াতে সূরা ইখলাস পড়তেন (*সহীহ মুসলিম*, ১৭২৩, ৪৫১) ।
(গ) রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদেরকে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে এ সূরাটি পড়তে শিক্ষা দিয়েছেন। ফারওয়া ইবনু নাফিল রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে বললেন:

(يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَقُولُهُ إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي، قَالَ: اقْرَأْ: "قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ" فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ).

অর্থাৎ: "হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দেন, যা আমি ঘুমাতে যাওয়ার সময় পড়বো। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: তুমি সূরা 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন' পড়বে; কারণ তা শিরক থেকে মুক্তি দেয়" (*সুনান আল-তিরমিযী*, ৩৪০৩) ।
(ঘ) অত্র সূরাটি মুফাস্‌সালাত এর অন্তভুক্ত। মুফাস্‌সাল সূরার ফযিলত সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন:

(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].

অর্থাৎ: "প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, আর কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্‌সাল সূরাগুলো"।

(*সুনানে দারিমী*, ৪৩২০) ।

আরো একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةِ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].

অর্থাৎ: “আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিসিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিষিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি”। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪) ।

হাদীসে মুফাস্সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ১০৯তম সূরা।

অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ১৭তম সূরা, ‘মাউন’ এর পরে এবং ‘ফীল’ এর পূর্বে।

অবতীর্ণের স্থান: সকল মোফাসসের একমত যে, মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা মাক্কিয়্যাহ।

আয়াত সংখ্যা: ৬টি।

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। যা সূরার ব্যাখ্যায় আসবে, ইনশাআল্লাহ।

﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)﴾ [سورة الكافرون].

সূরার আলোচ্যবিষয়: দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে কারো সাথে আপোষ হয় না।

সূরার সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:

১	বলো,	হে	কাফিররা!	২	আমি ইবাদত করি না	যার	ইবাদত তোমরা করো।
	قُلْ	يَاأَيُّهَا	الْكَافِرُونَ		لَا أَعْبُدُ	مَا	تَعْبُدُونَ
৩	এবং নয়	তোমরা	ইবাদতকারী	যার	ইবাদত আমি করি।	৪	আর আমি নই
	وَلَا	أَنْتُمْ	عَابِدُونَ	مَا	أَعْبُدُ		وَلَا أَنَا
ইবাদতকারী	যার	ইবাদত তোমরা করো।	৫	এবং নয়	তোমরা	ইবাদতকারী	
عَابِدٌ	مَا	عَبَدْتُمْ		وَلَا	أَنْتُمْ	عَابِدُونَ	
যার	ইবাদত আমি করি।	৬	তোমাদের জন্য	তোমাদের দ্বীন	আর আমার জন্য	আমার দ্বীন।	
مَا	أَعْبُدُ		لَكُمْ	دِينُكُمْ	وَلِيَ	دِينِ	

সূরার ভাবার্থ:

হে আল্লাহর নবী! আপনি কাফিরদেরকে বলুন, হে মুশরিকগণ! তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেই মূর্তি ও বাতিল ইলাহের ইবাদত করো আমি তার ইবাদত করি না। আমি যেই বিশ্ব প্রতিপালক এবং ইবাদত পাওয়ার একমাত্র যোগ্য সত্বা একত্ববাদী আল্লাহর ইবাদত করি তোমরা তাঁর ইবাদত করছো না। ভবিষ্যতেও, তোমরা যে মূর্তি এবং বাতিল ইলাহের ইবাদত করো আমি তাদের ইবাদতকারী হবো না। অনুরূপভাবে আমি যার ইবাদত করি তোমরা তাঁর ইবাদতকারী হবে না। সুতরাং তোমরা যে দ্বীনের অনুরসরণ করে চলছো তা তোমাদের এবং আমি যে দ্বীনের অনুসরণ করছি যা ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন তালাশ করি না তা আমার।

(*আল-মোন্তাখাব*, ৯৩২, *আল-মোয়াস্সার*, ১/৬০৩) ।

সূরার অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الْكَافِرُونَ﴾ ‘কাফিররা’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ওয়ালিদ, আসি, ইবনু খালাফ এবং আসওয়াদ ইবনু মুত্তালিব মুশরিক নেতৃবৃন্দ। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ৫/৬২৩) ।

সূরাটি অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

সাঈদ ইবনু মীনা (রা.) বলেন: ওয়ালিদ ইবনু মুগীরা, আসি ইবনু ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনু মুত্তালিব এবং উমাইয়্যাহ ইবনু খালফ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে সাক্ষাত করে প্রস্তাব দিলো যে, তোমার এবং আমাদের ধর্মের মধ্যে সমন্বয় করে পালন করা যায়, তাহলে আমাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং ফিতনা-ফাসাদ আর থাকবে না। তখন আল্লাহ সূরা কাফিরুন অবতীর্ণ করে সাফ জানিয়ে দিলেন দ্বীনের মৌলিক বিষয় কোন আপোষ হয় না। (*লুবাব*, ৩৭৩) ।

সূরার শিক্ষা:

১। অত্র সূরায় "তোমরা যার ইবাদত করো আমি তার ইবাদত করি না" কথাটিকে বিভিন্ন বাচনভঙ্গিতে চার বার পুনরাবৃত্তি করার মাধ্যমে তাকীদ প্রদান করা হয়েছে যে, মুশরিক নেতৃবৃন্দ রাসূলুল্লাহ (সা.) কে যে দুই ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রস্তাব দিয়েছে তা কখনও গ্রহণযোগ্য নয়।

২। অত্র সূরা যুদ্ধের আয়াত দিয়ে রহিত হয়ে যায়নি, বরং ইসলামের মৌলিক বিষয়ে কারো সাথে আপোষ হয় না, এ বিষয়ে সতর্ক করানো অর্থে সে তার স্বস্থানে বহাল আছে। অনুরূপ অর্থে একটি আয়াত সূরা ইউনুস এর ৪১ নাম্বার আয়াতে এসেছে:

﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ: لِي عَمَلِي، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [يونس: ٤١].

অর্থাৎ: "তারা যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাহলে তাদেরকে বলে দিন: আমার কর্ম আমার এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের। আমি যা করি তা থেকে তোমরা মুক্ত এবং তোমরা যা করো তা থেকে আমি মুক্ত" [সূরা ইউনুস, ৪১]।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/৪৪২)।

৩। ঈমানদার এবং কাফিরের মধ্যে পার্থক্য হলো: ঈমানদাররা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং কেবলমাত্র তাঁর ইবাদত করে। অপরদিকে কাফির-মুশরেকরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে বহু খোদায় বিশ্বাস করে এবং তাদের ইবাদত করে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, ৫/৬২৪)।

৪। ইসলামের মৌলিক বিষয়, যেমন: আক্বীদা, ইবাদত, আখলাক এবং শরিয়াত এর ক্ষেত্রে কারো সাথে আপোষ হয় না। এ বিষয়গুলোকে পরিপূর্ণভাবে ঠিক রেখে মুয়ামালাতের বিষয়ে ইসলামের সাথে সংঘর্ষিক না হলে সে বিষয়ে সমঝোতা করা যেতে পারে। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

সূরার আমল:

১। ফজরের সুন্নাত সালাত এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফের সালাতে প্রথম রাকাতে 'কাফিরুন' এবং দ্বিতীয় রাকাতে 'ইখলাস' পড়া।

২। সূরা ইখলাস, সূরা নাস্‌র, সূরা কাফিরুন এবং সূরা যালযালা এক বৈঠকে তেলাওয়াত করা, এতে এক খতম কোরআন তেলাওয়াতের সমপরিমান সওয়াব রয়েছে।

৩। ঘুমের জন্য বিছানায় গিয়ে এ সূরাটি পাঠ করা।

(سُوْرَةُ النَّصْرِ)

সূরা নাস্‌র এর পরিচয়:

সূরার নাম: (ক) সূরাতু আল-নাস্‌র (তাওকীফী নাম), (খ) সূরা 'ইজা য্যাআ নাসরুল্লাহি ওয়া আল-ফাতহ্' (ইজতিহাদী নাম)। আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এ নাম এসেছে। এছাড়া ইমাম বুখারী (র.), আলূসী এবং ইমাম জাসসাস তাদের তাফসীর গ্রন্থে এ নাম ব্যবহার করেছেন, (গ) সূরা তাওদী' (ইজতিহাদী নাম)। আলূসী, মাওরদী, রাজী, কুরতুবী, শাওকানী এবং বাকায়ী তাদের তাফসীর গ্রন্থে এ নাম ব্যবহার করেছেন এবং (ঘ) সূরা ফাত্‌হ (ইজতিহাদী নাম)। কিছু মুসহাফে এবং ইমাম তিরমিযী তার জামি তিরমিযীতে এ নাম ব্যবহার করেছেন। (*তাফসীর মাওজুয়ী*, মোস্তফা মুসলিম, ১০/৪১৫-৪১৬) ।

সূরার আলোচ্যবিষয়: মক্কা বিজয়/ বিজয় অর্জনের পর করণীয়।

সূরার ফযিলত: এ সূরাটি পবিত্র কোরআনের এক চতুর্থাংশের সমান, আনাস (রা.) বলেন:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: (هَلْ تَزَوَّجْتَ يَا فُلَانُ)؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا عِنْدِي مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ، قَالَ: (أَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ؟) قَالَ: بَلَى، قَالَ: «ثُلُثُ القُرْآنِ»، قَالَ: (أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالفَتْحُ؟) قَالَ: بَلَى، قَالَ: (رُبُعُ القُرْآنِ) قَالَ: (أَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ)» قَالَ: بَلَى، قَالَ: (رُبُعُ القُرْآنِ) قَالَ: (أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ؟) قَالَ: بَلَى، قَالَ: (رُبُعُ القُرْآنِ) قَالَ: (تَزَوَّجْ تَزَوَّجْ). [الترمذي: ٢٨٩٥].

অর্থাৎ: রাসূলুল্লাহ (সা.) তার এক সাহাবীকে বললেন: তুমি কি বিবাহ করেছো? সাহবী উত্তরে বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে এখনও বিবাহ করিনি। রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তর দিলেন: তোমার কি সূরা 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' মুখস্ত আছে? সে বললো: হ্যা, মুখস্ত আছে। তখন তিনি বললেন: এটাতো কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: তোমার কি সূরা 'ইজা য্যাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহ্' মুখস্ত আছে? সে বললো: হ্যা, মুখস্ত আছে। তখন তিনি বললেন: এটাতো কোরআনের এক চতুর্থাংশের সমান। এবারে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: তোমার কি সূরা 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন' মুখস্ত আছে? সে বললো: হ্যা, মুখস্ত আছে। তখন তিনি বললেন: এটা কোরআনের এক চতুর্থাংশের সমান। সর্বশেষ তিনি বললেন: তোমার কি সূরা 'ইজা ঝুলঝিলাতিল আর্‌দ' মুখস্ত আছে? সে বললো: হ্যা, মুখস্ত আছে। তখন তিনি বললেন: এটাতো কোরআনের এক চতুর্থাংশের সমান। সুতরাং বিবাহ করো..বিবাহ করো..। (*সুনান আল-তিরমিযী*, ১৮৯৫, হাদীসটি হাসান) ।

এছাড়াও অত্র সূরাটি মুফাস্‌সালাত এর অন্তভুক্ত। মুফাস্‌সাল সূরার ফযিলত সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন:

(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].

অর্থাৎ: “প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সুরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, আর কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্‌সাল সূরাগুলো”।

(*সুনানে দারিমী*, ৪৩২০)।

আরো একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةِ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].

অর্থাৎ: “আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিসিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিষিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্‌সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি”। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪)।

হাদীসে মুফাস্‌সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ১১০তম সূরা।

অবতীর্ণের দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ১০২তম সূরা, ‘হাশর’ এর পরে এবং ‘নূর’ এর পূর্বে।

অবতীর্ণের স্থান: সকল মোফাসসের এর মতে, মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা মাদানিয়্যাহ।

আয়াত সংখ্যা: ৩টি।

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। যা সূরার ব্যাখ্যায় আসবে, ইনশাআল্লাহ।

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (٣)﴾ [سورة النصر].

সূরার আলোচ্যবিষয়: বিজয় অর্জনের পর করণীয়।

সূরার সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:

১	যখন	আসবে	আল্লাহর সাহায্য	এবং বিজয়।	২	আর তুমি দেখবে	মানবজাতিকে
	إِذَا	جَاءَ	نَصْرُ اللَّهِ	وَالْفَتْحُ		وَرَأَيْتَ	النَّاسَ

প্রবেশ করতে	আল্লাহর দ্বীনে	দলেদলে।	৩	তখন তুমি তাসবীহ পাঠ করো	প্রশংসায়
يَدْخُلُونَ	فِي دِينِ اللَّهِ	أَفْوَاجًا		فَسَبِّحْ	بِحَمْدِ

তোমার রবের	এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও;	নিশ্চয় তিনি	হলেন	অধিক তাওবা কবুলকারী।
رَبِّكَ	وَاسْتَغْفِرْهُ	إِنَّهُ	كَانَ	تَوَّابًا

সূরার ভাবার্থ:

হে আল্লাহর নবী! যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে, মক্কা বিজয় নিশ্চিত হবে এবং মানবজাতিকে দলেদলে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিতে দেখবে, তখন তুমি অবশ্যই আল্লাহর প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করবে এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নিশ্চয় তিনি তাসবীহ পাঠকারী এবং ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের প্রতি অধিক তাওবা কবুলকারী। (*আল-মোয়াস্সার*, ১/৬০৩) ।

সূরার অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿نَصْرُ اللَّهِ﴾ ‘আল্লাহর সাহায্য’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: “কোরাইশ গোত্রের বিপক্ষে মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য”।

﴿وَالْفَتْحُ﴾ ‘বিজয়’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: মক্কা বিজয়, যা ৮ম হিজরীতে রমযান মাসে সংগঠিত হয়েছে। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ৫/৬২৫) ।

সূরাটি অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

ইমাম জুহরী (র.) বলেন: মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কার অবস্থা বুঝার জন্যে খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে একটি দল তথায় পাঠালেন। অতঃপর তারা মক্কার সীমান্তে কোরাইশ গোত্রের একটি গ্রুপের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলে একপর্যায়ে কোরাইশ গোত্র পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। খালিদ বিন ওয়ালিদ তাদেরকে অস্ত্র জমা রেখে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিলে তারা অস্ত্র জমা রেখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তখন আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(*লুবাব আল-নুকূল*, ৩৭৪)।

সূরার শিক্ষা:

১। আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত পাওয়ার পর শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে কৃতজ্ঞতার সাজদা দেওয়াও শরিয়াতে জায়েজ। সাহাবী আবু বাকরাহ (রা.) বলেন:

(أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ) [سنن أبي داود: ٢٧٧٤].

অর্থাৎ: "রাসূলুল্লাহ (সা.) কোন খুশীর সংবাদ পেলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সাজদায় লুটিয়ে পড়তেন" (*সুনান আবু দাউদ*, ২৭৭৪)। তাছাড়া সাহাবাদের জীবনেও কৃতজ্ঞতার সাজদার আমল ছিলো। যেমন: কা'ব ইবনু মালিক (রা.) আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেছেন শুনে শুকরিয়ার সাজদায় লুটিয়ে পড়েন (*সহীহ আল-বুখারী* ও *মুসলিম*, ৪৪১৮ ও ২৭৬৯)। আবু বকর (রা.) মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের হত্যার সংবাদ শুনে শুকরিয়ার সাজদা করেছিলেন। আলী (রা.) খারেজীদের নিহতদের মধ্যে 'জা সাদিয়্যা' কে দেখে শুকরিয়ার সাজদা করেছিলেন। (*মুসান্নাফে ইবনু শাইবাহ*, ৩৬৬-৩৬৮)।

২। এ সূরার দুইটি অংশ রয়েছে, প্রথমাংশে অর্থাৎ (১-২) আয়াতে মক্কা বিজয়, মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য এবং মানবজাতির দলে দলে ইসলামে প্রবেশ, এ তিনটি নেয়ামতের বর্ণনা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়াংশে অর্থাৎ ৩ নাম্বার আয়াতে নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করা, এ দুইটি করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩। এ সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ (সা.) যতদিন বেঁচে ছিলেন, তিনি সালাতের রুকুতে নিম্নের দোয়াটি পড়তেন: (سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي). অর্থাৎ: "হে আল্লাহ আপনার প্রশংসায় আপনারি পবিত্রতা ঘোষণা করছি, হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেন"। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/৪৫০)।

৪। এ সূরার প্রথমাংশে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মৃত্যুর বার্তা রয়েছে, এজন্য দ্বিতীয়াংশে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। যেমন সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে এসেছে, ওমর (রা.) ইবনু আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করলেন এ সূরার ব্যাখ্যায় তুমি কি বলো? ইবনু আব্বাস (রা.) উত্তর দিলেন: এ সূরার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর হাবীবকে মৃত্যুর বার্তা দিয়েছেন। (*সহীহ আল-বুখারী*, ৪২৯৪)। এ সূরা অবতীর্ণের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) ফাতেমা (রা.) কে ডেকে মৃত্যুর সংবাদ দিলে তিনি কান্না শুরু করে দিলেন, এরপর পুনরায় তার কানেকানে বললেন: আখিরাতে তোমার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাত হবে, এ কথা শুনে হাসলেন। (*আল-মু'জাম আল-কাবীর*, ১০২৭)।

সূরার আমল:

১। এ সূরার নির্দেশ পালনার্থে সালাতের রুকুতে নিম্নের তাসবীহ পাঠ করা:

(سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ). অর্থাৎ: “হে আল্লাহ আপনার প্রশংসায় আপনারি পবিত্রতা ঘোষণা করছি, হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেন”।

২। সূরা ইখলাস, সূরা নাস্‌র, সূরা কাফিরুন এবং সূরা যালযালা এক বৈঠকে তেলাওয়াত করা, যাতে এক খতম কোরআন তেলাওয়াতের সমপরিমান সওয়াব রয়েছে।

৩। বিজয়মিছিল না করে আল্লাহর প্রশংসায় তাসবীহ এবং ইস্তেগফার পাঠ করা।

(سورة المسد)

সূরা মাসাদ এর পরিচয়:

সূরার নাম: (ক) আল-মাসাদ, (খ) সূরা তাব্বাত এবং (গ) সূরা লাহাব।

সূরার আলোচ্যবিষয়: দুনিয়াবী দাপট কাফেরদের কোন উপকার করতে পারে না।

সূরার ফযিলত: সূরাটির সতন্ত্র কোন ফযিলত নেই। **তবে এটি** মুফাস্সালাত এর অন্তভূক্ত। মুফাস্সাল সূরার ফযিলত সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন:

(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].

অর্থাৎ: “প্রত্যেক জিনিসের মাথা আছে, কোরআনের মাথা হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্সাল সূরাগুলো”।

(*সুনানে দারিমী*, ৪৩২০)।

আরো একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةَ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].

অর্থাৎ: “আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিসিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিসিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি”। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪) ।

হাদীসে মুফাস্সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ক্বফ থেকে নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ১১১তম সূরা।

অবতীর্ণ হওয়ার দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ৫ম সূরা, সূরা মুদ্দাসসির এর পরে এবং ‘তাকভীর’ এর পূর্বে।

অবতীর্ণের স্থান: সকল মোফাসসের এর মতে, মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা মাক্কীয়্যাহ।

আয়াত সংখ্যা: ৫টি।

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। যা সূরার ব্যাখ্যায় আসবে, ইনশাআল্লাহ।

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (٣) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (٥)﴾ [سورة المسد].

সূরার আলোচ্যবিষয়: দুনিয়ার দাপট পাপীকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারে না।

সূরার সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:

১	ধ্বংস হোক	আবু লাহাবের দুই হাত	এবং সে নিজে ধ্বংস হোক।	২	কাজে আসবে না
	تَبَّتْ	يَدَا أَبِي لَهَبٍ	وَتَبَّ		مَا أَغْنَى عَنْهُ
তার ধন-সম্পদ	এবং যা	সে অর্জন করেছে।	৩	অচিরেই সে দগ্ধ হবে	লেলিহান আগুনে।
مَالُهُ	وَمَا	كَسَبَ		سَيَصْلَى	نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
৪	এবং তার স্ত্রীও	যে লাকড়ি বহণকারী।	৫	তার গলায়	খেজুর আশের পাকানো দড়ি।
	وَامْرَأَتُهُ	حَمَّالَةَ الْحَطَبِ		فِي جِيدِهَا	حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ

সূরার ভাবার্থ:
অবশ্যই ধ্বংস হবে আবু লাহাবের দুই হাত, যে হাত দিয়ে সে মোহাম্মদ (সা.) ও মুসলমানদেরকে কষ্ট দিয়েছে এবং সাথে সে নিজেও ধ্বংস হবে। এ ক্ষতি থেকে তার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, বংশীয় দাপট এবং সে যা কিছু অর্জন করেছে তা তাকে রক্ষা করতে পারবে না। অচিরেই সে এবং তার স্ত্রী 'উম্মু জামীল আওরা', যে খেজুর আশের পাকানো দড়ি গলায় পড়ে রাসূলুল্লাহর চলার পথে কাটা ছড়িয়ে রাখতো, উভয়ই জাহান্নামে লেলিহান আগুনে দগ্ধ হবে। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ৫/৬২৭, *আল-মুনীর*, ৩০/৪৫৭-৪৫৮) ।

সূরার অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:
﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ "আবু লাহাবের দুই হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হয়েছে" এ আয়াতটি বদ-দোয়ার জন্য ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ: "আবু লাহাবের দুই হাত ও সে নিজে ধ্বংস হোক"। এই দোয়ার ফলে, সে প্লেগ নামক ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলো। তার পরিণতি এতই ভয়াবহ হয়েছিলো যে, প্লেগে আক্রান্তের ভয়ে সেবা-শস্রুষার জন্য কেউ তার কাছে যায়নি এবং মৃত্যুর পরও তার লাসের কাছে যায় নি। কয়েকদিন পর লাস পঁচে গেলে, তার ছেলেরা দুর থেকে পানি মেরে তা ধুয়ে ফেলে, অন্য বর্ণনায় এসেছে দুর থেকে মাটি পাথর মেরে তাকে দাপন দিয়ে দেয়।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, ৫/ ৬২৭) ।

﴿وَمَا كَسَبَ﴾ 'এবং যা সে অর্জন করেছে' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'তার সন্তান-সন্ততি'। (*গরীব আল-কোরআন*, ৪৭৫)। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমাদের সন্তান তোমাদের উত্তম অর্জন, সুতরাং তোমাদের সন্তানদের অর্জিত সম্পদ স্বাচ্ছন্দে খাও" [*মুসনাদে আহমদ*, ৬৭০৬]।

﴿حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ 'কাট বহনকারী' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: আবু লাহাবের স্ত্রী 'উম্মু জামীল আওরা', যে কাটা বহন করে তা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর চলার পথে ছড়িয়ে রাখতো ।

﴿فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ﴾ 'তার গলায় খেজুর আশের পাকানো দড়ি' দ্বারা দুইটি উদ্দেশ্য হতে পারে: (ক) জাহান্নামে তার অবস্থার একটি চিত্র তুলো ধরা হয়েছে, অর্থাৎ: জাহান্নামে সে গলায় বেড়ী পড়িহিত থাকবে। (খ) সে খেজুরের আশের তৈরি এক ধরণের মালা গলায় পড়তো, তুচ্ছজ্ঞান করার জন্য তার এ অভ্যাসটি তুলে ধরা হয়েছে। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/৪৫৮) ।

সূরাটি অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে চিৎকার দিয়ে বললেন: 'ইয়া সাবাহা' বিপদ..বিপদ!!। উল্লেখ্য যে, সকালে সংগঠিত বিপদ থেকে সাবধান করতে আরবী ভাষায় 'ইয়া সাবাহা' শব্দ ব্যবহার হয়। অতঃপর কোরাইশ গোত্রের লোকজন তার কাছে জড়ো হলে তাদেরকে বললেন: আমি যদি বলি একদল শত্রু বাহিনী তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য সকাল-সন্ধা অপেক্ষা করছে, তাহলে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? তারা সমস্বরে বললো: অবশ্যই আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করবো; কারণ তোমাকে কোনদিন মিথ্যা বলতে দেখিনি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: তোমরা যদি এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ফিরে না আসো, তাহলে জাহান্নামের শাস্তি তোমাদেরকে গ্রাস করবে। এ কথা শুনে আবু লাহাব রেগে গিয়ে বললো: ধ্বংস হও মোহাম্মদ, তুমি কি এ কথা বলার জন্য আমাদেরকে একত্র করেছো? তখন আল্লাহ তায়ালা অত্র সূরা অবতীর্ণ করে আবু লাহাবকে অভিশাপ করেন।

ইয়াজিদ ইবনু ইয়জিদ (রা.) বলেন: আবু লাহাবের স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সা.) কে ক্ষতি করার জন্যে তার চলার পথে কাটা ছড়িয়ে রাখতো। তখন আল্লাহ তায়ালা তার শাস্তির বর্ণনা পূর্বক অত্র সূরা অবতীর্ণ করেন।

(*লুবাব আল-নুকূল*, *সুয়ূতী*, ৩৭৫) ।

সূরার শিক্ষা:

১। পাপীর উপর আল্লাহর গযব শুরু হলে সন্তান-সন্ততি সহ দুনিয়ার কোনো ক্ষমতা তাকে সুরক্ষা দিতে পারে না। ফেরআউন, নমরুদ এবং আবু লাহাব এর ঘটনা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ৫/৬২৭) ।

২। এ সূরায় আবু লাহাবকে ঘিরে তিনটি ভবিষৎবাণী করা হয়েছে এবং সবগুলোই বাস্তবে রুপ নিয়েছে: (ক) তার ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সংবাদ, (খ) তার মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো উপকারে না আসার সংবাদ এবং (গ) জাহান্নামী হওয়ার সংবাদ। তিন নাম্বার ভবিষৎবাণীও বাস্তবে রুপ নিয়েছে; কারণ সে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান এবং তা বাস্তবে রুপান্তরিত হওয়া কোরআনের সত্যতার দলীল।

৩। ইমাম আমাদী (র.) বলেন: “সকল আলেম একমত যে, আল্লাহ কর্তৃক কারো ব্যাপারে কাফের হওয়া বা জাহান্নামী হওয়ার সংবাদ দেওয়ার মাধ্যমে ঐ ব্যক্তি ঈমানের তাকলীফ থেকে বের হয়ে যায় না”। সুতরাং আবু লাহাবও ঈমানের তাকলীফ থেকে বেড়িয়ে যায় নি।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/৪৫৯) ।

৪। আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মু জামীল সারা জীবন রাসূলুল্লাহ (সা.) কে কষ্ট দিয়েছে আর তিনি নিরবে ধৈর্য ধারণ করেছেন। তিনি কোন দিন তাদেরকে বদ দোয়া দেন নি, বরং তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন।

(*তাফসীর মওজুয়ী*, ১০/৪৪৩) ।

৫। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে কষ্ট দিলে আল্লাহ তায়ালা তা সহ্য করেন না। এ জন্য কোরআনে দেখতে পাই কেউ তাকে কষ্ট দিলে সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা তার জবাবে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, যা আমরা সুরা হুজরাত ও কাউছার সহ কোরআনে অনেক জায়গায় দেখতে পাই। রাসূল (সা.) কে সবচেয়ে বেশী কষ্ট দিয়েছে আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মু জামীল। আল্লাহ তায়ালা কোরআনের কোথাও কারো নাম উল্লেখ করে তার শাস্তির বর্ণনা দিয়েছেন এমনটা হয় নাই। তবে আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর ক্ষেত্রে আল্লাহ তাদের নাম উল্লেখ করে শাস্তির ধরণ কি হবে তাও বর্ণনা করে দিয়েছেন; কারণ তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে অসহনীয় কষ্ট দিয়েছে।

সুরার আমল:

১। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা। তাকে কষ্ট ও গাল-মন্দ না করা।

২। আল্লাহর পথের দায়ীদের করণীয় হলো: দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে শত্রুর পক্ষ থেকে গাল-মন্দ ও যুলম-নির্যাতন আসলে, উত্তরে গাল-মন্দ না করে ধৈর্য ধারণ করা। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

(سورة الإخلاص)

সূরা ইখলাস এর পরিচয়:

সূরার নাম: এ সূরার অনেকগুলো নাম রয়েছে: (ক) আল-ইখলাস, (খ) কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, (গ) আল-তাওহীদ, (ঘ) আল-মুক্বাশক্বাশাহ, (ঙ) আল-আসাস এবং (চ) আল-সমাদ।

সূরার আলোচ্য বিষয়: আল্লাহর একত্ববাদ।
সূরার ফযিলত: এ সূরার অনেকগুলো ফযিলত রয়েছে, সহীহ হাদীসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ ফযিলতগুলো হলো:
(ক) রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় মুয়াওয়াযাত (সূরা ইখলাস, ফালাক এবং নাস) পড়ে হাতে ফুক দিয়ে ঐ হাত দিয়ে সমস্ত শরীর তিন বার মাসেহ করা। আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত:
(أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) [صحيح البخاري: ٥٠١٧].
(খ) সূরা ইখলাস এর তেলাওয়াত পবিত্র কোরআনের এক তৃতীয়াংশ তেলাওয়াতের সমান। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন: এক ব্যক্তি বারাবার সূরা ইখলাস পড়তেন, তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর কাছে অভিযোগ দেওয়া হলে, রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তরে বললেন:
(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ) [صحيح البخاري: ٥٠١٣].
অর্থাৎ: “ঐ সত্বার শপথ, যার হাতে আমার প্রান, নিশ্চয় সূরা ইখলাস কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান”। (সহীহ বুখারী, ৫০১৩) ।
(গ) ফজরের সুন্নাত সালাতের প্রথম রাকয়াতে সূরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকয়াতে সূরা ইখলাস পড়া (*সহীহ মুসলিম*, ১৭২৩) ।
(ঘ) এ সূরার প্রতি ভালোবাসা তাকে জান্নাতে পৌঁছে দিবে। মসজিদে কুবার ইমাম প্রত্যেক ওয়াক্তে এ সূরাকে ভালবেসে তেলাওয়াত করলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বলেছিলেন: “এ সূরার প্রতি ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে” (*সহীহ আল-বুখারী*, ৭৭৪)। অনুরূপভাবে এ সূরাকে যে ভালবাসে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন। (আল-বুখারী, ৭৩৭৫)।
(ঙ) ফজর ও মাগরিবের পর সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস তিন বার পড়লে সারা রাত ও দিন নিরাপদ থাকবে। (*সুনান আল-তিরমিযী*, হাসান সহীহ, ৩৫৭৫) ।
(চ) এ সূরাটি দশ বার তেলাওয়াত করলে তেলাওয়াতকারীর জন্য জান্নাতে একটি অট্টালিকা তৈরি করা হবে। (*মোসনাদে আহমাদ*, ১৫০৫৭) ।
(ছ) অত্র সূরাটি মুফাস্সালাত এর অন্তভুক্ত। মুফাস্সাল সূরার ফযিলত সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন:
(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].

অর্থাৎ: “প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, আর কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্সাল সূরাগুলো”।

(*সুনানে দারিমী*, ৪৩২০) ।

আরো একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةِ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].

অর্থাৎ: “আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিসিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিষিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি”। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪) ।

হাদীসে মুফাস্সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ১১২তম সূরা।

অবতীর্ণ হওয়ার দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ২১তম, সূরা নাস এর পরে এবং ‘নাযম’ এর পূর্বে।

অবতীর্ণের স্থান: মক্কা, সূরা মাক্কীয়্যাহ।

আয়াত সংখ্যা: ৪টি।

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)﴾ [سورة الإخلاص].

সূরার আলোচ্যবিষয়: একত্ববাদী আল্লাহর পরিচয়।

সূরার সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:

১	বলো:	তিনিই	আল্লাহ	একক।	২	আল্লাহ	অমুখাপেক্ষী।	৩	তিনি কাউকে জন্ম দেন নি
	قُلْ	هُوَ	اللَّهُ	أَحَدٌ		اللَّهُ	الصَّمَدُ		لَمْ يَلِدْ
এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি।	৪	এবং নেই	তাঁর	সমতুল্য	কেউ।				
وَلَمْ يُولَدْ		وَلَمْ يَكُنْ	لَهُ	كُفُوًا	أَحَدٌ				

সূরার ভাবার্থ:

হে রাসূল! যারা আমার পরিচয় জানতে চায়, তাদেরকে আমার পরিচয় জানিয়ে দেন যে, আমি হলাম এমন আল্লাহ, যার এবাদতে, প্রতিপালনে এবং নামে-গুনে কারো কোন ধরণের অংশিদারিত্ব নেই। সবাই আমার মুখাপেক্ষী, আমি কারো মুখাপেক্ষী নয়। আমার কোনো সন্তান নেই, আমিও কারো সন্তান নয় এবং আমার কোনো স্ত্রী নেই। নামে, গুণে এবং কাজে সৃষ্টিজগতে আমার সমকক্ষ ও সাদৃশ কেউ নেই।

(*আল-মোন্তাখাব*, ৯৩৫, *আল-মোয়াস্‌সার*, ১/৬০৪) ।

অত্র সূরার সাথে সাথে পরের দুই সূরার সম্পর্ক: সূরা ইখলাস সহ পরবর্তী দুইটি সূরা ফালাক এবং নাসকে একত্রে ‘মুয়াওয়াযাত’ বলা হয়। এ মুয়াওয়াযাতকে সকাল সন্ধা এবং রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) পড়তেন। (*সহীহ আল-বুখারী*, ৫০১৭) ।

সূরা অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: কা’ব বিন আশরাফ এবং হুয়াই ইবনু আখতাব সহ কতিপয় ইহুদী রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে বলে: হে মোহাম্মদ তোমার রবের পরিচয় দাও, যে তোমাকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছে। তখন আল্লাহ তায়ালা চার আয়াতবিশিষ্ট এই ছোট সূরাটি অবতীর্ণ করে তাঁর পরিচয় তুলে ধরেন। (*লুবাব*, ৩৭৬) ।

সূরার শিক্ষা:

অত্র সূরায় দুইটি বিষয়ের একটিকে সাব্যস্ত এবং অন্যটিকে খন্ডন করা হয়েছে:

(ক) “ইসলামী আক্বীদা একত্ববাদ ও পবিত্রতার উপর প্রতিষ্ঠিত” কে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

(খ) বাতিল আক্বীদাসমূহকে খন্ডন করা হয়েছে। যেমন: খৃষ্টনদের তিন খোদায় বিশ্বাস, ইহুদী এবং খৃষ্টান ধর্মে ওয়ায়ের ও ঈসাকে আল্লাহর পুত্র মনে করা, মোশরেকদের মূর্তি পুজা ও ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা মনে করা ইত্যাদি বিশ্বাসকে খন্ডন করা হয়েছে।

সূরার আমল:

(ক) ফজরের সুন্নাত সালাতের প্রথম রাকাতে ‘কাফিরুন’ এবং দ্বিতীয় রাকাতে ‘ইখলাস’ পড়া।

(খ) সালাতে অথবা অবসর সময়ে বুঝে-শুনে ভালোবাসা নিয়ে বেশীবেশী সূরা ইখলাস পড়া।

(গ) রাতে ঘুমাতে গিয়ে ‘মুয়ওয়াযাত’ (ইখলাস, ফালাক এবং নাস) পড়ে হাতে ফুঁক দিয়ে পুরো শরীর তিন বার মাসেহ করা।

(سورة الفلق)

সূরা ফালাক্ব এর পরিচয়:

সূরার নাম: এ সূরার অনেকগুলো নাম রয়েছে:
তাওকীফী নাম: (ক) সূরাতু আল-ফালাক্ব, সকল মুসহাফ এবং তাফসীর গ্রন্থে এ নামে সূরাটি পরিচিত, (খ) সূরাতু কুল আউজু বি রাব্বিল ফালাক্ব, সূরাটি এ নামে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, (গ) সূরাতু মুয়াওজাতাইন, এ নামেও সূরাটি বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।
ইজতেহাদী নাম: (ঘ) সূরাতু মুকাশকাশাতাইন, ইমাম সাখাভী এবং সুয়ূতী এ নাম উল্লেখ করেছেন এবং (ঙ) সূরাতু আল-মুশাকশাকাতাইন, ইমাম যামাখশারী, কুরতুবী এবং আলূসী এ নাম উল্লেখ করেছেন; কারণ সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠকারীকে নিফাকী থেকে মুক্তি দেন।

সূরার আলোচ্য বিষয়: সকল ধরণের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থণা।
সূরার ফযিলত: সহীহ হাদীসের আলোকে এ সূরার গুরুত্বপূর্ণ ফযিলত হলো:
(ক) সূরা ফালাক এবং নাস কোরআনের শ্রেষ্ঠ আয়াত, উক্ববা ইবনু আমির (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾) [صحيح مسلم: ١٩٧٢].

অর্থাৎ: "তোমরা কি জান না আজ রাতে এমন কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যার সমতুল্য কোন আয়াত কখনো পরিলক্ষিত হবেনা। তা হলো: সূরা ফালাক্ব এবং নাস" (*সহীহ মুসলিম*, ১৯২৭) ।
(খ) রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় মুয়াওয়াযাত (সূরা ইখলাস, ফালাক এবং নাস) পড়ে হাতে ফুক দিয়ে ঐ হাত দিয়ে সমস্ত শরীর তিন বার মাসেহ করা। আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত:

(أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ) [صحيح البخاري: ٥٠١٧].

অর্থাৎ: "রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রতি রাতে বিছানায় যাওয়ার প্রক্কালে সূরা ইখলাস, ফালাক্ব এবং নাস পাঠ করে দুই হাতের তালু একত্র করে তাতে ফুঁক দিয়ে যতদূর সম্ভব সমস্ত শরীরে হাত বুলাতেন। মাথা ও মুখ থেকে আরম্ভ করে তার দেহের সম্মুখ ভাগের উপর হাত বুলাতেন এবং তিনবার এরূপ করতেন" (সহীহ আল-বুখারী, ৫০১৭)।
(গ) রোগাক্রান্ত হলে সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠ করে শরীরে ফুঁক ও মাসেহ করা। আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে..

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا) [صحيح البخاري: ٥٠١٦].

অর্থাৎ: "রাসূলুল্লাহ (সা.) রোগাক্রান্ত হলে মুয়ওয়াজাত সূরাগুলো পাঠ করে ফুঁক দিতেন। রোগ মারাত্মক পর্যায় পৌছলে আমি এ সূরাগুলো পাঠ করে বরকতের প্রত্যাশায় তার শরীরে মাসেহ করে দিতাম" (*সহীহ আল-বুখারী*, ৪৬২৯) ।

এছাড়াও অত্র সূরাটি মুফাস্‌সালাত এর অন্তর্ভুক্ত। মুফাস্‌সাল সূরার ফযিলত সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন:

(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].

অর্থাৎ: "প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, আর কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্‌সাল সূরাগুলো"।

(*সুনানে দারিমী*, ৪৩২০)।

আরো একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةِ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].

অর্থাৎ: "আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিসিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিষিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্‌সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি"। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪)।

হাদীসে মুফাস্‌সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ১১৩তম সূরা।

অবতীর্ণ হওয়ার দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ১৯তম সূরা, সূরা ফিল এর পরে এবং সূরা নাস এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

অবতীর্ণের স্থান: মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে, সূরা মাদানিয়্যাহ।

আয়াত সংখ্যা: ৫টি।

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: অবতীর্ণের একটি প্রেক্ষাপট পাওয়া যায়। যা সূরার ব্যাখ্যায় আসবে, ইনশাআল্লাহ।

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥)﴾ [سورة الفلق].

আয়াতের আলোচ্যবিষয়: সকল ধরণের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থণা।

আয়াতের সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:

১	বলো:	আমি আশ্রয় প্রার্থণা করছি	প্রত্যুষের রবের কাছে	২	তার অনিষ্ট থেকে,
	قُلْ	أَعُوذُ	بِرَبِّ الْفَلَقِ		مِنْ شَرِّ
যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।	৩	এবং রাতের অনিষ্ট থেকে,	যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়।		
مَا خَلَقَ		وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ	إِذَا وَقَبَ		
৪	এবং ঐ সব আত্মার অনিষ্ট থেকে,	যারা ফুৎকার দেয়	গ্রন্থিতে।	৫	এবং অনিষ্ট থেকে
	وَمِنْ شَرِّ	النَّفَّاثَاتِ	فِي الْعُقَدِ		وَمِنْ شَرِّ
হিংসুকের,	যখন সে হিংসা করে।				
حَاسِدٍ	إِذَا حَسَدَ				

সূরা ফালাকের ভাবার্থ:

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে জীবন চলার পথে মানুষের জন্য ক্ষতিকারক বিষয় থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থণার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে বলেন: হে আল্লাহর নবী! তুমি বলো: আমি সৃষ্টি জগতের অনিষ্ট, রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট, যাদুকরদের যাদুর অনিষ্ট এবং হিংসুকের হিংসার অনিষ্ট থেকে প্রত্যুষের রবের কাছে আশ্রয় প্রার্থণা করছি, যিনি ছাড়া অন্য কেউ উল্লেখিত বস্তুসমূহের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় দিতে পারে না।

অত্র সূরার সাথে পূর্বের সূরার সম্পর্ক:

সূরা ফালাক এর পূর্বের সূরা হলো: ইখলাস। সূরা ইখলাসএ আল্লাহ তায়ালার পরিচয় ও তাঁর পরিপূর্ণ গুণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর সূরা ফালাক ও নাসএ দ্বীন এবং দুনিয়া বিষয়ে মানুষের জন্য ক্ষাতিকারক বিভিন্ন বস্তুর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রর্থণার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (*তাফসীর মাওজুয়ী*, মোস্তফা মুসলিম, ৪৬৬) ।

সূরা ফালাক অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্বাস (রা.) বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সা.) খুব অসুস্থ অবস্থায় কিছুদিন অতিবাহিত করছিলেন। অতঃপর একদিন স্বপ্নে দেখলেন দুইজন ফেরেশতা এসে একজন তার মাথার পাশে এবং অন্যজন তার পায়ের পাশে বসলেন। পায়ের পাশে বসা ফেরেশতা মাথার পাশের

ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি মনে করো? তিনি উত্তরে বললেন: তাকে যাদু করা হয়েছে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো কে যাদু করেছে? এবার উত্তর দিলেন লুবাইদ ইবনু আসাম নামক ইহুদী। আবার জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় যাদু করা হয়েছে? তিনি বললেন: অমুক গোত্রের কুপে একটি পাথরের নিচে নেকরা কাপড়ে। অতঃপর কুপের কাছে এসে পানি নিষ্কাশন করে পাথরটি তুলে নেকরা কাপড়টি জ্বালিয়ে দিলেন। অতঃপর সকালে রাসূলুল্লাহ (সা.) আম্মার ইবনু ইয়াসার এর নেতৃত্বে একটি দলকে কুপের কাছে পাঠালেন। তারা কুপের পানি নিষ্কাশন করে পাথর তুলে নেকরা কাপড়টি তুলে এনে জ্বালিয়ে দিলেন। নেকরা কাপড়ের টুকরির মধ্যে মানুষের মাথা, চিড়ুনী এবং চুল যাতে ১১টি গিট ছিলো। গিটগুলো খোলার জন্য সূরা ফালাক এবং নাস অবতীর্ণ করা হয় যাতে ১১টি আয়াত রয়েছে। একটি আয়াত পড়লে একটি গিট খুলে যায় এভাবে ১১টি আয়াত তেলাওয়াত করা হলে ১১টি গিটের সবগুলো খুলে গেলে রাসূলুল্লাহ (সা.) সুস্থ হয়ে যান” (সহীহ আল-বুখারী, ৫৭৬৬)।

(*লুবাব আল-নুকুল*, ৩৭৯) ।

সূরা নাস এর সাথে সূরা ফালাক এর সম্পর্ক:

সূরা ফালাক এ সৃষ্টি জগতের অনিষ্ট, রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট, যাদুকরের যাদুর অনিষ্ট এবং হিংসুকের হিংসার অনিষ্ট থেকে মহান প্রতিপালকের কাছে আশ্রয় প্রার্থণা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর সূরা নাস এ জিন ও মানুষ শয়তানের কুমন্ত্রণার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থণার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ জন্য সূরা দুইটিকে মুয়াওয়াজাতাইন নামকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও সূরা ইখলাস সহ এ তিনটি সূরাকে একত্রে মুয়াওয়াজাাত বলা হয়।

(*তাফসীর আল-মাওজুয়ী*, মোস্তফা মুসলিম, ১০/৪৭৯) ।

সূরা ফালাক এর শিক্ষা:

১। সূরা ফালাক এ শুধু তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ ব্যবহার করে আল্লাহ তায়ালার কাছে দুনিয়া সম্পৃক্ত অনেকগুলো অনিষ্ট (সৃষ্টি জগতের অনিষ্ট, রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট, যাদুকরের যাদুর অনিষ্ট এবং হিংসুকের হিংসার অনিষ্ট) থেকে আশ্রয় প্রার্থণা করা হয়েছে। অপরদিকে সূরা নাস এ তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ, উলুহিয়্যাহ এবং আল-আসমা ওয় আল-সিফাত তিন প্রকার তাওহীদ ব্যবহার করে তাঁর কাছে দ্বীনের ব্যাপারে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থণা করা হয়েছে। এ থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ধর্মীয় বিষয়ে অনিষ্টের ভয়াবহতা আল্লাহ তায়ালার কাছে অনেক বড়। অর্থাৎ: দুনিয়ার বিষয়ে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার দুনিয়াতে সামান্য ক্ষতি হয়, কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলে সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়। (*তাফসীর আল-রাজী*, ৩২/১৯৮) ।

২। আবু বকর আল জাযায়েরী (র.) এ সূরা থেকে কয়েকটি হুকুম নির্গত করেছেন:

(ক) যে ক্ষতি থেকে মানুষ আত্মরক্ষা করতে সক্ষম নয়, তা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রর্থণা করা ওয়াজিব।

(খ) যাদুবিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ এবং যাদুটোনা করা উভয়ই হারাম বা কবীরা গুণাহ।

(গ) হিংসা-বিদ্বেষ এক মারাত্মক অন্তরব্যাধি, এটা শরিয়াতে হারাম। তবে 'গিবতাহ' বা অন্যের ভালো গুণে মুগ্ধ হয়ে অনুরূপ গুণ আল্লাহর কাছে কামনা করা দোষের নয়। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ৫/৬৩১) ।

৩। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, হিংসুক তার হিংসা কথায় বা কাজে প্রকাশ না করা পর্যন্ত সে গুনাহগার হয় না। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩০/৪৭৫) ।

৪। সূরা ফাতিহা হলো পবিত্র কোরআনের ভূমিকা, যেখানে সঠিক পথের দিশা পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে তাওফীক কামনা করা হয়েছে। আর অত্র সূরা এবং সূরা নাস কোরআনের উপসংহার, যেখানে জিন ও মানুষ শয়তানের কুমন্ত্রণা, হিংসা, রাতের অন্ধকার ইত্যাদির অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থণার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো কোরআন পড়ে যেন হেদায়েত পাওয়া যায়, সেজন্য তার ভূমিকাতে আল্লাহর কাছে তাওফীক কামনা করা হয়েছে এবং হেদায়েত পাওয়ার পর যেন কোন ধরণের অনিষ্টতায় পতিত হয়ে পথভ্রষ্ট না হয়, সে জন্য উপসংহারে দোয়া করা হয়েছে। (*তাফসীর ইবনু জিযি*, ৮৬৬) ।

সূরা ফালাক এর আমল:

১। কেউ অসুস্থ হয়ে সূরা নাস, ফালাক এবং ইখলাস পড়ে হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে পুরো শরীর মসেহ করলে, সে আল্লাহর ইচ্ছায় সুস্থ হয়ে যাবে। (*সহীহ মুসলিম*, ২১৯২) ।

২। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর পূর্বে সূরা নাস, ফালাক এবং ইখলাস পড়ে হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে পুরো শরীর তিন বার মসেহ করা (*সহীহ আল-বুখারী*, ৫০১৭) । এর মাধ্যমে সে সারা রাত নিরাপদ থাকবে (*সুনান আবু দাউদ*, ৫০৮৩, হাসান)।

(سورة الناس)

সূরা নাস এর পরিচয়:

সূরার নাম: এ সূরার অনেকগুলো নাম রয়েছে:

তাওকীফী নাম: (ক) সূরাতু আল-নাস, সকল মুসহাফ এবং তাফসীর গ্রন্থে এ নামে সূরাটি পরিচিত, (খ) সূরাতু কুল আউজু বি রাব্বিন নাস, সূরাটি এ নামে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ইমাম বুখারী (র.) সহীহ বুখারীতে এ নামে শিরোনাম করেছেন, (গ) সূরাতু মুয়াওজাতাইন, এ নামেও সূরাটি বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ইবনু আতিয়্যাহ (র.) তার তাফসীর গ্রন্থে এবং ইমাম তিরমিযী (র.) জামি আল-তিরমিযীতে এ নামে শিরোনাম করেছেন।

ইজতেহাদী নাম: (ঘ) সূরাতু মুকাশকাশাতাইন, ইমাম সাখাভী এবং সুয়ূতী এ নাম উল্লেখ করেছেন এবং (ঙ) সূরাতু আল-মুশাকশাকাতাইন, ইমাম যামাখশারী, কুরতুবী এবং আলূসী এ নাম উল্লেখ করেছেন; কারণ সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠকারীকে নিফাকী থেকে মুক্তি দেন।

সূরার আলোচ্য বিষয়: জীন এবং মানুষ শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থণা।

সূরার ফযিলত: সহীহ হাদীসের আলোকে এ সূরার গুরুত্বপূর্ণ ফযিলত হলো:

(ক) সূরা ফালাক এবং নাস কোরআনের শ্রেষ্ঠ আয়াত, উক্ববা ইবনু আমির (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾) [صحيح مسلم: ١٩٧٢].

অর্থাৎ: "তোমরা কি জান না আজ রাতে এমন কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যার সমতুল্য কোন আয়াত কখনো পরিলক্ষিত হবেনা। তা হলো: সূরা ফালাক্ব এবং নাস" (*সহীহ মুসলিম*, ১৯২৭)।

(খ) রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় মুয়াওয়াযাত (সূরা ইখলাস, ফালাক এবং নাস) পড়ে হাতে ফুক দিয়ে ঐ হাত দিয়ে সমস্ত শরীর তিন বার মাসেহ করা। আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত:

(أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ) [صحيح البخاري: ٥٠١٧].

অর্থাৎ: "রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রতি রাতে বিছানায় যাওয়ার প্রক্কালে সূরা ইখলাস, ফালাক্ব এবং নাস পাঠ করে দুই হাতের তালু একত্র করে তাতে ফুঁক দিয়ে যতদুর সম্ভব সমস্ত শরীরে হাত বুলাতেন। মাথা ও মুখ থেকে আরম্ভ করে তার দেহের সম্মুখ ভাগের উপর হাত বুলাতেন এবং তিনবার এরুপ করতেন" (সহীহ আল-বুখারী, ৫০১৭)।

(গ) রোগাক্রান্ত হলে সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠ করে শরীরে ফুঁক ও মাসেহ করা। আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে..

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا) [صحيح البخاري: ٥٠١٦].

অর্থাৎ: "রাসূলুল্লাহ (সা.) রোগাক্রান্ত হলে মুয়ওয়াজাত সূরাগুলো পাঠ করে ফুঁক দিতেন। রোগ মারাত্মক পর্যায় পৌঁছলে আমি এ সূরাগুলো পাঠ করে বরকতের প্রত্যাশায় তার শরীরে মাসেহ করে দিতাম" (*সহীহ আল-বুখারী*, ৪৬২৯) ।

এছাড়াও অত্র সূরাটি মুফাস্সালাত এর অন্তভূক্ত। মুফাস্সাল সূরার ফযিলত সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন:

(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ) [سنن الدارمي: ٣٤٢٠].

অর্থাৎ: "প্রত্যেক জিনিসের মস্তিষ্ক আছে, কোরআনের মস্তিষ্ক হলো: সূরা বাকারা; এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্তর আছে, আর কোরআনের অন্তর হলো: মুফাস্সাল সূরাগুলো"।

(*সুনানে দারিমী*, ৪৩২০) ।

আরো একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَقَدْ أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةِ، وَالْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ) [مسند الشامين: ٢٧٣٤].

অর্থাৎ: "আমাকে তাওরাত এর স্থলাভিসিক্ত সাতটি লম্বা সূরা, ইনজীল এর স্থলাভিষিক্ত মাসানী সূরাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে মুফাস্সাল সূরাগুলো, যা পূর্বের কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি"। (*মুসনাদে শামী*, ২৭৩৪) ।

হাদীসে মুফাস্সালাত সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো।

মুসহাফে সূরাটির অবস্থান: ১১৪তম সূরা।

অবতীর্ণ হওয়ার দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান: ২০তম সূরা, সূরা ফালাক এর পরে এবং সূরা ইখলাস এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

অবতীর্ণের স্থান: মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে, সূরা মাদানিয়্যাহ।

আয়াত সংখ্যা: ৬টি।

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট: অবতীর্ণের একটি প্রেক্ষাপট পাওয়া যায়। যা সূরার ব্যাখ্যায় আসবে, ইনশাআল্লাহ।

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤)
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)﴾ [سورة الناس].

সূরার আলোচ্যবিষয়: জীন ও মানুষ শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থণা।

সূরার সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:

১	বলো:	আমি আশ্রয় প্রার্থণা করছি	মানুষের রবের কাছে,	২	মানুষের মালিকের কাছে,	
	قُلْ	أَعُوذُ	بِرَبِّ النَّاسِ		مَلِكِ النَّاسِ	
৩	মানুষের ইলাহের কাছে	৪	অনিষ্টতা থেকে	কুমন্ত্রণাকারীর,	যে আত্মগোপনকারী।	
	إِلَهِ النَّاسِ		مِنْ شَرِّ	الْوَسْوَاسِ	الْخَنَّاسِ	
৫	যে	কুমন্ত্রণা দেয়	মানুষের অন্তরে	৬	জিন এবং মানুষ থেকে।	
	الَّذِي	يُوَسْوِسُ	فِي صُدُورِ النَّاسِ		مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ	

সূরার ভাবার্থ:

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে দ্বীনি বিষয়ে শয়াতানের কুমন্ত্রণা থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থণার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে বলেন: হে আল্লাহর নবী! তুমি বলো: আমি মানুষের রব, মালিক এবং মাবুদের কাছে কুমন্ত্রণাকারীর অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই, যে কুমন্ত্রণা দিয়ে দ্রুত আত্মগোপন করে। জিন ও মানুষ থেকে যারা মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় আমি তাদের কুমন্ত্রণা থেকেও আশ্রয় চাই।

সূরার অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الْخَنَّاسِ﴾ “আল-খান্নাস” দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: শয়তান। ‘খান্নাস’ এর শাব্দিক অর্থ হলো: আত্মগোপন করা। শয়তান যেহেতু আল্লাহর যিকর শুনা মাত্রই মানুষের অন্তর থেকে আত্মগোপন করে, সেহেতু তাকে ‘খান্নাস’ বলা হয়। (*তাফসীর গরীব আল-কোরআন*, ১/১১৪) । যেমন একটি হাদীসে এসেছে: “শয়তান বনী আদমের অন্তরকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকে, যিকর করলে সে পালায় এবং যিকর থেকে বিরত থাকলে ফিরে এসে কুমন্ত্রণা দেয়” (*মুসান্নাফ ইবনু আবি শায়বা*, ৩৫৯১৯) ।

সূরা অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট ও ঘটনা:

আব্বাস (রা.) বলেন: “রাসূলুল্লাহ (সা.) খুব অসুস্থ অবস্থায় কিছুদিন অতিবাহিত করছিলেন। অতঃপর একদিন স্বপ্নে দেখলেন দুইজন ফেরেশতা এসে একজন তার মাথার পাশে এবং অন্যজন তার পায়ের পাশে বসলেন। পায়ের পাশে বসা ফেরেশতা মাথার পাশের

ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি মনে করো? তিনি উত্তরে বললেন: তাকে যাদু করা হয়েছে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো কে যাদু করেছে? এবার উত্তর দিলেন লুবাইদ ইবনু আসাম নামক ইহুদী। আবার জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় যাদু করা হয়েছে? তিনি বললেন: অমুক গোত্রের কুপে একটি পাথরের নিচে নেকরা কাপড়ে। অতঃপর কুপের কাছে এসে পানি নিষ্কাশন করে পাথরটি তুলে নেকরা কাপড়টি জ্বালিয়ে দিলেন। অতঃপর সকালে রাসূলুল্লাহ (সা.) আম্মার ইবনু ইয়াসার এর নেতৃত্বে একটি দলকে কুপের কাছে পাঠালেন। তারা কুপের পানি নিষ্কাশন করে পাথর তুলে নেকরা কাপড়টি তুলে এনে জ্বালিয়ে দিলেন। নেকরা কাপড়ের টুকরির মধ্যে মানুষের মাথা, চিড়ুনী এবং চুল যাতে ১১টি গিট ছিলো। গিটগুলো খোলার জন্য সূরা ফালাক এবং নাস অবতীর্ণ করা হয় যাতে ১১টি আয়াত রয়েছে। একটি আয়াত পড়লে একটি গিট খুলে যায় এভাবে ১১টি আয়াত তেলাওয়াত করা হলে ১১টি গিটের সবগুলো খুলে গেল” (সহীহ আল-বুখারী, ৫৭৬৬)। (*লুবাব আল-নুকূল*, ৩৭৯) ।

সূরা নাস এর সাথে সূরা ‘আল-ফালাক’ এর সম্পর্ক:

সূরা ফালাক এ সৃষ্টি জগতের অনিষ্টতা, রাতের অন্ধকারের অনিষ্টতা, যাদুকরের যাদুর অনিষ্টতা এবং হিংসুকের হিংসার অনিষ্টতা থেকে মহান প্রতিপালকের কাছে আশ্রয় প্রার্থণা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর অত্র সূরায় জিন ও মানুষ শয়তানের কুমন্ত্রণার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থণার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ জন্য সূরা দুইটিকে মুয়াওয়াজাতাইন নামকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও সূরা ইখলাস সহ এ তিনটি সূরাকে একত্রে মুয়াওয়াজাত বলা হয়।

(*তাফসীর আল-মাওজুয়ী*, মোস্তফা মুসলিম, ১০/৪৭৯) ।

সূরা নাস এর শিক্ষা:

১। সূরা ফাতিহা হলো পবিত্র কোরআনের ভূমিকা, যেখানে সঠিক পথের দিশা পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে তাওফীক কামনা করা হয়েছে। আর অত্র সূরা এবং সূরা ফালাক কোরআনের উপসংহার, যেখানে জিন ও মানুষ শয়তানের কুমন্ত্রণা, হিংসা, রাতের অন্ধকার ইত্যাদির অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থণার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো কোরআন পড়ে যেন হেদায়েত পাওয়া যায়, সেজন্য তার ভূমিকাতে আল্লাহর কাছে তাওফীক কামনা করা হয়েছে এবং হেদায়েত পাওয়ার পর যেন যে কোন ধরণের অনিষ্টতায় পতিত হয়ে পথভ্রষ্ট না হয়, সে জন্য উপসংহারে দোয়া করা হয়েছে। (*তাফসীর ইবনু জিযি*, ৮৬৬) ।

২। অত্র সূরা থেকে বুঝা যায় যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণাদাতা দুই প্রকার:

(ক) জিন শয়তান, তারা বনী আদমকে পথভ্রষ্ট করার জন্য তাদের সম্মুখ-পিছন, ডান-বাম দিক থেকে কুমন্ত্রণা দেয় (*সূরা আল-আরাফ*, ১৭)। এমনকি তারা মানুষের রক্তের শিরা-উপশিরায় চলে তাদেরকে কুমন্ত্রণা দেওয়ার চেষ্টা করে (*সহীহ আল-বুখারী*, ২০৩৮) । তারা মানুষের প্রকাশ্য শত্রু, তাদেরকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করা ওয়াজিব (*সূরা ফাতির*, ৬) ।

(খ) মানুষরূপি শয়তান, মানুষের মধ্যে বিশাল একটি অংশ যারা শয়তানের অনুসারী হয়ে গেছে। তারা সর্বদা শয়তানী কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তাদেরকে দেখতে মানুষ মনে হলেও আসলে তারা

মানুষরূপি শয়তান (*সূরা বাকারা*, ১৪) । যারা তাদের সংস্পর্শে যাবে, তারাই তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে। এজন্য রাসূল (সা.) এর নির্দেশ হলো: কাউকে বন্ধু, প্রতিবেশী, আত্মীয় ইত্যাদি বনানোর ক্ষেত্রে আগে ভেবে দেখতে হবে কার সাথে বন্ধুত্ব করা হচ্ছে (*মুসনাদে আহমাদ*, ৮০২৮) । এছাড়া আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য আয়াতে মানুষরূপি শয়তানকে বন্ধু বানাতে নিষেধ করেছেন। (*সূরা আলে-ইমরান*, ২৮) ।

৩। কুরআনের প্রথম সূরা ফাতিহাতে যেমন তিন প্রকার তাওহীদ বা একত্ববাদ (উলুহিয়্যাহ, রুবুবিয়্যাহ এবং আল-আসমা ওয়া আল-সিফাত) এর স্বীকৃতি রয়েছে, তেমনিভাবে কোরআনের সর্বশেষ সূরা নাস এ তিন প্রকার তাওহীদের স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।

সূরা নাস এর আমল:

১। কেউ অসুস্থ হয়ে সূরা নাস, ফালাক এবং ইখলাস পড়ে হাতের তালুতে ফুক দিয়ে পুরো শরীর মসেহ করলে, সে আল্লাহর ইচ্ছায় সুস্থ হয়ে যাবে। (*সহীহ মুসলিম*, ২১৯২) ।

২। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর পূর্বে সূরা নাস, ফালাক এবং ইখলাস পড়ে হাতের তালুতে ফুক দিয়ে পুরো শরীর তিন বার মসেহ করা (*সহীহ আল-বুখারী*, ৫০১৭)। এর মাধ্যমে সে সারা রাত নিরাপদ থাকবে (*সুনান আবু দাউদ*, ৫০৮৩, হাসান)।

লেখক পরিচিতি

ড. মো: মাসুম বিল্লাহ আল-আযহারী, তার পূর্ণ নাম আবু ত্বহা মো: মাসুম বিল্লাহ। তার পিতার নাম মো: আবুল হোসাইন (রাহি.) এবং মাতার নাম রাবেয়া বেগম (রাহি.)। তিনি পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা থানার ইচাদী গ্রামে ১৯৮৪ শালে সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি নিজ এলাকাতেই সরকারী বৃত্তি সহ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করেন। এরপর ছারছীনা দারুস্সুন্নাত কামিল মাদ্রাসা, পিরোজপুর থেকে আলিম (উচ্চমাধ্যমিক) এবং ১৫তম বোর্ড স্ট্যান্ড সহ ফাযিল (স্নাতক) এ উত্তীর্ণ হন। অতঃপর জামেয়া-ই কাসেমিয়া কামিল মাদ্রাসা, নরসিংদী, থেকে ১৩তম বোর্ড স্ট্যান্ড সহকারে কামিল (স্নাতকোত্তর) ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। অতঃপর ড. আযহারী ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। মিশরের বিশ্ববিখ্যাত আল-আযহার ইউনিভার্সিটি থেকে ২০০৮ শালে ধর্মতত্ত্ব বিভাগে বি.এ. অনার্স এ এক্সিল্যান্ট মার্ক পেয়ে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড হয়ে উত্তীর্ণ হন। এরপর ২০১২ শালে মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে কোরআন-সুন্নাহ (তাফসীর) বিভাগে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। অবশেষে ২০২৩ শালে সৌদি আরবের জেদ্দায় অবস্থিত কিং আব্দুল আজীজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিতাব-সুন্নাহ (তাফসীর) বিভাগে পি-এইচডি (ডক্টরেট) ডিগ্রী লাভ করেন।